দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর
গল্পসংগ্রহ

প্রতিভাস
কলকাতা

প্রথম প্রতিভাস প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬১

প্রচ্ছদ : গৌতম বসু

প্রতিভাস-এর পক্ষে বীজেশ সাহা কর্তৃক ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড,
কলিকাতা-৭০০০০২ থেকে প্রকাশিত, সুকুমার দে কর্তৃক বাসন্তী প্রেস,
১৯/এ ঘোষ লেন, কলকাতা—৬ থেকে মুদ্রিত

সম্পাদকের কথা

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী সর্বসাধারণের কাছে একজন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর হিসেবেই সমধিক পরিচিত হলেও তাঁর জীবন ছিল বিচিত্র রসসম্ভারে পরিপুষ্ট। দেবীপ্রসাদ কখনও বংশীবাদক বা পালোয়ান কুস্তিগীর, কখনওবা খেলোয়াড় বা জাত শিকারী, আবার কখনও বা কার্টুনিস্ট বা সাহিত্যিক হিসেবে ধরা দিয়েছেন। বস্তুতঃ একই শিল্পীর জীবনে এত বিচিত্র গুণের সমাবেশ খুব কমই দেখা যায়। দেবীপ্রসাদের জীবনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনে হয়েছে, আসলে তাঁর একক ব্যক্তিত্বের মধ্যে রয়েছে বহুব্যক্তিত্ব। আর, সেই ব্যক্তিত্বসমষ্টির প্রত্যেকটিই হচ্ছে শিল্পী।

গুরু অবনীন্দ্রনাথের মত দেবীপ্রসাদের তুলি ও কলম দুটোই চলত সমান তালে। যে অনুভূতিকে তুলির আঁচড়ে কিংবা ভাস্কর্যের ভাষায় বলা গেল না, তাকে দেবীপ্রসাদ প্রকাশ করেছেন কলমের রেখায়।

দীর্ঘকাল দেবীপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর শিল্পকলা ও জীবন-সম্পর্কে অজস্র রচনা লিখেছি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। দেবীপ্রসাদ সম্পর্কে গ্রন্থও রচনা করেছি ১৯৭৫ সালে ১৫ই অক্টোবর তাঁর মহা-প্রয়াণের পর। এই শ্রুতকীর্তি শিল্পীর জীবন ও শিল্পের উপর 'নানা রঙে দেবীপ্রসাদ' এই নামে একটি বই লিখেছি। এই গবেষণামূলক কাজে প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট মহলে আমাকে অনুসন্ধান করতে হয়। সেই প্রচেষ্টায় আমি দেবীপ্রসাদের বেশ কয়েকটি প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত গল্পের সন্ধান পাই। প্রকাশিত গল্পগুলো ছাপা হয়েছিল প্রবাসী, ভারতবর্ষ, শনিবারের চিঠি, গল্পভারতী, বসুমতী প্রভৃতিতে। সেগুলো পড়ে মুগ্ধ হই এবং শিল্পীপত্নী শ্রীমতী চারুলতা রায়চৌধুরীকে ওগুলো গ্রন্থবদ্ধ করবার প্রস্তাব দিই। উনি সানন্দে সম্মতি দিয়ে আরও কিছু গল্পের সন্ধান দেন। অনেক কষ্ট স্বীকার করে আমি সেগুলো উদ্ধার করি। এজন্য শ্রীমতী চারুলতা রায়চৌধুরীর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই।

এই গ্রন্থে মোট ১৬টি গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে। গল্পগুলোকে এখানে মোটা-মুটি ভাগ করা হয়েছে দুটি ভাগে। প্রথমে আছে শিকার কাহিনী। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে অন্যান্য স্বাদের রচনা। তাতে অলৌকিক কাহিনী থেকে সামাজিক কাহিনী সবই আছে। গল্পগুলো নিঃসন্দেহে সুখপাঠ্য এবং মনোরম। শিল্পীর মন নিয়ে দেবীপ্রসাদের গল্প বলার ভঙ্গীতে স্বাতন্ত্র্য আছে। পাঠক পড়লেই তা বুঝতে পারবেন। দেবীপ্রসাদ একজন জাত শিকারী ছিলেন। নিজের জীবনের

বাস্তব অভিজ্ঞতায় আশ্রিত এই গল্পগুলো শুধু রোমহর্ষক নয়, বিস্ময়করও।

দেবীপ্রসাদের রচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রহস্যময়তা। শুধু শিকার-কাহিনীতেই নয়, এখানে সন্নিবেশিত অন্যান্য বিষয়ের অনেক রচনাতেও রহস্যময়তা একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে। এই রহস্যময়তা এসেছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। তাঁর অনেক গল্পের পটভূমি বহুকালের পুরানো জীর্ণ মন্দির, পরিত্যক্ত জনপদ, রাজপ্রাসাদ, ভীতিপ্রদ জনশ্রুতি-সংযুক্ত পোড়ো বাড়ী প্রভৃতি। গা-ছমছমে নির্জন রহস্যময়তার বুকে গড়ে-ওঠা কাহিনী পাঠককে এক অদ্ভুত অতীন্দ্রিয় এবং অজ্ঞাত ভাবলোকে নিয়ে যায়। সাপ-খোপ, শিয়াল, শুয়োর, ভূতপেত্নী এবং অলৌকিক ঘটনার অকস্মাৎ উপস্থিতি পরিবেশকে আরও অধিক ভয়াবহ ও রহস্যঘন করে তোলে।

দেবীপ্রসাদের জন্ম হয় মামার বাড়ীতে ১৫ই জুন, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের তাজহাটের রংপুর অঞ্চলে (অধুনা বাংলাদেশ)। পিতা উমাপ্রসাদ রায়চৌধুরী ছিলেন ডায়মণ্ডহারবারের মুড়াগাছার জমিদার। তাই রক্তের 'নীলাভা' সম্পর্কে দেবীপ্রসাদ ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। কিন্তু জমিদার-পরিবারের যে বৈভব, ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন, আশ্চর্যের বিষয় তাঁর সাহিত্যে কোথাও বড় একটা তার স্পর্শ নেই। বরং ঠিক বিপরীত ভাবটাই বড় হয়ে উঠেছে। কাহিনীর চরিত্রেরা অধিকাংশই খেটে-খাওয়া নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষ। সমাজে লাঞ্ছিত সর্বহারা মানুষের ক্রন্দন ও তাদের দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধের অন্তর্নিহিত কথা দেবীপ্রসাদ কলমের আঁচড়ে মমত্ব দিয়ে আঁকবার চেষ্টা করেছেন। এ-সব গল্প পড়ে মনে হয়, দেবীপ্রসাদ যেন প্রাসাদচূড়া থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়েছেন অতি সাধারণের মাঝখানে। প্রকৃতপক্ষে সমাজের অপাংক্তেয় শ্রেণীর মানুষের সুখদুঃখ হাসিকান্নার সংবেদন শুধু এই গল্পগুলোয় নয়, দেবীপ্রসাদের প্রায় সমগ্র রচনা-সংগ্রহে অভিষিক্ত।

প্রয়াণের পর। সম্প্রতি অনেক পরিশ্রম করে এই প্রখ্যাত শ্রুতকীর্তি শিল্পীর জীবন ও শিল্পের উপর বাংলায় একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনার কাজ শেষ করেছি। এই গবেষণামূলক কাজে প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট মহলে আমাকে অনুসন্ধান করতে হয়। সেই প্রচেষ্টায় আমি দেবীপ্রসাদের বেশ কয়েকটি প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত গল্পের সন্ধান পাই। প্রকাশিত গল্পগুলো ছাপা হয়েছিল প্রবাসী, ভারতবর্ষ, শনিবারের চিঠি, গল্পভারতী, বসুমতী প্রভৃতিতে। সেগুলো পড়ে মুগ্ধ হই এবং শিল্পিপত্নী শ্রীমতী চারুলতা রায়চৌধুরীকে ওগুলো গ্রন্থবদ্ধ করবার প্রস্তাব দিই। উনি সানন্দে সম্মতি দিয়ে আরও কিছু গল্পের সন্ধান দেন। অনেক কষ্ট স্বীকার করে আমি সেগুলো উদ্ধার করি। এজন্য শ্রীমতী চারুলতা রায়চৌধুরীর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই।

এই গ্রন্থে মোট ১৬টি গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে। গল্পগুলোকে এখানে মোটা-মুটি ভাগ করা হয়েছে দুটি ভাগে। প্রথম ভাগে আছে শিকার-কাহিনী। দ্বিতীয় ভাগে আছে অন্যান্য রচনা। তাতে অলৌকিক কাহিনী থেকে সামাজিক কাহিনী সবই আছে। গল্পগুলো নিঃসন্দেহে সুখপাঠ্য এবং মনোরম। শিল্পীর মন নিয়ে দেবীপ্রসাদের গল্প বলার ভঙ্গীতে স্বাতন্ত্র্য আছে। পাঠক পড়লেই তা বুঝতে পারবেন।

দেবীপ্রসাদ একজন জাত শিকারী ছিলেন। নিজের শিকারী জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় আশ্রিত এই গল্পগুলো শুধু রোমহর্ষক নয়, বিস্ময়কর। জীবন ও মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে অত্যুগ্র শিকারের নেশায় দেবীপ্রসাদ কেমন করে রাতের পর রাত শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের অন্ধকারে ঘুরে বেড়িয়েছেন তার সচিত্র সজীব বিবরণ সত্যই রোমাঞ্চকর।

শিকারের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর সুন্দর শ্যামল অরণ্যানীর চিত্রময় বর্ণনা লেখকের প্রকৃতি-প্রেমেরই পরিচয় বহন করে। একদা দেবীপ্রসাদের লেখা শিকার-কাহিনী 'জঙ্গল' পাঠক-সমাজে এতই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল যে প্রকাশের অনতিকাল পরেই গ্রন্থটি বাজারে নিঃশেষ হয়ে যায়।

দেবীপ্রসাদের রচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রহস্যময়তা। শুধু শিকার-কাহিনীতেই নয়, এখানে সন্নিবেশিত অন্যান্য বিষয়ের অনেক রচনাতেও রহস্য-ময়তা একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে। এই রহস্যময়তা এসেছে তাঁর ব্যক্তিগত

জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। তাঁর অনেক গল্পের পটভূমি বহুকালের পুরানো জীর্ণ মন্দির, পরিত্যক্ত জনপদ, রাজপ্রাসাদ, ভীতিপ্রদ জনশ্রুতি-সংযুক্ত পোড়ো বাড়ী প্রভৃতি। গা-ছমছমে নির্জন রহস্যময়তার বুকে গড়ে-ওঠা কাহিনী পাঠককে এক অদ্ভুত অতীন্দ্রিয় এবং অজ্ঞাত ভাবলোকে নিয়ে যায়। সাপ-খোপ, শিয়াল, শুয়োর, ভূতপেত্নী এবং অলৌকিক ঘটনার অকস্মাৎ উপস্থিতি পরিবেশকে আরও অধিক ভয়াবহ ও রহস্যঘন করে তোলে।

দেবীপ্রসাদের জন্ম হয় মামার বাড়ীতে ১৫ই জুন, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাজহাটের রংপুর অঞ্চলে (অধুনা বাংলাদেশ)। পিতা উমাপ্রসাদ রায় চৌধুরী ছিলেন ডায়মণ্ডহারবারের মুড়াগাছার জমিদার। তাই রক্তের 'নীলাভা' সম্পর্কে দেবীপ্রসাদ ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। কিন্তু জমিদার-পরিবারের যে বৈভব, ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন, আশ্চর্যের বিষয় তাঁর সাহিত্যে কোথাও বড় একটা তার স্পর্শ নেই। বরং ঠিক বিপরীত ভাবটাই বড় হয়ে উঠেছে। কাহিনীর চরিত্রেরা অধিকাংশই খেটে-খাওয়া নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষ। সমাজে লাঞ্ছিত সর্বহারা মানুষের ক্রন্দন ও তাদের দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধের অন্তর্নিহিত কথা দেবীপ্রসাদ কলমের আঁচড়ে মমত্ব দিয়ে আঁকবার চেষ্টা করছেন। এ-সব গল্প পড়ে মনে হয়, দেবীপ্রসাদ যেন প্রাসাদচূড়া থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়েছেন অতি সাধারণের মাঝখানে। প্রকৃত-পক্ষে সমাজের অপাংক্তেয় শ্রেণীর মানুষের সুখদুঃখ হাসিকান্নার সংবেদনই শুধু এই গল্পগুলোয় নয়, দেবীপ্রসাদের প্রায় সমগ্র রচনা-সংগ্রহে অভিষিক্ত।

দেবীপ্রসাদের চিত্রিত রেখাচিত্র এ গ্রন্থের অন্য আকর্ষণ এবং তাতে গ্রন্থের মান অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আশা করি।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই প্রকাশক শ্রীঅসীমকুমার দে'কে। কারণ, বইটি প্রকাশ করে তিনি শুধু আমাকে নয়, সমগ্র পাঠক-সমাজকে অসীম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

শিকার কাহিনী

জঙ্গলের অভিজ্ঞতা

শিকার মানুষের একটি আদিম বুনো প্রবৃত্তি। প্রাগৈতিহাসিক যুগে একান্তই বাঁচার প্রয়োজনে বন্য পশুকে বধ করা দরকার হয়েছিল। একদিকে ক্ষুন্নিবৃত্তির তাড়না অপরদিকে ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তুর অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কা সব সময় অরণ্যবাসী মানুষকে সন্ত্রস্ত করে রাখত। তখনকার দিনে মানুষ গুহার আশ্রয় পেলেও বাঘ, সিংহ কিংবা অন্য কোন হিংস্র মাংসভুক জানোয়ার গুহার ভিতর প্রবেশাধিকার পেলে পরিত্রাণ ছিল না।

সে যুগকে পিছনে ফেলে মানুষ এগিয়ে এল সভ্যতার সামনে। পাহাড় ও জঙ্গলের ভীতিপ্রদ আবেষ্টনী ছেড়ে মানুষ সভ্যতার আওতায় গড়ে তুলল গ্রাম, শহর। বাঁচার ধারায় চলল নিরাপদ হওয়ার চেষ্টা এবং স্বাচ্ছন্দ্যকে পাওয়ার জন্য চলল বিবিধ আয়োজন। চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রমপরিবর্তিত জীবনধারায় বাঁচার জন্য সংগ্রাম বহুদিকে থেকেই গেল। আহার-সংস্থানের জন্য জঙ্গলে ঘোরার প্রয়োজন কেটে গেল বটে, কিন্তু বাঁচার দ্বন্দ্বে মানুষের উপর মানুষের আধিপত্যস্থাপনের চেষ্টা এবং ভিন্ন প্রকার হিংসা এমনভাবেই এল যে মানুষ জানোয়ারকে মারা ছাড়াও শত্রু-দমনের জন্য নিত্য নতুন ভয়ঙ্কর অস্ত্রের আবিষ্কার করতে লাগল।

আজ যে যুগে আমরা এসে পৌঁছেছি সেখানে শিকার এসে দাঁড়াল শৌখীনতার পর্যায়ে। দল বেঁধে হাতী চড়ে শিকারের শৌখীনতাকে মানুষ হত্যার বিলাস করে তুলল, তার সঙ্গে গোপনে যোগ দিল Poachers-এর দল। তাদের অস্ত্রাঘাতে মরতে আরম্ভ করল এমন সব জানোয়ার যাদের চামড়া ফ্যাশনমত্তা শৌখীন মেয়েদের গলাবন্ধের স্থান নিল অথবা পদদলিত করার জন্য ড্রইংরুমে চামড়া শোভা বৃদ্ধির কাজে লাগল। দুদিক থেকেই ফ্যাশনের আশ্রয় লওয়ায় মানুষ হিংস্র পশুকেও নৃশংসতায় হার মানিয়ে দিল। ঘটনার প্রতিক্রিয়া থেকে জঙ্গলবাসী পশুদের বাঁচাবার জন্য অনেকেই সচেষ্ট হলেন, হওয়া প্রয়োজনও ছিল, কিন্তু চেষ্টা কতটা সাফল্য লাভ করেছে তা এখনও জানা যায়নি।

উপস্থিত শিকারের কথায় আমার বক্তব্যের ঘটনাগুলি আমাকে জড়িয়েই। শিকারী আমি নিজে, সুতরাং আমার বুনো প্রবৃত্তিকে কোন অছিলায় আড়াল

দেওয়ার চেষ্টা ফলপ্রদ হবে বলে মনে করি না। তবে এই প্রবৃত্তির সূত্র খুঁজলে দেখা যাবে, আদিম যুগের মানুষের সঙ্গে আজকের মানুষের হিংস্র আচরণে যে তফাত আছে, তা বহুক্ষেত্রে সাজিয়ে সত্যকে আড়াল দেওয়া। এখানে আমার সমর্থনে যেটুকু দৃষ্টান্ত আদিম মানুষের জীবনধারার সঙ্গে মিল ঘটে, তা বলতে পারলে অন্ততঃ সান্ত্বনা থাকে যে আমি প্রয়োজনীয়তার খাতিরে হিংস্র জন্তু বধ করে অন্যায় কিছু করিনি। ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে আমার শিকারের শৌখীনতাকে সাত্ত্বিক ধর্মাবলম্বীরা নিন্দনীয় ভাবতে পারেন। এত বড় ন্যায্য অধিকার থেকে তাঁদের বঞ্চিত করবার চেষ্টা করব না।

তথাপি বলব, ক্ষেত্রবিশেষে হিংসা-প্রবৃত্তিই মানুষের উপকারে লেগেছে। নরভুক বাঘ মেরে জঙ্গল-ঘেঁষা গ্রামের মানুষকে আতঙ্কের কবল থেকে শিকারী নিষ্কৃতি দিয়েছে। গ্রাম্য জীবনধারায় পল্লীবাসী সহজ চলাফেরার সুবিধা পেয়েছে। তা ছাড়া এমন সব বাঘের সংস্পর্শে শিকারী এসেছে যারা আহার সম্বন্ধে বিশেষ রুচির অনুগত। গোয়ালঘর থেকে পুষ্ট গাভীন গরুকে মারতে পারলে তারা প্রকৃতিদত্ত স্বাভাবিক আহার জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করতে চায় না। কয়েকটি ঘটনা থেকে জানতে পারা যাবে যে, শিকারী কি রকম বিপদ সঙ্গে নিয়ে সাহস দেখিয়ে বাহবা পেতে চায়।

অনেকের ধারণা যে, আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র এমনই শক্তিশালী যে বাঘ, সিংহ, হাতী, ভালুক, গণ্ডার অথবা মহিষ কিংবা বাইসন এক গুলীতেই মরে, সুতরাং শিকারে বধ্য জীব যতই ভয়ঙ্কর হোক, যতই শক্তিশালী হোক, মানুষের আবিষ্কৃত আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে পাশবিক শক্তিকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা চলে না। আনা তো চলেই না, বরং শিকারীর তুলনায় শিকারকে নিরীহ বলতেও বাধে না। কথাটা হয়ত ঠিক, তবে যেখানে গুলী লাগলে জানোয়ার দুবার বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পায় না, সেই জায়গায় লক্ষ্যভেদ করতে হলে দীর্ঘকালের অভ্যাস দরকার, কারণ মারের মারাত্মক স্থান নিতান্তই ক্ষুদ্রাকার। একটি পূর্ণকায় হাতীর মারণস্থলের মাপ নিলে বার হবে, তার কর্ণগহ্বরই শ্রেষ্ঠ স্থান, মানে কয়েক ইঞ্চি ঘেরাও মাত্র। দ্বিতীয়, দুই চোখের উপরের মধ্যস্থল। যতটা কাছ থেকে vital spotএ নির্ভুল লক্ষ্যভেদের উপর নির্ভর করা যায়, তাও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অতি নিকট থেকেই সম্পন্ন করতে হয়, অর্থাৎ গুলী ঠিক জায়গায় লাগাতে না পারলে শিকারীকেই শিকার হয়ে যেতে হয়। এরূপ দৃষ্টান্তের

অভাব নেই। তাগমারীর প্রশ্নে আরও একটা কথা আছে যার সঙ্গে ধৈর্য ও আত্মসংযমের যোগ অবিচ্ছেদ্য। ভয়ে হোক, উত্তেজনায় হোক, যে কোন কারণে লক্ষ্যভেদের সময়ে অতি সামান্য হাত কেঁপে গেলেই, বন্দুকের নল থেকে বার-হওয়া গুলী যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে তাতে সন্দেহ নেই এবং যেখানে গুলীর মারে সামান্য ক্ষতের বেশী কিছু হবে না, সেখানে ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ জানোয়ার আততায়ীকে নিকটে পেলে কিভাবে আপ্যায়ন জানাবে তা সহজেই অনুমেয়। এরূপ অবস্থায় বহু শিকারী অসাবধানতা-বশতঃ মৃত্যুকে বরণ করেছেন। সুতরাং নিশ্চিন্তমনে বলা চলে যে, অতি শক্তিশালী অস্ত্র সহায় থাকলেও শিকারীর বিপদ থেকে নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। এই প্রসঙ্গে বিপদ-সংক্রান্ত কয়েটি ঘটনা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চাই।

প্রথমেই বন্দুকের ব্যবহারে সতর্কতা সম্বন্ধে বলি। অনেকদিন আগের কথা। দীর্ঘদিন বন্দুক ব্যবহার না করার পর কিছু মোটা টাকা হাতে আসায় কয়েকটি High Velocity Rifle কিনে ফেললাম ; তাদের সঙ্গে সাধারণ দোনলা Shot Gun ছাড়াও Pistol এবং Revolverও ছিল। বহুদিন আগে রংপুরে বন্য বরাহ ইত্যাদি মারায় ছেলেবেলা থেকেই Rifle চালানায় অভ্যস্ত ছিলাম। অনেকদিন পরে শিকারের অস্ত্রগুলি আবার হাতে আসায় জঙ্গলের ডাক অনুভব করতে লাগলাম। শিকারের নেশায় যাদের উত্তেজনা যোগায় তাদের আমরা বলি খবুরী, অর্থাৎ যারা খবর দেয় কোথায় বাঘ লেপার্ড বুনো শুয়োর পাওয়া যাবে। খবর এল, মাদ্রাজের কাছেই ২৫।৩০ মাইলের মধ্যে একটি গ্রামে দুটি লেপার্ড বেজায় উৎপাত শুরু করে দিয়েছে। একদিন-দুদিন অন্তর কুকুর অথবা ছাগল ঘর থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আহারের সুব্যবস্থায় রীতিমত অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

মাদ্রাজে তখন আমি আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ। খবর পাওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই শিকারে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার (চিত্রশিল্পী) তখন মাদ্রাজে আর্ট কলেজে আমার কাছে ছবি আঁকা শিখতে এসে ছিলেন। আমি যে শিক্ষাপীঠে শিক্ষাদানের কর্তব্য নিয়েছিলাম সেখানে গুরুকুল পদ্ধতি প্রচলনের চেষ্টায় একেবারে অসফল হইনি। এই কারণে বিদ্যাপীঠে হাজিরা দেওয়ার পর ক্লাশের শেষে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ দাঁড়াত বন্ধুর মত। সুবিধাটি কাজে লাগালেন কালীকিঙ্কর। জানালেন—“আমি যাব আপনার সঙ্গে শিকার

করতে।” বন্দুকের অভাব ছিল না, কিন্তু বন্দুক চালনায় কালীকিঙ্করের অজ্ঞতা ছিল বিশ্বাসযোগ্য। কাজেই ভয় পেলাম তাঁর হাতে ভরা বন্দুক দিতে। কালীকিঙ্কর দমে যাবার পাত্র ন'ন। তিনি বন্দুক না পাওয়ায় কসাই-এর মাংস-কাটা ছুরি হাতে পাওয়াতেই সন্তুষ্ট হলেন। ছুরিটি অতি বৃহৎ নেপালী কুকরীর মত। অস্ত্রটি নতুন এবং বেজায় চকচকে। বিঘ্নকারী ডালপালা কাটার জন্য অস্ত্রটি সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল।



নেপালী কুক্রির মত বড় ছুরিটা কালী ঘুরিয়ে দেখছেন

সন্ধ্যার আগেই ঘরোয়া মোটরগাড়ী করে একেবারে খবুরীর দেওয়া ঠিকানায় এসে পৌছান গেল। চারধারে অনেক ছোটখাট পাহাড়, বড় রকমের টিলা ছাড়া আর কিছু নয়। এরই মাঝখানে একটি নোংরা ছোট্ট ডোবা; ডোবার চারপাশে ঘন বাঁশঝাড, আশশেওড়ার ঝোপ এবং আরও কত কি অজানা গাছের ভিড়। জায়গাটা লাগল ভাল। মনে হল খবরটা মিথ্যা নয়। দেখতে দেখতে

সন্ধ্যা এগিয়ে এল, অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসতে লাগল, বিভিন্ন গাছের এডালে ওডালে খট্‌ খট্‌ করে কোন অবাঞ্ছনীয় কীটের কর্মব্যস্ততার নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছিল। কালীকিঙ্কর আমার পাশেই বসেছিলেন। দেখি তিনি উজ্জ্বল ধারাল অস্ত্রটি নিয়ে ওলোট-পালোট করে কি দেখছেন।

ইস্পাতের উজ্জ্বলতার যে ছটা এদিক-ওদিকে ছড়াচ্ছিল তা বিনা ক্লেশে ডোবার ওপার থেকেও দেখা যায়। কালীর কানের কাছে গিয়ে চুপি চুপি বারণ করলাম —"নড়াচড়া করো না। চিতা কাছে এলেও পালাবে।" কিছুক্ষণের জন্য কালী অস্ত্রটি নামিয়ে রাখলেও, স্থির হয়ে বসে থাকা কালীর ধাতে সয় না। সে থেকে থেকে পিঠের দিকটা চমকা চুলকোতে আরম্ভ করেছিল। শুধু কি চুলকানো? চুলকানি পাবার একটা signal-ও সঙ্গে থাকল। হাত নাড়ার আগেই বেশ জোরে 'উঃ' শব্দের পর চুলকানির দ্বারা আবাম সংগ্রহ হতে লাগল। বুঝলাম, কালী শিকাবের সব কিছু পণ্ড কবে দেবে।

শিকারে সহ্যশক্তি ও সংযম একটি প্রধান সহায়। কালীকিঙ্কর সহ্য ও সংযম কোনটিকেই মানতে রাজী নয়। এখানে বক্তৃতা দ্বারা চরিত্রশুদ্ধির চেষ্টা বৃথা। রাগ এসে গিয়েছিল, তার প্রকাশ হল সাবধানতার বাণী দিয়ে। বললাম— "উঃ, আঃ, এ সব চলবে না"। কালী বোধ হয় আদেশটি মানলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ নয়, আবার শব্দ শুনলাম' উঃ। নিশ্চিত হলাম শিকার নিশ্চয়ই কাছে এসেছিল, কালীই তাকে তাড়ালেন। হতাশ হয়ে মাটিতে চাপড় মেরে তাঁকে বললাম— "কি করছ কালী?" এবার করুণস্বরে আমারই মত চুপি চুপি বললেন - "স্যার, আমার জামার তলা দিয়ে একটা বড় এবং শক্ত পোকা ঢুকে গিয়েছে। সে কিলবিল করে চলেছে আর থেকে থেকে কামড়াচ্ছে। এতটা বলার পরই সে আবার বলে উঠল—'উঃ'।

এতক্ষণ ব্যাঙের কোলাহল শুনিনি, এবার দাদুরীর ডাকে বাঘের বদলে কবিতা এল তেড়ে সব-কিছু মোলায়েম করে দেবার জন্য। শিকারের আশা ছেড়ে মাটিতে পাতা সতরঞ্চির উপর কোন প্রকারে হাঁটু মুড়ে শুয়ে পড়লাম। কালী স্বেচ্ছায় পাহারায় বসে রইলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল বাঘ যদি দাদার কাছে আসে, তাহলে এক কোপেই ঐ বৃহৎ ছুরির দ্বারা তার মুণ্ডচ্ছেদ করে দেবে।

বাঘ, লেপার্ড, বিড়াল, এমন কি একটা নেউল পর্যন্ত আসেনি। সকালবেলা শিকারের সব আকর্ষণ বর্জন করে ওঠা গেল। Ready Trigger-এ ভরা Rifle

পাশেই গাছের ডালে ঠেসান দিয়ে রাখা ছিল। যত রাগ গিয়ে পড়ল ঐ বন্দুকটার ওপর। বন্দুক তুলে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে 'দুৎ তোর' বলে মাটিতে বন্দুকের বাঁটটা দিলাম ঠুকে। তারপরই শুনলাম কানের পাশেই কামান-দাগার বিকট আওয়াজ। ৫০০ বোরের High Velocity Rifle থেকে গুলী বেরিয়ে গেল ঠিক আমার কানের পাশ দিয়ে। Ready Trigger-এ আমার আঙ্গুল লাগানই ছিল, বন্দুকের বাঁট জোরে মাটিতে ঠুকে যাওয়ায় আমার অজ্ঞাতেই Trigger-এ টান পড়েছিল। মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলাম এবং প্রতিজ্ঞা করলাম, ভবিষ্যতে প্রয়োজন না হলে কখনও Ready Triggerএ হাতে রাখব না। অস্ত্রও যে শিকারীর কাছে মারাত্মক বিপদ হতে পারে তা এই দৃষ্টান্ত থেকে পাওয়া যায়।

অস্ত্র-সম্বন্ধে আর একটা ঘটনা শুনেছি। বন্দুকের নল দীর্ঘকাল পরিষ্কার না হওয়ায় নলের ভিতর এমনভাবে মরচে পড়েছিল যে, সেগুলোকে ছোটখাট লোহার দানা বলা যায়। এই বন্দুক নিয়েই শিকারীর বাঘ মেরে সাহস দেখাবার প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু বন্দুকের নল ফেটে শিকারীর দুটো চোখ ও কপালের খুলি উড়িয়ে দিয়েছিল। ভদ্রলোকের কপাল ভাল যে যন্ত্রণাভোগের জন্য তিনি বেশীক্ষণ বাঁচেননি।

নতুন জায়গায় এলাম। এখানে ঘোর-ঘটা করে পিকনিকের অছিলায় মেয়ে-পুরুষ মিলে শিকারে আসা হয়েছিল। স্থানীয় লোকেরা বাংলো থেকে বেশ খানিকটা দূরে আমাকে নিয়ে গিয়ে বলল—"এইখানে পাঁঠা বাঁধলে, ১৫ মিনিটের মধ্যে লেপার্ড এসে পাঁঠাকে নিয়ে যাবে এবং লেপার্ড এমনই জলদি কাজ সারবে যে আপনি গুলী চালাবারও সময় পাবেন না। তাই বলি, পাঁঠা এখানে বাঁধার আগে ওখানে একটা পাঁঠার মাথার সাইজের পাথর রাখ, আমি মারুন বললেই গুলী চালাবেন, এক সেকেণ্ড যেন দেরী না হয়।" তাগমারীর দম্ভে আমার ছিল নির্ভরশীল দাবী, কাজেই এই সামান্য শর্তকে তাচ্ছিল্যের সহিতই গ্রহণ করলাম। বললাম—"রাখ পাথরের নুড়ি, চেঁচাও মারুন বলে, দেখবে তোমার কথা শেষ হওয়ার আগেই আমার গুলী চলে গিয়েছে।" তাই। শর্তানুসারে গুলী চলল, কিন্তু পাথরে লাগা গুলী পিছলে গিয়ে পড়ল একটি চাষার পায়ের সামনে। সে হাউ-মাউ করে চেঁচিয়ে ওঠাতে আমরা সকলে সেইদিকে গেলাম। লোকটা বেশ দূরেই ছিল। আমাদের ভাগ্য ভাল।

সে তেড়ে ছুটে এল একটা কড়া অভিযোগ জানাবার জন্য। সোজা কথায় সে বলতে চেয়েছিল—"আর একটু হলেই যে মরেছিলাম।" আমার ত্রুটি স্বীকার করার উপরেও নালিশ থামানর জন্য কিছু ঘুষ দিতে হল। এরূপটি ঘটত না যদি আমি পাথরের ওপাশে কি আছে দেখে নিতাম।

এবারেও শিকারের জায়গা অন্ধ্র প্রদেশেই স্থির হল, মানুষ-খেকো বাঘের খবরে। নরখাদকের সঙ্গে এর আগে আমার পরিচয় হয়নি। এই কারণেই জানতাম না যে, সাধারণ বাঘ ও নরমাংসভুক বাঘের আচরণে অনেক গরমিল থাকতে পারে। মানুষখেকো বাঘের চলাফেরা, শিকার ধরার প্রথা সবই সাধারণ বাঘের সঙ্গে বহুক্ষেত্রে তফাত। একে তার ভয়ডর অনেক কম, তার উপর বেজায় চালাক। যাই হোক, শিকারের নেশায় তখন রঙ লেগে গিয়েছিল, ভয় বা বিপদের সম্বন্ধে খবর নেবার ধৈর্য ছিল না।

এখানে পাহাড়ী পথে বাঘের পদচিহ্ন খবুরীর দেওয়া ঠিকানা অনুসারে খুঁজে পেতে কষ্ট হয়নি। দেখলাম, যে জীব পদচিহ্ন রেখে গিয়েছে সে একটি বিরাট বাঘ। ছোটখাট কুলোর মতো সামনের দুটো থাবা। নরম ধুলোর উপর টাটকা দাগ দেখে কিছুমাত্র ভুল রইল না যে জানোয়ারটি সুস্থ শরীরে ঘোরাফেরা করে না। ডান দিককার পায়ের থাবার পুরোপুরি চিহ্ন মাটিতে পড়েনি। অন্যত্র শিকারের অভিজ্ঞতা দিয়ে ধরেছিলাম, বাঘ কোন্ দিক থেকে আসবে। ছাউনী-দেওয়া গরুর গাড়ীতে এসেছিলাম, সঙ্গে একটি ছোট্ট মোষের বাচ্চাও ছিল, জন্তুটিকে Live Bait হিসাবে ব্যবহারের জন্য আনা হয়েছিল। যেখানে ছোট মোষটা বাঁধা হল, তার কাছাকাছি মাচান বাঁধার উপযুক্ত কোন গাছ পাওয়া গেল না, এবং মাটিতে গর্ত করে বসার জন্য কোন আয়োজনও সঙ্গে করে আনিনি। গত্যন্তরে ঠিক করলাম, গরুর গাড়ীর তলায় বসব। সামনে বিরাট চাকা। এত কাছ থেকে গুলী চালালে বাঘ এক গুলীতেই মরবে, তবুও সাবধানতার জন্য ৩ ইঞ্চি এল.জি. বন্দুকের নলে ভরে নিলাম। যদি গুলী খেয়েও বাঘ লাফ মারে তাহলে চাকার কাছে এসে পৌঁছবার আগেই ৩ ইঞ্চি ম্যাগ্‌নাম্ এল জি. তার দফা শেষ করে দেবে। বেলা থাকতেই এদিকে এসেছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল আর একটি ছাত্র। গাড়োয়ানও সঙ্গে এনেছিল তার একটি দেহরক্ষী; কারণ শর্ত ছিল, আমাদের শিকারের জায়গায় পৌঁছিয়ে দিয়ে গাড়োয়ান তার দুটো বলদ নিয়ে ফিরে চলে

যাবে। এ অঞ্চলে কোন মানুষ একলা চলাফেরা করে না, এমন কি দিনের বেলাতেও না। তাই তার সঙ্গীর প্রয়োজন হয়েছিল। আমার সঙ্গে যে ছাত্রটি এসেছিল, তার মধ্যে শিকারের বাতিক কে এনেছিল জানি না ; কিন্তু বন্দুক কাছে থাকা সত্ত্বেও সে কিছুতেই মাটিতে বসতে রাজী হল না, ছাউনী-ঢাকা গাড়ীর উপর উঠে পড়ল। গাড়ীর সমভাবে ওঠানামার কোন সম্ভাবনা ছিল না, দুদিকেই বাঁশের ঠেকা দেওয়া হয়েছিল। আমি যেখানে চাকার তলায় বসেছিলাম সে জায়গাটি পাহাড়ী রাস্তার একটি মোড়ের কাছে, তার মানে রাস্তাটি আমার বসার জায়গা থেকে মোড়-ফেরার পথে আমি যেখানে বসে আছি তার উপর দিকে উঠে গিয়েছে। আরও সোজা করে বলতে গেলে দাঁড়ায়, যেখানে আমার ছাত্রটি ছাউনী-দেওয়া গাড়ীর উপর বসে ছিল, সে জায়গাটি উপর দিকে যাবার পথ থেকে সামান্য উঁচু। এখান থেকে গাড়ীর উপরে বসে মোড়ের দিক থেকে উপরে ওঠার পথে রাস্তার কিনারায় অনেক ঝোপঝাড় থাকা সত্ত্বেও সব-কিছু দেখতে পাওয়া যায়, এবং ছেলেটি দেখেও ছিল। দেখার বর্ণনা দিচ্ছি। গাড়ীর ছাউনীকে ছোটখাটো ডালপালা দিয়ে আড়াল দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু ক্যামুফ্লেজ (camou-flage) কাজে আসেনি। বিকালে লাগান সবুজ পাতা কড়া রোদে প্রায় শুকিয়ে গিয়েছিল, একটু নড়াচড়াতেই খড়খড়ে আওয়াজ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। আওয়াজের কথা গোড়ার দিকে ভাবিনি, কারণ ঠিক ছিল, আমরা দুজনেই চাকার আড়ালে পিঠোপিঠি বিপরীত দিকে মুখ রেখে বসব। কিন্তু ছাত্র শিকারের আবেষ্টনীতে যা দেখলেন তাতে মাটিতে বসা তাঁর পোষাল না। তিনি গুরুভক্তি দেখালেন, যাক শত্রু পরে পরে ভেবে।

ইতিমধ্যে জঙ্গলে সন্ধ্যার অন্ধকার এগিয়ে আসতে শুরু করেছে, চতুর্দিকে কোন শব্দ নেই, একটি পাখীও উড়ছে না। বাঘের জঙ্গলে আড়ালহীন জায়গায় মাটিতে বসলে এইরকম সময়ে কেমন একটা আতঙ্ক নিজের অজ্ঞাতেই কাছে আসতে থাকে। আমার মনের যখন এই রকম অবস্থা তখন দেখলাম ছাউনীর উপরটা বেশ কাঁপছে, আর আমার ছাত্র 'উঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ' শব্দ শুরু করে দিয়েছে। কালীকিঙ্করকে যেভাবে ধমক দিয়েছিলাম, এবারেও সেইভাবে তাকে আস্তে ধমক দিয়ে বললাম—"আওয়াজ করো না, বাঘ আসার সময় হয়ে গিয়েছে"। ধমক কাজে এল। বেশ কিছুক্ষণ আবার সব চুপচাপ হয়ে গেল। কিন্তু বদভ্যাস যাবে কোথায়? আবার উঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ শব্দ। এবার মাত্রাও যেমন বেশী তেমনি

ছাউনীর দোলাও বেড়ে উঠল। মনে হল, উ-হুঁ-হুঁ-হুঁ শব্দের সাথে ছেলেটি বলছে 'বঃ-বঃ-বঃ-বাঘ। সন্দেহ রইল না যে, ছেলেটিকে ম্যালেরিয়ায় ধরেছে এবং সে ভুল বকছে। এখন করি কি? সে যেভাবে গোঙানির আওয়াজ শুরু করল তাতে



মনে হল, উ-হুঁ-হুঁ-হুঁ শব্দের সাথে ছেলেটি চলবে ব-ব-ব বাঘ

বাঘ যে এদিকে আর আসবে না তাতে সন্দেহ নেই। কিছুক্ষণ বাদে গোঙানির শব্দ থেমে গেল, তার সঙ্গে ছাউনীতে বাঁধা ডালও গেল মাটিতে পড়ে, যা সরু পচা দড়ি দিয়ে কোন প্রকারে ছাউনীর চাঁচাড়িতে বাঁধা হয়েছিল। উ-হুঁ-হুঁ-হুঁ শব্দের সঙ্গে দেহের যে কাঁপুনি এসেছিল তারই ঝাঁকুনিতে ডালটা বেশ সশব্দেই মাটিতে পড়ল। উপরে উঠে সান্ত্বনা দিয়ে ম্যালেরিয়া রোগ সারাবার চেষ্টা বৃথা ভেবে, ঐ বাঁধা মোষটার দিকে তাকিয়েই বসে রইলাম। সময় এগিয়ে চলল গভীর রাতের দিকে, রাতও এগিয়ে চলল। এরই মধ্যে বেশ কয়েকবার ঝিমুনোর সময় মাথা গিয়েছিল চাকায় ঠুকে; চমকে উঠে বসেছি, অভ্যাসমত বন্দুকের দিকে হাতও চলে গিয়েছিল। বাঘ আসেনি।

শেষ পর্যন্ত ভোর হয়ে গেল, চাকার তলা থেকে বেরিয়ে এলাম। বেরিয়ে এসে

রাগকে শাসন করে রুগীকে দেখতে গেলাম ; দেখলাম সে চমৎকার সুস্থ শরীরে বসে আছে চোখ দুটো বড় বড় করে মোড়ের ঝোপটার দিকে তাকিয়ে। প্রথম কথাতেই জিজ্ঞেস করলাম—"জ্বর কি খুব বেশী হয়েছিল ?" বলল—"না স্যার, বাঘ।" বলেই দেখিয়ে দিল কোন্ জায়গায় বাঘকে সে আসতে দেখেছে। জায়গাটি পরীক্ষা করার প্রয়োজন থাকায় বন্দুক নিয়ে মোড়ের দিকে চললাম, ছাত্রটিও আমার সঙ্গ নিল। সে এইটুকু ব্যবধানেও একলা থাকতে চায় না। মোড় ঘুরে দেখলাম, সত্যই আমার চেনা বাঘের থাবা পড়েছে রাস্তার উপরে এবং এসে থেমেছে ঠিক আমার গাড়ীর চাকার পিছনে। বাঘ এইখানেই বসে-ছিল এবং ল্যাজের নড়াচড়ায় খামিকটা জায়গা প্রায় ঝাঁট দেওয়ায় মত হয়ে গিয়েছিল। বসার ভঙ্গী দেখলে বেশ বোঝা যায় যে আক্রমণের জন্য সে প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু আমার ছাত্রটি আমাকে বাঁচিয়ে দিল। উঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-শব্দ এবং ছাউনী থেকে ডাল যদি সশব্দে ছিঁড়ে মাটিতে না পড়ত তাহলে বাঘ কত সহজে হাত বাড়িয়ে আমাকে টেনে নিতে পারত তা অনুমান করা চলে, কারণ পিছন থেকে থাবার একটি থাপ্পড়েই আমার মাথা ধড় থেকে বিচ্যুত হতো. আত্মরক্ষার কোনরকম উপায়ই পেতাম না। এখানে আমার সাহসের কোন পরিচয়ই নেই, নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞতা এবং দৈব কৃপায় যদি ছাত্রটি রীতিমত ভয় না পেত তাহলে আজকে সত্য ঘটনার বিবৃতি দেওয়ার সুবিধা পেতাম না।

পরের ঘটনা কর্নুলের জঙ্গলে। বাঘ মারতে এসেছিলাম। বাঘের বসতি এখানেও কম নেই। যে বাঘের খবর পেয়ে এখানে এসেছিলাম, শুনলাম সে নাকি মন্ত্রপূত। এ পর্যন্ত বহুবার তার উপর গুলী চলেছে, কিন্তু কেউই তাকে মারতে পারেনি। ঐ বাঘকে বিজলী বাতির আলো দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে সে নাকি সুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে অদৃশ্য করে দেয়।

বর্ণনাটি তেমন উৎসাহপূর্ণ বলে মনে হল না। তথাপি মন্ত্রকে মারার অস্ত্র আমার কাছে ছিল। একটি গরু মারার খবর পেয়ে যথাস্থানে উপস্থিত হলাম। গরুটি একটি শুকনো নালার তলায় পড়ে ছিল। চারধার একেবারে ফাঁকা। কিছু দূরে কয়েকটি বাঁশের ঝোপ থাকলেও তার ভিতরে বসে নালার তলায় লক্ষ্য-ভেদ অসম্ভব, বাঘ এলেও তাকে দেখা যাবে না। লক্ষ্যভেদে সুবিধার জন্য শিকারের একটি নীতিবিরুদ্ধ কাজ করে বসলাম। আমরা ছিলাম দলে ৭/৮

জন। গরুর গলায় কোনপ্রকারে আলগোছে দড়ির ফাঁস লাগিয়ে তাকে টেনে পাড়ের উপর তুলতে আমরা হিমশিম খেয়ে গেলাম। গলায় দড়ি পরাবার প্রথায় দুটি ডালের সাহায্যে মাথা তোলা হয়েছিল এবং এবারেও সেইভাবে মাথা তুলে গলার ফাঁস আলগোছে খোলা হল, যাতে মানুষের ছোঁয়া গরুর উপর না লাগে। বাঘকে সন্দিগ্ধ করার ইচ্ছা ছিল না। তবু এটুকু সাবধানতা কোন কাজে আসবে বলে মনে হল না, কারণ মরা গরু যে চলে না বাঘও জানে এবং সেই মড়া খালের উপর উঠে আসায় যে সন্দেহের কারণ হয়েছিল তা বাঘ কাছে এলেই জানতে পারবে। তবে পথ চলতে বাঘ মানুষের গন্ধ প্রায়ই পেয়ে থাকে। কাজেই এ-বিষয়ে চিন্তিত হবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এখন কাছাকাছি বসার জন্য কৃত্রিম বাঁশের ঝোপ যদি করা যায় তবেই শিকারে বসা চলে।

শিকারে বহু ক্ষেত্রে মনকে দৃঢ় করায় অনভ্যস্ত ছিলাম না। লোকগুলিকে বললাম—"বেশ দূরে গিয়ে যতগুলো পারিস্ বাঁশ কেটে নিয়ে আয়।" ডালপালা-সমেত অনেকগুলো গোটা গোটা বাঁশ যথাসময়ে এসে উপস্থিত হল। কিন্তু মাটিতে গর্ত করার জন্য শাবল, কোদাল আনলেও সেগুলো কাজে লাগান গেল না। এখানে মাটির বালাই নেই, সবই নুড়ি। কয়েক ইঞ্চি গর্ত করার চেষ্টা করলেই শাবলের মুখ ভোঁতা হয়ে যাবে, সুতরাং বাঁশগুলো একের উপর আর একটা ঠেকা দিয়ে সাজান ছাড়া আর কোন পথ পাওয়া গেল না। ব্যাপারটি দাঁড়াল, বাঘ যদি গুলী খেয়ে লাফ মারে তাহলে বাঁশের কেল্লার মধ্যেই আমার গোর হয়ে যাবে। মাঝখানে ফাঁক রাখায় কোন প্রকারে বসলাম। চলতি নিয়মানুসারে আমাকে ভিতরে বসিয়ে সঙ্গের লোকগুলো কথা বলতে বলতে গ্রামের দিকে চলে গেল।

এখানেও এত কাছে থেকে Rifle-এর ব্যবহার অর্থহীন, তাই দোনলা Shot Gun নিয়ে বসেছিলাম। মাথার উপর একটি ডালে মোটর গাড়ীর Spot Light লাগিয়ে switch রাখলাম আমার হাতে। বাঘ ঠিকই এল, কিন্তু যখন সুইচ টিপলাম তখন আলো পড়ল আমার মুখের সামনে, কারণ উপরে Spot Lightটা কিভাবে বেঁকে গিয়েছিল। বাঘ আমাকে দেখল জ্যোতির্ময় রূপে, আর বাঘ নিজে রইল অন্ধকারে ডুবে। জন্তুটিকে দেখবার সুযোগ পেলাম না। এর পরই সে একটি হুঙ্কার দিয়ে স্থানটি পরিত্যাগ করল। আলো দেখে ভড়কানো অভ্যাস না থাকলে বাঘ ঐভাবে পালাত না।

সারারাত বসেই থাকলাম। ভোরের দিকে কয়েকটা ভালুক এসে ঠিক

আমার পিছনেই উইয়ের ঢিপিতে জোরে শোষণকার্য শুরু করে দিল। উইয়ের গর্তে মনোমত আহার পাওয়ার আনন্দে উচ্ছ্বাস এমনভাবেই রুখে উঠল যে, শোষণকালে যে যার নিজের অংশে ভাগ বাড়িয়ে নেবার জন্য হুড়োমুড়ি পড়ে গেল। আমার পাশেই ভাগবাটোয়ারায় গোল বাধায় হুড়োমুড়ির ধাক্কা এসে পড়তে লাগল আড়াল দেওয়া বাঁশের উপর। বাঁশগুলি একটার উপর আর একটা ঠেসান দিয়ে বাঁধা হয়েছিল, অনবরত ধাক্কা লাগায় বাঁশের ঘরেও দোলা শুরু হয়ে গেল। বেশীক্ষণ এইভাবে দোলা চললে ভালুক আমাকে ছেড়ে দিত না। কপাল ভাল যে আহারের আকর্ষণ ওদের এমনভাবেই অন্যমনস্ক করে রেখেছিল যে আমি ওদের অত কাছে থাকা সত্ত্বেও খোঁজ নেবার অবসর পায়নি।

বেশ খানিকক্ষণ পরে ভালুকের দল চলে গেল। তখন প্রায় সকাল হয়ে গিয়েছে। লোকদের অপেক্ষায় বসে থাকলাম, কারণ বাইরে থেকে ঠিক জায়গায় বাঁধন না খুললে সব-কয়টি বাঁশ আমার উপরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যাক, এবারেও বাঁচলাম।

অন্য ঘটনায় ফিরে আসি। মাচানেই বসে ছিলাম। তবে মাচান বাঁধা হয়েছিল বাবলা গাছের সরু ডালে, মাটি থেকে ৮।৯ ফুটের বেশী হবে না। বাঘ উল্টো পথে এসে আমার সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করতে চাইলে আপত্তি করার অবসর দেবে না। তবে মরা গরুটার সামনেই ছিল কাঁটাঝোপ, বড় মোটা পেরেকের মত কাঁটায় ভরা ঝোপ, বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে গরু আর আমার মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করছিল। কাঁটাঝোপের ত্রিসীমানায় বাঘ আসতে চায় না, তাই সামনে থেকে আক্রমণের কোন ভয় ছিল না।

চুপচাপ বসে আছি হঠাৎ সামনে হাড়-ভাঙ্গার শব্দ শুনলাম। বুঝলাম বাঘ এসেছে। ক্ষিপ্র গুলী চালানোয় অভ্যস্ত থাকায় বাঘকে খেতে দিয়ে, রয়ে-সয়ে অঙ্ক কষে টিপ করার প্রয়োজন বোধ করিনি। তাই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে Electric Torch টিপে দিলাম। দেখলাম, বাঘ আহারে বসেছিল আমারই দিকে মুখ করে। গুলী চলার সঙ্গে সঙ্গে আহত জানোয়ার সোজা লাফিয়ে উঠল প্রায় ৯।১০ ফুট উপরে, তারপরই শূন্য থেকে ধপ্ করে মাটিতে পড়ে গেল। ভাবলাম, গুলী কাজ করেছে। কিন্তু ভাবা কাজে এল না। বাঘ আবার লাফ দিল এবং কাঁটাবন পার হয়ে আমার মাচানের উপর এসে পড়ল। দুটো থাবাই তখন আমার পায়ের সামনে। সমস্ত মুখের গহ্বর দেখতে পাচ্ছিলাম, হয়ত তার হুঙ্কারের সঙ্গে কিছু লালাও আমার মুখে এসে পড়েছিল।

আমি তখন হতভম্ব হয়ে গিয়েছি, বন্দুকের নল ঘোরাবার উপায় ছিল না। বাঘ কিন্তু মাচানে বেশীক্ষণ ঝুলতে পারল না, কাঁটাবনের উপরেই আছাড় খেল,



এক লাফে বাঘ মাচানের উপর এসে পড়ল

তারপর সেখান থেকে লাফের পর লাফ মেরে দূরে চলে গেল এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মনে হল কোন শক্ত জিনিসের সঙ্গে তার জোরে মাথা ঠুকে গিয়েছে। এর পর পরিচিত গোঙানির শব্দ শুনলাম, নিশ্চিন্ত হলাম বাঘ এখন চলৎশক্তিহীন, মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া চালিয়েছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই ঝড় উঠল বিকট শব্দ করে। কয়েকটি জোর ঝাঁকুনিতে আমি যে মাচানে বসেছিলাম তার একটি ডাল দোফালা হয়ে গেল। প্রতিটি দমকা হাওয়ায় নাগরদোলার অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে লাগলাম। একবার মাচান-সমেত প্রায় মাটি ছুঁয়ে আবার উপরে উঠে যাচ্ছি, এই অবস্থায় Ready Trigger-সহ ভরা বন্দুক তলায় পড়ে গেল। বন্দুকটি আমার নয়, আমার সঙ্গে যে শিকারী এসেছিলেন তাঁর। ডাল দোফালা হওয়ার সঙ্গে শিকারী মাটিতে না পড়লেও আমার কাছ থেকে সরে গিয়েছিলেন। নলের মুখ ছিল ঠিক আমার নীচেই। বন্দুকের পতনকালীন একটি কাঁটা Trigger-এ লাগলেই আমার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে হত,

তবে সান্ত্বনা থাকত এইটুকু যে, বাঘ মেরে মরেছি। এমন কৃতিত্বকে কি বাজে বলা চলে!

শিকারে বিপদ কি কেবল বাঘ-ভালুকের সংস্পর্শে আসাতেই শেষ? সময়মত সাবধান হতে পারলে ওদের কাছ থেকে পার আছে, কিন্তু সাপের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি হলে পরিত্রাণ নেই, বিশেষ করে রাজগোক্ষুর, কাল-কেউটে, করায়ত বা চিতি বোরা। মানুষ তাদের শান্তিভঙ্গ করলে আর রক্ষা নেই। রাজগোক্ষুর বা কাল-কেউটের কথা ছেড়ে দিই, ওদের অনেক সময় বড় আকৃতির জন্য দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু চিতি বোরা বা করায়তের বাচ্চা কয়েকটা নুড়ি পেলেই তার তলায় বেমালুম আত্মগোপন করে ফেলে।

এবারকার কাহিনী এই বিষাক্ত জীবদের নিয়ে। লেপার্ড শিকারে এসেছিলাম, সঙ্গে ছিলেন একজন নবদীক্ষিত শিকারী, ইতিপূর্বে কখনও তিনি বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে ঢোকেননি। আমি এদিকে আসছি শুনে বন্ধুবর একেবারে সাহেবী মল্ল-বেশে শিকারের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন, দেহে জড়িয়ে থাকল গাঢ় সবুজ রঙের বুশ-শার্ট, নিম্নাঙ্গে হাফ-প্যাণ্ট, তারও তলায় দেখা গেল ব্যাণ্ডেজের প্রথায় বাঁধা পটি। পটির তলায় জবরদস্ত মোটা চামড়ার বুট। প্রতি পদক্ষেপেই জুতোর মচ্ মচ্ শব্দ যেন জঙ্গলের জানোয়ারদের জানিয়ে দিতে চায়—'তফাত যাও, তফাত যাও'। শিকারীর আগমনবার্তা এভাবে প্রচার হওয়ায় লেপার্ড আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা শুরু করে দিল। প্রথম দর্শনেই তার আকার আন্দাজে বুঝেছিলাম যে তার প্রাপ্তবয়স্ক হতে এখনও অনেকদিন সময় আছে। শিশু-বয়সে হয়ত মা পরিত্যাগ করায় নিজের সাবধানতা সম্বন্ধে উপযুক্তভাবে চালাক হয়ে উঠতে পারেনি। তাই আমরা ওর পিছু নেওয়ায় চোখে চোখ পড়লেই একটু পালিয়ে কাছেই যে কোন ঝোপ পেলেই তার মধ্যে ঢুকে পড়ছিল। এই পালাবার ব্যাপারে বুঝলাম, বন্ধুর জুতোই যত সব গণ্ডগোল বাধিয়েছে।

সারা সকাল ঘুরতে ঘুরতে দুপুর পার হয়ে গেল। দুজনের মধ্যে কেউই লেপার্ডকে জুতসই ভাবে বন্দুকের সামনে পেলাম না। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। পা থেকে কেডস্ দুটো ফেলে দিয়ে বাবু হয়ে ছায়ার তলায় একটি বড় পাথরের উপর দুজনে বসে পড়লাম। বসার সুবিধা পাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম, কিন্তু সহজলব্ধ আরামটি বন্ধুবর বুট ও পটির বাঁধন থাকায় ভোগে লাগাতে পারলেন না, গত্যন্তরে তাঁকে পা ঝুলিয়ে বসতে হল। পায়ের চারধারে

ডিমের আকারের ছোট-বড় পাথরের নুড়ি। কোন কাজ না থাকায় বন্ধুবর ঝোলান পা-কে ঠক্ ঠক্ শব্দ করে আমরা যে পাথরে বসেছিলাম সেইটায় ঠুকতে লাগলেন। তাছাড়া, বুটের ঠোক্করে পায়ের তলার নুড়িগুলি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে লাগল। বেশীক্ষণ এই অস্থিরতার আরাম বন্ধুবরকে ভোগ করতে হয়নি। আমি তাঁর পায়ের দিকে তাকাতে দেখি, ফুটখানেক লম্বা একটি সাপ বন্ধুর পায়ের দোলার সঙ্গে একটু দূরে মাথা তুলে দুলছে। হাঁ-করা মুখ। ছোট্ট হলে কি হয়, মুখের তুলনায় দাঁত দুটি বেজায় বড়। বন্ধু নিশ্চয়ই এ দৃশ্যটি দেখেননি। সাপের নজর বুটের দিকে থাকায় আমি ধীরে একটি বড় নুড়ি তুলে নিলাম; তারপর বেশ জোরেই নুড়িটি সাপের মাথা লক্ষ্য করে ছুড়লাম। কাজ হল, বিষধরের মাথা থেঁতলে গেল।

ইচ্ছা করেই 'সাপ সাপ' করে চিৎকার করিনি। যদি এরূপ সাবধানতার বাণী ভদ্রলোক শুনতেন তাহলে তাড়াহুড়ায় দাঁড়াবার চেষ্টা করলেই সাপ ছোবল মারায় কোন অসুবিধা বোধ করত না। যে সাপটি মারা পড়ল, সেটি করায়ত।



নিজের কান মলার পর বন্ধুবর ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, আর কখনও শিকারে আসবেন না।

এই জাতায় সাপের প্রেম অতি সাঙ্ঘাতিক, সহজে এদের কেউ কখনও বেজোড় হতে দেখেনি। বন্ধুকে বললাম—"এখান থেকে উঠে পড়, আমার মনে হয়

জোড়ের সাপ তোমারই পায়ের তলায় কোথাও লুকিয়ে আছে।" মরা সাপ এবং বাঁচা সাপের অস্তিত্ব অত নিকটে থাকায় আমার বন্ধুর মুখশ্রী ভয়ে কি-রকম হয়েছিল তার বর্ণনা দেবার চেষ্টা করব না। তবে এটুকু বলতে পারি, তিনি কর্ণ ও নাসিকা মর্দনের পর তাঁর ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে ও আমাকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন এই বলে যে—"জীবনে আর কখনও শিকারে আসব না"।

নরখাদকের পাল্লায়

পাখী-শিকারে জলার দিকে এসেছিলাম। সামান্য চেষ্টাতেই কয়েকটা স্নাইপ জুটে গেল। ফরেস্ট অফিসারকে খুশী করা প্রয়োজন ছিল, এর সঙ্গে দু'চারটে বেলে হাঁস পেয়ে গেলে মন্দ হতো না। হাঁস এমন সাবধানী পাখী যে কাছাকাছি বন্দুকের আওয়াজ হলে ডাঙ্গার ধারে আসতে চায় না।

দুরন্ত রাখার একগুঁয়েমিতে হাঁসগুলোকে শিক্ষা দেবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছিল। গাড়োয়ানটাকে একটা ডিঙ্গির খোঁজে পাঠাবো কি না ভাবছিলাম। কিন্তু সব দিক বিবেচনা করে দেখলাম, অতি লোভে বিপদকে অযথা ঘরে ডেকে আনা হবে। সন্ধ্যার আগে ফরেস্ট বাংলোতে ফিরতে হলে, আর দেরী করা নয়। পাকা রাস্তা থেকে এটুকু আসতেই যে সময় লেগেছে, ফিরতি পথে তার কম কিছু লাগবে না। তার উপর জঙ্গলী সড়ক এত সঙ্কীর্ণ যে অন্ধকারে গাড়ী একটু এদিক-ওদিক হলেই চমৎকার—এখানেই খাদের তলায় থেকে যেতে হবে।

বিদেশে বেঘোরে মৃত্যু আরামপ্রদ হবার সম্ভাবনা ছিল না। গাড়ীতে উঠলাম। একটু গুছিয়ে বসার সুবিধা পেতেই বন্দুকের একটি নলে লিথেল বল ও বড় গুলী ভরে নিলাম। দোনলা আমার অনেক দিনের শিকারের সাথী, বিশ্বাসী বন্ধু বিপদে কখন অসহায় ভাবতে দেয়নি। বড় গুলী ভরে নিয়েছিলাম, যদি কপালগুণে হরিণ বা বরাহ রাস্তার উপর এসে পড়ে।

গত রাত্রে মুষলধারায় বৃষ্টি হয়েছিল। এঁটেল মাটি মজে গিয়ে জমাট শিরীষ আঠার মত হয়ে আছে। চাকা থেকে ফুটখানেক মাটির ভিতর ঢুকে যাওয়ায় বলদ দুটো গাড়ী টানতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। মাটির মরণ কামড় যখন চাকার গতি রোধ করে দিচ্ছে তখন গাড়ী থেকে নেমে শুধু ভার কমাচ্ছি না, চাকাও ঠেলতে হচ্ছে। চাকা শক্ত মাটিতে উঠলে পুনরায় কর্দমাক্ত পদ-যুগলসহ গাড়োয়ানের পাশে এসে বসছি। এরূপ ঘনিষ্ঠতা যে গাড়োয়ান মোটেই পছন্দ করছিল না তা বিলক্ষণ বুঝছিলাম।

যাই হোক, টানা-হেঁচড়ার ধকল সামলে রাস্তায় এসে ওঠা গেল। প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে গেল এইটুকু আসতে। ইতিমধ্যে সময় সন্ধ্যার দিকে

ঝুঁকেছে। পাহাড়তলীর গা ঘেঁষে চলেছি। খানিকটা এগোতেই দু'ধারে খাদ এসে পড়লো। খাদের তলায় ছোট-বড় আগাছার ঝোপ। আলো-আঁধারির আড়ালে, বড় গাছের শুকনো গুঁড়ি অথবা চটা-ফাটা পাথরের চাঁই ভীতিপ্রদ আকার নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, কোন্‌টা যে কি কাছে না এলে নিঃসন্দেহ হবার উপায় নেই। একপ অবস্থায় দৃষ্টিকে নির্ভরশীল করতে হলে ইলেকট্রিক টর্চ একান্ত দরকার। দিনের আলোয় ফিরবো ঠিক ছিল, তাই টর্চ সঙ্গে আনা প্রয়োজন বোধ করিনি। অপরিহার্যকে পরিত্যাগ করায় বেশ দমে গিয়েছিলাম। গাড়োয়ান আমাকে দুর্ভাবনা থেকে বাঁচাল। লোকটা প্রস্তুত হয়ে এসেছিল, গাড়ী থামিয়ে তলা থেকে একটি আলকাতরায় চোবান মশাল বার করে আনল, তারপর আগুন লাগিয়ে চাকরটাকে শুধু ধরতে বলল না—হুকুম করল, 'সামনে চলো'।

চাকরটা এখানকার বাসিন্দা। কয়েকদিন আগে বাহাল হলেও প্রভুত্বের দাবী একমাত্র আমিই করতে পারি—কারণ মাইনে আমাকেই দিতে হয়। এই সব সত্য সমানে থাকায় দাবীর অপব্যবহারে অপমানিত বোধ করছিলাম, কিন্তু প্রতিবাদ জানাবার আগেই দেখি চাকরটা মশাল হাতে চলতে আরম্ভ করেছে। বশ্যতার এই নিদর্শনে মনে মনে যে খুশী হইনি এমন কথা বলতে পারি না। লোকটার আদেশ মানা স্বভাব না হলে বেশ অসুবিধায় পড়তে হতো।

মাইল-দেড়েক পথ এর মধ্যে পার হয়ে এসেছি। বলদ দুটো গাড়ী টানায় প্রাণপণ শক্তি নিয়োগ করলেও গাড়োয়ান প্রতিনিয়ত ওদের অক্ষমতার কথা উঁচু গলায় জানিয়ে চলেছে। হঠাৎ দেখি চাকরটা সোজা রাস্তা ছেড়ে ডাইনে খাদের দিকে দৌড় দিল। বেশী দূর যেতে পারেনি, কিছুর সঙ্গে ঠোক্কর লেগে আছাড় খেতেই মশাল হাত থেকে ছিটকে রাস্তার ধারে পড়ল এবং লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আকস্মিক ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দৃষ্টি আপনা থেকেই সামনের দিকে চলে গেল। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, দেখি অল্প দূরে রাস্তার মাঝখানে বাঘ, বড় বাঘ, একটা নয় দুটো। খুব সম্ভবতঃ শৃঙ্গার-রসের সূত্রপাত হচ্ছিল। এমনি একটি মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত ঘটনায় উচ্ছ্বাসের ছন্দপতন হওয়ায় একটি বাঘ চাকরটার পিছনে তাড়া করল, অপরটি বাঁদিকের খাদে লাফিয়ে পড়ল

সমস্ত ঘটনাটি ঘটতে আধ মিনিটের বেশী সময় লাগেনি। আমি ভরা-বন্দুক হাতে নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত হয়ে গিয়েছি। বাঁ দিকের বাঘ কোথায় ঘাপটি

মেরে বসে আছে কে জানে। চাকরটার কথা আর ভাবতে পারলাম না। লোকটা বোধ হয় এতক্ষণে শেষ হয়ে গেল।

এখন কি করা যায় ? সামনে, পাশে, পিছনে, সব দিক থেকে মৃত্যু ডাক দিয়ে চলেছে। ধীর চিন্তারও অবসর নেই। বলদ দুটো যোৎ ছেঁড়ার জন্য এমনই অস্থির হয়েছে যে বিশৃঙ্খল নড়াচড়ায় গাড়ীর চাকা একেবারে রাস্তার কিনারায় এসে হাজির। গাড়োয়ান লাগাম টেনে বশ মানাতে পারছে না। এরূপ অবস্থায় যে কোন মুহূর্তে খাদের তলায় পড়ে যাওয়া কিছুই আশ্চর্যের নয়।

মৃত্যুর সঙ্গে মিতালি ভালো লাগছিল না। গাড়ী থেকে নেমে পড়তে যাচ্ছিলাম, রাস্তার দিকে পা বাড়াতেই, গাড়োয়ান খপ্ করে আমার হাত ধরে বললে, "বাবু আমাকে একলা ফেলে যেও না।" নামা সম্বন্ধে দ্বিধান্বিত হতে হলো। শেষ পর্যন্ত গাড়ী মাঝ রাস্তায় এল বটে, কিন্তু তাতেই কি নিশ্চিন্ত হবার উপায় ছিল ! থেকে থেকে দুটো বলদই দারুণভাবে শিঙ নাড়া দিচ্ছে যেন গাড়ী ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচে। কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না যে বাঘ অতি নিকটেই কোথাও লুকিয়ে আছে। আমরা বাঘের গন্ধ না পেলেও গরুর কাছে লুকোবার উপায় নেই। যে অবস্থায় আমরা পড়ে গিয়েছি তাতে আগুন কাছে থাকা একান্ত দরকার। আর কিছু না হোক, বাঘ সামনে এসে পড়লে অন্ততঃ আত্ম-রক্ষার জন্য বন্দুকটা কাজে লাগাতে পারবো। সব দিক ভেবে গাড়োয়ানকে বললাম—"এসো দু-জনায় গিয়ে মশালটা কুড়িয়ে নিয়ে আসি, এখন বাঁচতে হলে আগুনই একমাত্র সহায়।" গাড়োয়ান ভয়ে এমনই জড়সড় হয়ে গিয়েছিল যে কিছুতেই ছাউনার আড়াল থেকে তাকে বার করতে পারলাম না।

অপরদিকে মশালের জ্বলন্ত আয়ু ক্রমান্বয়ে নিঃশেষিত হয়ে আসছে। কাল-বিলম্ব না করে জোর করেই গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। সামনে মশালের আলো, হাতে ভরা-বন্দুক, এগিয়ে চলায় কিছুমাত্র ভয়ের কারণ ছিল না, কিন্তু এক পা বাড়াতেই সতর্কতার নিষেধ শুনতে পেলাম। নিজেই অনুভব করতে লাগলাম—বাঘ একলা পেয়ে যদি পিছন থেকে আক্রমণ করে ! পরক্ষণেই হিসাব করে দেখলাম আমার পিছনে গাড়োয়ান আছে। দুটো মানুষের মাঝে নরখাদক না হলে আক্রমণ করবে না। তাছাড়া জঙ্গলে বন্দুককে চেনে না এমন জানোয়ার (সাপ ছাড়া) খুব কমই আছে। আত্মস্তোক সংগ্রহ হতে আগুন ও আমার মাঝে ব্যবধান কমিয়ে ফেললাম। সবে মশাল তুলেছি এমনি সময় বেগে চাকা চলার আওয়াজ শুনলাম। ফিরে তাকানোর আগেই গাড়ী প্রায় আমার ঘাড়ে

এসে পড়েছিল। কোনপ্রকারে পাশ কাটিয়ে দেখলাম গাড়োয়ান নেই অথচ বেগে গাড়া চলছে। বলদ দুটো দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে সোজা রাস্তা ধরে ছুটছে। দেখতে দেখতে যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হলো। হুড়মুড় করে গাড়ী-ভাঙ্গার আওয়াজ শুনলাম। অন্ধকারে কোন্ দিকের খাদে পড়ল বুঝতে পারলাম না।

বাঁদিকের বাঘ নিশ্চয় এতক্ষণ সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে ছিল, আমি গাড়ী ছেড়ে খানিকটা আসতেই চিলে ছোঁ-মারার মত গাড়োয়ানটাকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। ঘাড়ের উপড় কামড় পড়ায় বেচারা একটু টুঁ শব্দ করতে পারেনি। মানুষকে ঘাড় কামড়ে শূন্যে ঝুলিয়ে লাফ-মারা বাঘের কাছে কিছুই নয়, কারণ বড় বাছুরকে নিয়ে ঐভাবে ছোট নালা-লাফ মেরে পার হতে দেখেছি।

ইতিমধ্যে মশালের যেটুকু আলকাতরা পুড়তে বাকী আছে তার উপর নির্ভর করে ছয় মাইল পথ পাড়ি দেওয়া চলে না। বাংলোয় পৌছবার আগেই আলো নিভে যাবে; তখন মাঝপথে বাঘ না আসুক, সাপ ছেড়ে কথা কইবে না। বেশীর ভাগ জায়গাতেই জল। রাস্তাই এখন শৌখিন বিষধরের আশ্রয়। আসবার সময়েই তো একটা মারলাম। সময়মত দেখতে না পেলে গোখুরার কামড়ে একটা বলদ আগেই মরতো।

এই সব চিন্তার ফাঁকে যেটুকু ভরসার ইঙ্গিত পাচ্ছিলাম তা দুটি বাঘেরই আহারের সুব্যবস্থা। ভরসার সূত্র অবলম্বনে আমাকে কাপুরুষ স্বার্থপর ইত্যাদি প্রমাণ করা খুবই সোজা, কিন্তু যে অবস্থায় এসে পড়েছি, তাতে এক হাতে স্তিমিত মশাল অপর হাতে বন্দুক নিয়ে উত্তেজিত বাঘের পিছনে ঘোর অন্ধকারে একলা যাওয়া সুচিন্তিত আত্মহত্যার সমান। উপস্থিত এইরূপ সিদ্ধান্তে আসার মত উৎসাহ ছিল না। লোক দুটোর কথা ভেবে লাভ নেই, যা হবার তা এতক্ষণে হয়ে গিয়েছে। ওদের খোঁজ নিতে হলে আজকের রাতটা বাঁচতে হয়। গাছে উঠতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু প্রস্তুত হয়ে আসিনি। বড় খাকির চাদর বা মোটা কোমরবন্ধ সঙ্গে না থাকায় গাছে ওঠার কথা বাদ দিতে হলো। ঐ দুটি বস্তুর অভাবে, গাছের উপর তন্দ্রা এলে মাধ্যাকর্ষণের প্রতিক্রিয়া থেকে নিষ্কৃতি নেই।

বাঘ দুটোকে যেখানে দেখেছিলাম তার কাছেই বাঁদিকে টিলার মত একটি উঁচু জায়গা ছিল। ওখানে উপযুক্ত পাথরের আড়াল পেলে রাত্রিটা কাটিয়ে দিতে পারি। টিলার কাছে গিয়ে আর এক সমস্যায় পড়লাম। রাস্তা ও টিলার মাঝে

জল। কতকটা নালার মত, মৃদু স্রোত রয়েছে। প্রস্থে খুব কম হলেও ১৪।১৫ ফিট হবে। লাফ মেরে পার হওয়া যায় না। মশাল ও বন্দুক দুই হাত জোড়া করে রেখেছে, সাঁতার কাটারও উপায় নেই। জলে নেমে নালা অতিক্রম করতে হলে গভীরতার মাপ নেওয়া দরকার। রাস্তার ধারেই রাশ রাশ পাটকাঠি পড়েছিল, একটি তুলে নিয়ে জলের তলায় ঢুকিয়ে দিলাম। মাত্র ফুট-দেড়েক গভীর, তলায় বেজায় নরম পাঁক। ওপারে যেতে হলে অন্ততঃ একটা হাত খালি রাখতে হয়। গত্যন্তরে জলন্ত মশাল ওদিকে ছুঁড়ে দিলাম। পাথরের উপর পড়ায়, ন্যাকড়ার আগুন খানিকটা ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল।

এইবার জলে নামার পালা, এক পা ভিতরে দিতেই কোমর পর্যন্ত তলিয়ে গেলাম। সামনে সমস্ত দেহভার ঝুঁকে পড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে উপরের পা'কে কে যেন হিঁচড়ে জলের ভিতর টেনে নিল। তারপর সমস্ত দেহটাই চোরা বালিতে ঢুকে যাবার মত নীচের দিকে নেমে যেতে লাগল। পাঁক থেকে উদ্ধারের জন্য যতই প্রাণপণ চেষ্টা করি ততই পায়ের তলার মাটী সরে যেতে থাকে। সজ্ঞানে সমাধি—গহ্বরে ঢুকে যাচ্ছি, পরিত্রাণ নেই। কেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি ধীরে ধীরে আমাকে নিস্তেজ করে আনছিল। বেশ বুঝছিলাম কপাল আমার বিমুখ, এবার আর বাড়ী ফেরা হবে না। বাঁচা সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দেবার মত যখন মনের অবস্থা তখন বন্দুকের বাঁটের সঙ্গে একটি পাথরের চাঁইএর ঠোকা লাগল। জলের তলায় শক্তের সন্ধান পেতে বাঁচার আশা ফিরে পেলাম। তাড়াতাড়ি বন্দুকের বাঁট এদিক-ওদিক ঘোরাতে জানতে পারলাম, পাথরটি অতি বৃহৎ আকারের এবং উপর দিকে উঠে গিয়েছে। ওপারের সঙ্গে যোগও থাকতে পারে। সম্ভাবনা আমাকে বাঁচার জন্য এমনভাবেই উৎসাহী করে তুলল যে বন্দুকের বাঁটের সাহায্যেই নৌকার দাঁড়-টানার মত নিজেকে পাথরের কাছে নিয়ে এলাম। খানিকক্ষণ চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত কঠিন পদার্থের উপর দাঁড়াতে পেলাম। সবে উঠেছি এমনি সময় কাদামাখা হাত পিছলে প্রস্তুত ট্রিগারের উপর গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কানের পাশ দিয়ে গুলী বেরিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হলো, আমার মৃতদেহ ধরে দাঁড়িয়ে আছি। বিহ্বল অবস্থা কেটে যেতে, আর একটি ঘটনায় জানলাম মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া এখনো শেষ হয়নি। বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই দু'তিনটি বড় নুড়ি রাস্তার ধার থেকে গড়াতে গড়াতে জলে এসে পড়ল। অচল ভারী নুড়ি এরূপ অবস্থায় সচল হলে, কারণ সম্বন্ধে দ্বিমতের স্থান নেই। নিশ্চয় কোন বড় জানোয়ার এতক্ষণ ঐখানে আমার

পিছন থেকে আমারই গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। বন্দুকের আওয়াজে হঠাৎ পালাতে গিয়ে পায়ের তলা থেকে নুড়ি সরে যায়। হরিণ বা অন্য কোন জানোয়ার (ভালুক বাদে) মানুষের অত কাছে এসে কৌতূহল চরিতার্থ করে না; সুতরাং যে জানোয়ার আমার পিছনে দাঁড়িয়েছিল সে বাঘ: লেপার্ড নয়, কারণ বাঘের নাগালে লেপার্ড সহজে আসতে চায় না, দরোয়া বিবাদ চিরস্থায়ী বলে।

যে পাথরের উপর দাঁড়িয়েছিলাম তা কতকটা সোপানের মত স্তরযুক্ত, উপর দিকে উঠে গিয়েছে। চলন্ত নুড়ির সঙ্কেত মনে ছিল। পিছনদিকে ভাল করে দেখে নিয়ে চলতে লাগলাম। এপারে এসেই প্রথমে পকেট হাতড়ে L G টোটা বার করলাম। কাদার সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ মাখামাখি করে এমন নরম হয়ে গিয়েছে যে এদের দ্বারা একটি ভিজে বেড়ালও মারা যাবে না। অথচ এলোধাবরি তাগমারীর পক্ষে এই পংক্তির গুলী ব্রহ্মাস্ত্র বললেই চলে। হঠাৎ কোন জন্তু সামনে এসে পড়লে সঠিক নিশানার দরকার হয় না। নলটা ঠিক দিকে রেখে চোখ বুজে ঘোড়া টিপলেই হলো, গোটাকয়েক গুলী নির্ঘাত গিয়ে লাগবে এবং তিন ইঞ্চি বারুদের চাপ থাকায় কিছু কাজ করবেই।

বন্দুক খুলে দেখি বড় গুলাই নল থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। সম্বল এখন ৯ নম্বরের স্নাইপ-মারা ছর্‌রা। তবু মন্দের ভাল, কিছু না হোক বিপদে পড়লে বন্দুকের আওয়াজ করে ধোঁকা তো দিতে পারব।

মশাল ও বন্দুক হাতে নিয়ে টিলার উপরে উঠতে লাগলাম। চতুর্দিকে অতিকায় মনসার ঝোপ এবং বিক্ষিপ্ত পাথরের চাঁই ও আগে-পাশে উইএর ঢিপি। স্থানটি বিষধরের বিহার কেন্দ্র বললে অত্যুক্তি হয় না। পথ চলতে কখন সখন ঘাসের আড়াল থেকে ভিজে মাটি দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। যেখানেই নরম কাদা পাচ্ছি সেখানেই পরীক্ষা করে নিচ্ছি বাঘ জাতীয় জন্তুর পদচিহ্ন আছে কিনা। নরম মাটিতে পদচিহ্ন আমার কাছে ফটোগ্রাফের মত কাজ করে। পায়ে চলার কোন চিহ্ন না পেলেও বুকে-হাঁটা জীবের মোটা এবং টাটকা দাগ এক জায়গায় স্পষ্ট দেখতে পেলাম। বিশাল অজগর একটু আগেই এদিক দিয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ মহাশক্তিশালী সরীসৃপের বাস্তুভিটার কাছে এসে পড়েছি। নিকটেই এরূপ একটি জীবের অস্তিত্ব জানা সত্ত্বেও নিরাপদ স্থান খুঁজতে লাগলাম। যমের ঘরে বাঁচার চেষ্টা হাস্যকর হলেও গত্যন্তর ছিল না। একটু ঘোরাঘুরিতে মনের মত জায়গা পাওয়া গেল। মাথার অনেকটা উপরে একটি পাথরের চওড়া চাঁই ঠেকার স্থান থেকে ফুট-ছয়েক বেরিয়ে এসেছে এবং আমার দিকে শূন্যে

ঝুলছে। আশ্রয়টি কতকটা আধুনিক স্তম্ভহীন গাড়ীবারান্দার ছাদের মত। তলায় বসলে পিছন থেকে কোন জানোয়ার এলেও আমাকে দেখতে পাবে না। ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়া একেবারে অসম্ভব। সামনেও আর একটি বড় পাথর ছিল—কেবল দুপাশ খোলা রইল।

যথাস্থানে বসতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম ঠিক ঠেসান দেবার জায়গাটির পাশেই একটি মস্ত বড় ফাটল। আশঙ্কা হলো গর্তটির সঙ্গে যদি বুকে-হাঁটা নাগের যোগ থাকে তাহলে জায়গাটা কিছু ভারী জিনিস দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া ভাল। কাছেই একটা পাথরের চাঁই পড়েছিল, সেটা তুলে এনে গর্তের সামনে রাখলাম। পাথরটার ওজন মন-খানেকের কম হবে না, তুলতে একটু বেগ পেতে হয়েছিল। আন্তরিক চেষ্টায় কি না হয়। গর্তটা প্রায় সম্পূর্ণ বুজে গেল, এদিকে-ওদিকে যা ফাঁক রয়ে গেল তার ভিতর থেকে মা-মনসার প্রিয়পাত্রটিও বেরিয়ে আসতে পারবে না।

এতক্ষণে আবেষ্টনীর পরিচয় পেলাম। চারধারে ঘোর অন্ধকার, আকাশে একটিও তারা নেই, মাঝে মাঝে দাদুরীর ঐকতান শুনছি। রাত এগিয়ে চলেছে। কর্দমাক্ত কাপড়ের সংস্পর্শে রক্তের তাপ প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। যখন ব্যাঙ-এর ডাক থেমে যাচ্ছে তখন নিস্তব্ধতা যেন জায়গাটাকে প্রেতলোকে পরিণত করে দিচ্ছে। শরীর অবসাদগ্রস্ত হয়েছিল, ঠেসানের আরাম পেয়ে তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, হয়ত ঘুমিয়েই গিয়েছিলাম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম বলতে পারি না, হঠাৎ মনে হলো ঠেসানের জায়গা নড়ছে। ভিতর থেকে রীতিমত চাপ চলেছে, কোমরের ঠেসান না থাকলে এতক্ষণে এক মন পাথর স্থানচ্যুত হয়ে যেতো। মশাল নির্বাণোন্মুখ, স্ফুলিঙ্গ না থাকলেও ন্যাকড়ার আগুন সহজে নেবে না। সামান্য আগুন থেকে যেটুকু রশ্মি বার হচ্ছিল তাতেই দেখলাম হাতের পাশে অজগরের মুখ, মাথার পিছন দিকটা তখন গর্তের ভিতর রয়েছে। চোখের সামনে দেহের অতি নিকটে লকলকে দোফলা লম্বা জিবের দোলা, রোমাঞ্চকর দৃশ্য।

আশঙ্কা যে এমনিভাবে সত্যি হবে ভাবতে পারিনি। মাথাটি কোন প্রকারে বার করতে পারলে দেহের ঠেলায় শুধু আড়ালের পাথর সরবে না, আমাকেও সাপের বেষ্টনে দমবন্ধ হয়ে মরতে হবে। কালবিলম্ব না করে, যেটুকু মাথা দেখতে পাচ্ছিলাম তা-ই বন্দুকের বাঁট দিয়ে থেঁতলে দিলাম। লোহা-বাঁধানো বাঁট ও পাথরের সংঘর্ষণে সামনের মুখ ব্যাঙচ্যাপটা হয়ে গেল। বিস্ময়কর

ব্যাপার এই যে, ঐ অবস্থাতেই কেমন করে বাকি মাথাটা বেরিয়ে এলো। বিপদের মাঝেও সান্ত্বনা ছিল, সামনের মুখ থেঁতলে যাওয়াতে সরীসৃপ দৃষ্টি হারিয়েছিল—আমি কোথায় আছি জানবার উপায় ছিল না। সুবিধাটি কাজে লাগালাম, মাথার পিছন দিকটাও থেঁতলে দিলাম। সাপ আবার এমন জীব যে মাথা গেলেও সঙ্গে সঙ্গে মরাটা প্রয়োজন বোধ করে না। মাথাহীন দেহের চাপ পাথরের উপর দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে। ঠিক বুঝছি শেষ পর্যন্ত পাথরের ঠেকা সামলাতে পারব না, সুতরাং পাথর ঠেলে সাপ বেরিয়ে আসার আগেই জায়গাটি পরিত্যাগ করা দরকার। মরা সাপের আলিঙ্গনে একটি ভালুককে মরতে দেখেছিলাম। প্রথম বেড় চতুষ্পদীর দেহ বেষ্টন করার পর ভালুকের একটি থাপ্পড়ে অজগরের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল—তা সত্ত্বেও বেড়ের বাঁধন তো শ্লথ হলোই না, অধিকন্তু চাপ বেড়ে যাওয়ায় ভালুকের হাড়-পাঁজরা সশব্দে ভেঙ্গে যেতে লাগল। শেষ ফল কি হলো লেখা নিষ্প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা বসবার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিল। পরমুহূর্তে পাথর স্থানচ্যুত হয়ে ঢালুর দিকে গড়াতে লাগল। পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকিতে যে আওয়াজ হয়ে গেল তাতে নিজের সৌভাগ্যকে তারিফ না করে পারলাম না। আর যেরকমই বিপদ আমার দিকে আসুক না কেন, মাংসখাদক কোন জানোয়ার ঐ শব্দের পর এদিকে ভিড়বে না।

অজগরের আস্তানা থেকে একটু দূরে চলে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম, কারণ থেঁতলান মাথার রক্ত যেটুকু পাথরে লেগেছে সেটুকু রক্তই শোষক পিপীলিকাদের ডেকে আনার পক্ষে যথেষ্ট। এই জাতীয় মাংসভুক পিপীলিকা রক্তের আঘ্রাণ পেলে একত্রে লাখে লাখে চলে। বিরাট বাহিনীর পথে কোন প্রাণী এসে পড়লে তার রক্ষা নেই। মুহূর্তে অনাহূত এমনভাবেই আক্রান্ত হয় যে দংশনের জ্বালা সহ্য না করতে পেরে চলৎশক্তিরহিত হয়ে পড়ে। তারপর লুপ্তজ্ঞান প্রাণীর দেহকে অল্পক্ষণের ভিতর মনে হয় ঠাসবুনন চলন্ত কালো কম্বল দিয়ে ঢাকা হয়েছে। এই ঘটনার অভিজ্ঞতা অন্যত্র আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল, এখন বর্তমানে ফিরে আসি।

রাত তখন ক'টা ঠিক বলতে পারি না। পূর্বদিকে ক্ষীণ আলোর আবির্ভাবে অনুমান করলাম ভোর হতে দেরী নেই। কিছুক্ষণ পরে আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসতে টিলার ডগায় গিয়ে উঠলাম। রাস্তা জনমানবশূন্য। লোকচলাচল এদিকে আছে বলে মনে হলো না। বাংলোতে পৌছানো এখন প্রধান সমস্যা হয়ে

দাঁড়িয়েছে। টিলার তিন দিকে জল, কেবল একদিকে মাটির সঙ্গে যোগ আছে। যেদিকে যোগ সেখান থেকেই কাল গাড়োয়ানটাকে বাঘে নিয়েছিল। জলে নামবার সাহস নেই, অভিজ্ঞতা বিপদের ধ্বজা খাড়া করে রেখেছে। গত্যন্তরে বন রাস্তার দিকেই পা বাড়ালাম।

নামবার পথে cave-man-এর পন্থায় স্বহস্তে মারা বিষধরকে দেখলাম। বিশাল অজগরের অনেকটা দেহ গর্তের বাইরে পড়ে রয়েছে। চামড়াটা পেলে একটি দেখবার মত জিনিস সংগ্রহ হতো, কিন্তু ও-কথা ভেবে কোন লাভ নেই, এরই মধ্যে মাথার উপর শকুনি উড়তে শুরু করেছে—বাংলো থেকে লোক সংগ্রহ করে ফিরে আসতে আসতে সাপ শূন্য হয়ে যাবে।

পাখী-মারা ছররার উপর নির্ভর করে পথ চলতে লাগলাম। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। খানিকটা চলার পর ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। এখান থেকে রাস্তা দেখা যায়। কিন্তু ও-মুখো হবার আগে উল্টানো গরুর গাড়ী নজরে পড়ল; একটি চাকা আকাশের দিকে, আর একটির কিছু অংশ তখনও মাটিতে লেগে আছে। ছাউনীর পাত্তা নেই। গাড়ীর কাছে এলাম, যদি কালকের ঘটনার কোন সূত্র পাওয়া যায়। এই দিকে আসতে দেখতে পেলাম, গোটা ছাউনীকে কে যেন তুলে নিয়ে সন্তর্পণে মনসার ঝোপের উপর বসিয়ে দিয়েছে, ছাউনা সোজা অবস্থাতে খাড়া রয়েছে। ঘটনাটির সঙ্গে যেন ভৌতিক ক্রিয়ার যোগ ছিল। যাই হোক, ছাউনীর কাছে এসে উপস্থিত হলাম। কাছে আসতেই মানুষের গোঙানীর মত আওয়াজ শুনতে পেলাম। ছাউনীর সামনে এসে দেখি, গাড়োয়ান শুধু বেঁচে নয়, বসে আছে এবং মনসার কাঁটার সংঘর্ষণে তার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছে। আমাকে দেখে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না: একটি হাত বেকার, তা'ছাড়া ঝোপটিও মাটি থেকে ফুট তিনেক উপরে হবে। গাড়ীর কাছে গিয়ে বললাম—আমার কাঁধে ভর দিয়ে নামো। বহু কষ্টে এগিয়ে এল। ঝোপ থেকে নেমেই মাটিতে বসে পড়ল: একটা পা মুচড়ে গিয়েছে এবং ডান হাতের উপর অংশ মোটা ফিতে দিয়ে বাঁধার মত কাঁধ থেকে ঝুলছে। পকেটে বড় রুমাল ছিল, তাই দিয়ে গলা থেকে হাতটা ঝুলিয়ে দিলাম। তারপর আমার কাঁধের ওপর লোকটার দেহভার রেখে চলতে বললাম। গাড়োয়ান এবার কেঁদে ফেলল, বললে—বাবু, বেঁচে গেলেও মরে থাকব, বলদ দুটোর কি হলো কে জানে। আমি কি আর পারব! ডান হাতটাই গেল, বাঁচলেও খাব কি করে—আর গরু দুটো? প্রশ্নের অর্থ খুব সোজা, ক্ষতিপূরণ

সম্বন্ধে হিসাব একটা ঠিক করে ফেলেছিলাম। আভাস দিয়ে জানালাম—আগে সেরে ওঠো, তারপর যতটা পারি তোমার ব্যবস্থা করব। মনে হলো লোকটা আমার কথা বিশ্বাস করল।

আমরা চলতে লাগলাম। গাড়োয়ান সাঙ্কেতিক শব্দ করতে বলদ দুটোও আমাদের পিছন নিল। দুটোই দেখলাম খোঁড়াচ্ছে।

বাংলোর আগেই ফরেস্ট অফিসারের কোয়ার্টার। তাঁর আস্তানায় উঠে রাত্রের ঘটনা জানালাম। ভদ্রলোক একজন সহৃদয় কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। সমস্ত ঘটনা শুনে তখনি গাড়োয়ানকে টাউনের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। কুপের গাড়ী তাঁর জিম্মায় ছিল, উপযুক্ত ব্যবস্থা হতে সময় লাগল না। তারপর লোকজন সংগ্রহের জন্য রেন্‌জারের (Ranger) বাড়ী গিয়ে উঠলেন।

আধ ঘণ্টা বাদে ফরেস্ট অফিসার ফিরে এসে বললেন, "আজ রবিবার, লোকজন পেতে অসুবিধা হবে না, তিনটের আগেই এসে পড়বে। পুলিশেও খবর দিয়েছি, দারোগার নিজে এসে তদন্ত করা ভাল। হাজার হোক, একটা জলজ্যান্ত মানুষ গুমী হয়ে গেলে লোকে অনেক কথাই ভাবে। তাই বিবেচনা করে দেখলাম, লোকটা যদি মরেই থাকে তাহলে পুলিশের খাতায় ঘটনার নথি থাকা দরকার।" এতক্ষণে আপ্যায়নের ভিতরকার খবর পাওয়া গেল। আশল কথা, রক্তাক্ত মরা মানুষের সঙ্গে ফরেস্ট অফিসার যে জড়িয়েছিলেন না, তা পুলিশের খাতায় লেখা থাকা দরকার।

স্নানাহার সেরে একটু জিরিয়ে নিয়েছি এরই ভিতর ফরেস্ট বাংলোয় জঙ্গলীদের আগমন শুরু হয়েছে। আত্মরক্ষা' জন্য অস্ত্রের অভাব নেই। যে যা সামনে পেয়েছে তাই কুড়িয়ে নিয়েছে - গুলিডাণ্ডা খেলার ডাণ্ডাটা পর্যন্ত বাদ যায়নি। খানিকক্ষণ পরে ফরেস্ট অফিসার দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন। দারোগাকে চাকরটার সম্বন্ধে যা জানাবার ছিল বললাম। তিনি লিখে নিলেন এবং আমার বলার ফাঁকে দু'চারটা অবান্তর প্রশ্ন করতেও ছাড়লেন না। বুঝলাম ওটা কর্তব্যের ব্যাপার—সুতরাং প্রশ্ন যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ হলেও গায়ে মাখলাম না। জবানবন্দী শেষ হতে দারোগা বার বার হাত-ঘড়ির দিকে তাকাতে লাগলেন। সভ্য না হলেও সভ্য-সমাজে বাস করি, ইঙ্গিতটা হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম। অল্প সময়ের ভিতর জঙ্গলীদের যতটা সম্ভব beating (জঙ্গল ভাঙ্গা)-এর প্রথা শিখিয়ে দিলাম, সর্বোপরি পৈ পৈ করে বারণ করে দিলাম, বাঘ বেরিয়ে পড়লে

কেউ যেন না ছোটে। ধাবমান মানুষ কাছে দেখলেই এই জাতীয় জন্তুর অনুসরণ করবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে।

সব প্রস্তুত, আমরা বেরিয়ে পড়লাম। একটু খুশীই হয়েছিলাম সঙ্গে তিনটি বন্দুক থাকায়। দারোগা-বাবুটিরও দোনলা আধুনিক অস্ত্র প্রায় আনকোরা নতুনের মত, যেন কখনও ব্যবহার হয়নি।

কালকের ঘটনাস্থলে আসতেই দারোগাবাবু তাঁর তাঁবেদারদের শরীররক্ষীর মত রাস্তার দুধারে জঙ্গলমুখো করে দাঁড় করিয়ে দিলেন, তারপর নিজে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে প্রায় attention-এর চালে খাড়া হয়ে গেলেন। কাণ্ড দেখে আমি অবাক্। একটু কাঁচুমাচু হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, "এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি লাভ হবে?" ভদ্রলোক পরম অভিজ্ঞের মত উত্তর দিলেন, "বিটাররা তাড়া দিলে বাঘ এদিকে আসতে পারে এবং যদি আসে তো সোজা রাস্তা ধরে একেবারে গাঁয়ে গিয়ে হাজির হবে, আবও কতকগুলো লোক মরবে। আমার কর্তব্যবোধ আছে, এমনটি হতে দেবো না, ঘাঁটি আগলে দাঁড়িয়েছি।"

তাঁর হিসাব ঠিক বুঝলাম না, কারণ বিটিংএর সময় মানুষ একান্ত ঘাড়ের উপর না এসে পড়লে বাঘ প্রাণের ভয়ে সামনে ছোটে। রাস্তার দিকে যাতে না আসতে পারে তার ব্যবস্থা আগেই করেছি, কেবল stop-দের গাছে উঠিয়ে দেওয়া বাকী।

বাঘ যে এদিকে আসতে পারে না তা যুক্তি দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু যুক্তির সঙ্গে ধস্তাধস্তি তাঁর পদমর্যাদা সমর্থন করে না, সোজাসুজি আদেশ করতে পারলেই তিনি খুশী। অভ্যাস যখন প্রকৃতিগত ধর্ম হয়ে যায় তখন সেখানে বেশী কথা না বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। নিরুপায় হয়ে তাঁর কি বলবার আছে শোনবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম। দারোগা মানুষ, সুতরাং বলবার কথা কিছু-না-কিছু সব সময় পুঁজিতে থাকেই। তিনি গম্ভীর ভাষায় জানালেন, "মানুষটাকে যে বাঘেই মেরেছে তার কি প্রমাণ আছে? আগে বাঘ বের করুন, তারপর মরা মানুষের সন্ধান কিভাবে নিতে হয় দেখিয়ে দেবো।" বলবার ভঙ্গী ও জটিল ইঙ্গিতে যা বুঝলাম তাতে অধিক বাক্যব্যয় না করে তাঁকে গ্রাম আগলানোর জন্য রাস্তায় ছেড়ে খাদের তলায় জঙ্গলের দিকে এগোতে লাগলাম। বেশী দূর যেতে হয়নি, নালার কাছে বাঁশঝাড়ের কাছে আসতেই ঝোপ দারুণভাবে নাড়া খেলো, তারপর ঐ দিক থেকে এমন একটা গুরুগম্ভীর গলা-খাকরানী বেরিয়ে এল যে যতগুলি বিটার ছিল সব মুখ ঘুরিয়ে সোজা ছুটলো রাস্তার দিকে।

বিশৃঙ্খল ছোটায় কেউ আছাড় খেলো, কেউ নালায় পড়লো। তার সঙ্গে অকস্মাৎ ফরেস্ট অফিসার আমার পিছন থেকে গুলী চালিয়ে দিলেন—মুহূর্তের ভিতর রাস্তার দিক থেকে বন্দুক ছোড়ার পালটা জবাব এলো। নিশ্চয় আমার হিসাব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল, বাঘ তাড়া খেয়ে দারোগাবাবুর দিকে গেল নাকি? ফরেস্ট অফিসারকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, "কি মারলেন?" পিছন ফিরে দেখি ভদ্রলোক উধাও হয়েছেন। কোথায় গেলেন খোঁজ নেবার অবসর ছিল না।

জঙ্গল যেভাবে তোলপাড় হয়ে গেল তাতে বাঘ যে এ তল্লাট থেকে বহু দূর চলে গিয়েছে সন্দেহ রইল না। তথাপি বাঘে মারা মানুষটিকে খুঁজে বার করতে হয়। বন্দুক প্রস্তুত রেখে, এক-পা, দু-পা করে এগোতে লাগলাম বাঁশঝাড়ের দিকে। আমার পায়ের চাপেও দু'চারটে পাটকাঠি ভাঙ্গলো, কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়ার আভাস পেলাম না, জঙ্গল নিস্তব্ধ। উত্তেজনা আমাকে এমনভাবেই আয়ত্তাধীন করে ফেলেছিল যে বিপদের কথা একেবারে ভুলেছিলাম। চলতে লাগলাম, শেষ পর্যন্ত বাঁশঝাড়ের গোড়ায় এসে পৌঁছলাম। পায়ের তলায় চাকরটার কোটের খানিকটা অংশ পড়ে আছে —কোট আমারই দেওয়া, চিনতে অসুবিধা হয়নি। বাঁশঝাড়ের ভিতরটা দেখা দরকার ছিল, কিন্তু ঢুকি কেমন করে। যে-সব নূতন শাখা পূর্ণতা পাবার আগে শুকিয়ে গিয়েছে সেগুলোর ডগা তীক্ষ্ণধার বল্লমের মত হয়ে আছে। চার-পাঁচ ইঞ্চির ভিতর একপ একাধিক ধারালো বস্তু সবদিক থেকে মাথা খাড়া করে থাকলে কুড়ুল জাতীয় কোন অস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে ঢোকার উপায় নেই। পাতার ফাঁক দিয়ে ঝোপের ভিতর জায়গায় জায়গায় দেখা যায়, স্থানটি বালুময় ও পরিষ্কার। একটু নজর কড়া করতেই মনে হলো মানুষের দুটো হাত পড়ে রয়েছে। সঙ্গে এবার টর্চ এনেছিলাম—সুইচ টিপে দেখলাম দৃষ্টিভ্রম হয়নি। এখন ভিতরে ঢোকার পথ বার করতে হয়। এইটুকু জানতাম বাঘের মত বাবু জানোয়ার কাঁটার কাছে আসবে না। নিশ্চয়ই কোনদিকে বাঁশঝাড়ের ফাঁক আছে যেখান দিয়ে লোকটাকে ভিতরে নিয়ে গিয়েছিল। এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে আর এক জায়গায় খানিকটা কাপড়-ছেঁড়া পেলাম। এখানে একটি পায়ের তলার অংশও পড়ে ছিল—পায়ের কাছেই আগাছার ঝোপ। তার উপর দিয়ে ভারী ওজন ঘষড়ে নিয়ে যাওয়ায় পাতা-সমেত ডালপালা দুমড়ে গিয়েছে। বন্দুকের ডগা দিয়ে নরম ডাল সরাতে দেখলাম বাঘ বালির উপর

অনেকগুলি পদচিহ্ন রেখে গিয়েছে। দু'দিকে নরম ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করা জায়গাটি পরীক্ষা করতে বেরোলো উভয়ে মুখোমুখি হয়ে আহারে বসেছিল। লেজ ঝাঁটার কাজ করেছে। এখন প্রমাণগুলি দারোগাবাবুর সামনে প্রত্যক্ষভাবে ধরতে পারলে তাঁর সন্দিগ্ধ মনকে কিছুটা শান্ত করা যায়। ফিরতে গিয়ে একটু দূরে ভিন্ন ঝোপের তলা দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সবুজের মাঝে হলদে ও সাদা—ভাল করে দেখলাম, বেরোলো বাঘের দুটি থাবা। থাবার অনুপাতে বাঘ কত বড এবং কোথায় মুখ লুকিয়ে আছে অনুমান করা শক্ত নয়, কারণ সামনের পায়ের উপব ভর দিয়ে বসেছিল। বসার ভঙ্গীতে আক্রমণের পূর্বাভাস যথেষ্ট পাচ্ছিলাম। খাদ্য ও খাদকের মাঝে ব্যবধান এত অল্প যে বাঘ যদি প্রথম গুলীতেই না মরে তাহলে আমাকেই শিকার হয়ে যেতে হবে। ভয়, উত্তেজনা, সব-কিছুর যোগাযোগে অন্তরে হৃৎকম্পন শুরু হয়েছে। চোখ কান বুজে নিশানা করার উপযুক্ত টোটা দুইটি বন্দুকের নলেই ভরা ছিল, অত্যন্ত ক্ষিপ্রতাসহ বুক আন্দাজ করে দুটো ঘোড়াই একসঙ্গে টিপে দিলাম। তিন ইঞ্চি এল.জি. (L.G. --large game shots) এ-যাত্রা আমাকে বাঁচিয়ে দিল। ধোঁয়া কেটে যেতে দেখলাম পা দুটো নেতিয়ে পড়ার মত ঝোপের বাইরে চলে আসছে, তার সঙ্গে মাথাটাও ঝোপের বাইরে এসে ঢলে পড়ল। মাথা নিশ্চয় শতছিদ্র হয়ে গিয়েছে। লক্ষ্যের স্থান আন্দাজ করতে ভুল হলে ঘটনাটি অন্যরকম দাঁড়াতে পারত। পুনরায় টোটা পুরে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম ; অনেক ক্ষেত্রে মরা বাঘও বেঁচে ওঠে, এই সময় প্রস্তুত না থাকলে বিপদ : অনেকটা সময় কেটে যেতে, নিজেকে ধিক্কার দিলাম এই প্রতিজ্ঞা করে যে. ভবিষ্যতে বাঘের চরিত্র সম্বন্ধে ব্যতিক্রম স্বীকার না করে চলতি নিয়মের উপর আস্থা রাখব না। ডবল বন্দুকের আওয়াজ, অতগুলি গোলমাল, তথাপি অবশিষ্ট আহারের লোভে বাঘ যে অত কাছে আত্মগোপন করে সুযোগ খুঁজতে পারে এরূপটি আগে জানা ছিল না।

এবার দারোগাকে এখানে আনার জন্য রাস্তার দিকে ফিরলাম। প্রায় তিন শত গজ দূরে দারোগাবাবু লোকজনসহ অপেক্ষা করছিলেন। ভিড়ের কাছে এসে দেখি ফরেস্ট অফিসারও বিরাজমান। তিনি এখানে পৌছেই একটি মুখরোচক গল্প প্রচার করে দিয়েছেন, যথা—ভদ্রলোক বাঘের উপর গুলী চালানোর পরেই নাকি আমি গুলী-খাওয়া বাঘকে দেখতে গিয়েছিলাম। আমি সামনে পড়ে যাওয়ায় দ্বিতীয়বার গুলী চালাবার সুবিধা পাননি। চোখের সামনে বাঘ ধরবে আর

তিনি কিছুই করতে পারবেন না ভেবে, এদিকে লোক-সংগ্রহের জন্য এসেছিলেন। একনলা ধাসা বন্দুক দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যে দুবার গুলী চালানো যায়না তা দারোগাবাবু বিলক্ষণ জানতেন। উক্তিটির প্রয়োজন থাকায় বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেননি, কারণ এদিকে দারোগাবাবুর বন্দুক চালানোর একটা জবাবদিহির দাবী প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল—ফরেস্ট অফিসারের কথা চাপা দিয়ে বললেন, "আমাকেও ফাঁকা আওয়াজ করতে হয়েছিল, এতগুলো লোকের প্রাণ আমার জিম্মায় বুঝতেই পারছেন।"

বাঘ মারা আমার কাছে নূতন কিছু নয়। কৃতিত্ব সম্পূর্ণ ফরেস্ট অফিসারের উপর দিয়ে বললাম, "দারোগাবাবু, একটা বাঘ সত্যই মরেছে, লোকজন নিয়ে চলুন। ওখানে গেলে চাকরটার দেহাংশও দেখাতে পারবো।" আমার বলার ভঙ্গীতে এমন কিছু ছিল যে তাঁর মত মানুষও কথাটা মানতে রাজী হলেন। যথাস্থানে এসে রক্তাক্ত কোটের ছিন্নাংশ তুলে নিলেন, হাত ও পা দুটিও তুলে নেবার হুকুম দিলেন। আমি বাধা দিয়ে বললাম, "এই কাজটি করবেন না, দেহাংশগুলি নিয়ে গেলে দ্বিতীয় বাঘকে আর মারা যাবে না। আমি ঠিক বলতে পারি এদিককার বাঘ যেরকম সাহসী তাতে লোকজন সরে গেলে ঠিক ফিরে আসবে।" আমার একান্ত অনুরোধ যে তাঁর আদেশের প্রতিবাদ বলে প্রতিপন্ন হবে তা কল্পনাও করতে পারিনি। অনুরোধের প্রতিক্রিয়া এমনই কড়া হয়ে উঠল যে, ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ তাঁবেদারদের হুকুম করলেন, "হাত-পা সব তোল। বাঘেই যে এই কাণ্ড করেছে তা post-mortem-এ প্রমাণ হওয়া দরকার। পরীক্ষার ফল না পাওয়া পর্যন্ত আশা করি আপনি ফরেস্ট বাংলোতেই থাকবেন। আপনার তত্ত্বাবধানের জন্য বদলি করে কনস্টেবল মোতায়েন করে দেবো, আমিও মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যাবো।"

সোজা কথা, আমাকে নজরবন্দী করে ছাড়লেন। এখানে ক'দিন থাকতে হবে কে জানে। শিকারের উপর হতশ্রদ্ধা এসে গেল। মন যখন তিক্ত হয়ে উঠেছে সেই সময় ফরেস্ট অফিসার এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"বাঘের খাল পোষের ব্যবস্থা করেছি, চামড়াটার কি হবে?" নির্লিপ্তের মত উত্তর দিলাম– "ও বাঘ তো আপনিই মেরেছেন"। পরীক্ষার খবরে জানা গেল, বাঘের কামড়েই মরা মানুষের হাত-পা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, মানুষে চিবিয়ে খায়নি। নজরবন্দী থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাড়ী ফিরলাম।

জলা পাহাড়ের নরভুক্

ঘটনাটি ঘটেছিল জলা পাহাড়ের কাছেই। বেশীদিনের কথা নয়। যোগেনদা টাউনে এসেছিলেন জমি-জমা-সংক্রান্ত জরুরী কাজে। উকিল-বাড়ীতে বেশ দেরী হয়ে গেল। আসার সময় কাছারী থেকে কা'কেও সঙ্গে আনতে পারেননি, কারণ দুজন বরকন্দাজই মুহুরীর সঙ্গে খাজনা আদায়ের জন্য মহালে চলে গিয়েছিল। আজ সকালে আসার কথা ছিল, কিন্তু ফেরেনি। মোটা টাকার কিস্তি, তার উপর দিনকাল যা পড়েছে তাতে সাবধান না হলে নিজেকেই গুণগার দিতে হয়।

উকিল-বাড়ী থেকে ফেরার সময় কোন সঙ্গী না পাওয়ায় একলাই ফিরতে হলো। ফাঁপরে পড়ে গেলেন। ভয়ের কারণ একটি নয়। প্রথম, চাকা ও নরম মাটির সংঘর্ষণে জায়গায় জায়গায় গভীর গর্ত হয়ে গিয়েছে। ঐ গর্তের ভিতর আচমকা পা পড়লে পুনরায় গোটা পা নিয়ে হাঁটার সম্ভাবনা থাকে কম। দ্বিতীয়, বিষাক্ত সরীসৃপের অবাধ আনাগোনা। ওরা ছোবলের সংস্পর্শে কা'কেও আনতে পারলে আত্মাকে শূন্যে হাঁটিয়ে ছাড়ে।

এর উপর হঠাৎ চিতাবাঘ বা দাঁতাল বুনো শুয়োরের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলে, জানোয়ার মানুষকে কিভাবে আপ্যায়ন করবে অনুমান করা শক্ত নয়। জানোয়ার ছাড়ান দিলেও রাস্তার ধারেই নীলকর সাহেবদের পোড়ো বাড়ীকে পাশ কাটাবার উপায় নেই। অতীতের কাহিনী আজও লোমহর্ষক ঘটনাকে জীবন্ত করে রেখেছে। দিনের বেলাতেও ওদিকে যেতে গা ছম্-ছম্ করে।

যোগেনদা দুর্গানাম স্মরণ করে রাস্তায় নেমে পড়েছিলেন, লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে লাগলেন। রাস্তার দুধারে ধানক্ষেত, বাঁশঝাড়, বাবলা গাছ এবং পচা ডোবা। বাবলা গাছের ঝোপগুলি নির্বিবাদে বাড়তে পেয়ে ঘন জঙ্গলের মত হয়ে গিয়েছে। বেলা তখন পড়ন্ত। যোগেনদার আশা ছিল কোনা-না-কোন চাষীর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে যাবে। ওরা সন্ধ্যার দিকে দল বেঁধে হাঁটে।

ক্ষেতজমির কাছে এলে যে যার মাচানে চলে যায় ফসল পাহারা দেবার জন্যে। এদিকে বুনো শুয়োরের উৎপাত বড্ড বেশী। অনেক সময় ওদের বাচ্চা ধরার লোভে চিতাবাঘও জমির ভিতরে ঢুকে যায়।

ইতিমধ্যে চারধার অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে। দৃষ্টি প্রায় অচল, কেবল দূরে কাছারী-সংলগ্ন শিবমন্দিরের শাদা দেওয়াল ঝাপসাভাবে দেখা যায়।

এইটুকু রাস্তা পার হতে পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া চলে,— কিন্তু পথ আর শেষ হতে চায় না। চোখের কাজ বন্ধ হওয়ায় কান খাড়া করে রেখেছিলেন। যে রাস্তায় চলছিলেন সেখানে কখন কোন্ দিক থেকে কি ঘটবে জানার উপায় নেই। হঠাৎ মন্দিরের দিক থেকে যে ডাক শুনলেন তাতে রক্ত হিম হয়ে যাবার যোগাড়। যেখানে আশ্রয়ের আশা, সেখানেই বিপদ প্রস্তুত থাকায়, যোগেনদা ভাবলেন রাত্রিটা নীল-কুঠিতেই কাটিয়ে দেবেন; কিন্তু নীল-কুঠির নাম মনে আসতেই ভিতরটা ছ্যাঁক করে উঠল, নিজের অজ্ঞাতেই বলে ফেললেন, "রাম রাম, দুর্গা দুর্গা"—স্ব-কর্ণে রামনাম শোনায়, দেবতাকে জোর গলায় স্মরণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়লো। শব্দের সঙ্গে আরো একটি সাবধানতার কথা ভাবতে লাগলেন। সচল শাদা কাপড়ের কথা। ঐ বস্তুটি দেখতে পেলে, শুয়োর ও চিতাবাঘ, এমন কি জঙ্গলের বড়কর্তাও (বড় বাঘ) সহজে মানুষের কাছে ঘেঁষতে চায় না। বুদ্ধি ঘটে আসায় দলিলপত্র বগলদাবা করে জামা খুলে ফেললেন; তারপর রজকের প্রথায়, থেকে থেকে মাথার উপর ঘোরাতে লাগলেন। শুকনো ডাঙ্গায় কাপড় কাচায় মনে বল পেলেন।

সামনে বিপদ, পাশে বিপদ, পিছনে কিছু আছে কিনা কে জানে। কোন দিক থেকেই যখন পরিত্রাণ নেই, তখন কপাল ঠুকে সামনে এগোনোই ভাল।

ইতিমধ্যে কাছারীর দিকে চিতাবাঘের ডাক থেমে গিয়েছে। যোগেনদার চলা থামেনি, শেষ পর্যন্ত কাছারীর উঠানে পৌঁছলেন। অবাক্ কাণ্ড, রোয়াকে লণ্ঠন নেই, ঘরের দরজা পযন্ত খোলা। তার মানে, এই আসছি ভেবে ঠাকুর বেরিয়েছিল—তারপর ওপাড়ার মশগুলি আড্ডায় জমে যাওয়ায় ঘরের দিকে আর ফিরতে পারেনি। কাল যখন খুশী এসে একটা অজুহাত দেবে আর কি। দলিল-পত্রের উপর কারোর নজর পড়েনি তো? মোকদ্দমার সময় এমনটি ঘটা কিছুই আশ্চর্যের নয়। ভিতরে ঢুকতেই পায়ের তলায় আঠার মত চ্যাটচেটে কোন তরল পদার্থে তাঁর প্রাচীন ও প্রিয় চটি আটকে যেতে লাগল, প্রায় ছেঁড়ার অবস্থা। প্রথমেই মনে হলো মাত্রাধিক্যের উদ্গিরণ। পানদোষে বেসামাল

হলে এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। তাড়াতাড়ি লণ্ঠন জ্বালাতে দেখেন থোকা থোকা জমাট রক্ত এবং কাছেই তাঁর রাত্রির আহার ঢাকা রয়েছে। ঢাকা হঠাৎ কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগায় বেশ খানিকটা ভাতের উপর উঠে গিয়েছে। দড়ির খাটও স্থানভ্রষ্ট। ঘরের ভিতর সব-কিছুতেই কেমন একটা তোলপাড়ের ভাব। হঠাৎ চিতাবাঘের ডাক কাছারীর একটু কাছেই শোনা গেল। তাড়াতাড়ি দরজায় হুড়কো লাগিয়ে দিলেন।

পল্‌কা টাটির দরজা মোটা কাঠের সাহায্যে বন্ধ হওয়ায় কতকটা নিশ্চিন্ত হবার অবসর পেলেন। বগলদাবায় যে গোপনীয় দলিল চাপা পড়ে ছিল তার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। এতক্ষণে মনে পড়ল সেটি এখনি ট্রাঙ্কে তুলে রাখা দরকার। খাট সরে আসায় ট্রাঙ্ক আরো ভিতর দিকে ঢুকে গিয়েছে। কাগজ-ভর্তি ভারী বাক্স টেনে বার করাও এক হাঙ্গামা। দলিলকেও বাইরে রাখা যায় না। গত্যন্তরে ট্রাঙ্কের উপর টানা-হেঁচড়া চলল। জমিদারীর কারবারে বলপ্রয়োগ অনেক সুবিধা এগিয়ে দেয়, যোগেনদার চেষ্টাও বিফল হয়নি। কোনপ্রকারে বাক্সটি খাটের তলা থেকে বার করে দলিলটি গুছিয়ে রেখে, ডালা ডবল তালা দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। আজকের রাতটা কাটাতে পারলে হয়, কাল যাহোক ব্যবস্থা করা যাবে।

হাঁফছাড়ার সময় পেয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন রাত ন'টা বেজে গিয়েছে। অম্লরোগী মানুষ, রাত্রির আহার সম্বন্ধে আর দেরী করা ভাল হবে না। কাজের মধ্যে এখন ঐটুকু বাকী। পিঁড়ে পেতে খেতে বসলেন। ঢাকনার বাকিটা খুলতে দেখেন একটি পায়ের দাগ, বড়সড় জানোয়ারের পা। কি সর্বনাশ! এ যে বাঘের থাবা। ভাতের অনেকটা অংশ পিশে দিয়েছে। মাটির মেজেতেও ভাতশুদ্ধ আধখানা থাবার ছাপ পড়েছে। বাঘ যেন টিপসই দিয়ে নিজের সনাক্তের ছাপ রেখে গিয়েছে। এতটা দেখার পর, যোগেনদা লণ্ঠন নিয়ে উঠলেন। দরজার কাছে আসতে দেখতে পেলেন কোমর পর্যন্ত উঁচু টাটির বেড়ায় ছেঁড়া ফিতেতে পানের বটুয়া ঝুলছে—তার সঙ্গে খানিকটা কাপড়। সন্দেহ রইল না ঠাকুরকে বাঘে নিয়েছে।

অকস্মাৎ আতঙ্ক যেন তাঁকে চেপে ধরল। বাঘ যদি আবার ফিরে আসে তো হালকা টাটির দেয়াল ছিঁড়ে ফেলতে কতক্ষণ? ঘরে একটিও অস্ত্র নেই। একনলা ঠাসা বন্দুক, টাঙ্গি, এমন কি রামদাটি পর্যন্ত বরকন্দাজরা নিয়ে গিয়েছে বাবুদের টাকা সামলাবার জন্য।

অবস্থার ফেরে অবসাদ তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল, ক্রমান্বয়ে তন্দ্রার ঘোরে জড়িয়ে পড়তে লাগলেন। প্রাণপণ চেষ্টা করেও চোখ খুলে রাখা সম্ভব হলো না। ক্লান্তি, উত্তেজনা, সব কিছু জড়িয়ে তাঁকে কাবু করে ফেলেছিল।

কাছারীর নাগালেই ক্ষেত-জমি। হঠাৎ তিনকড়ি বাগ্দীর মাচানে কেরোসিনের টিন বেজে উঠল। টিন পেটানোর সঙ্গে চিৎকার শুনে যতগুলি কাছাকাছি মাচান ছিল সব কটি থেকে টিনের আওয়াজ শুরু হলো। বিকট শব্দ। সকলেই বুঝেছিল কেবল শুয়োর তাড়ানোর জন্য ঐরকম একযোগে চিৎকারের প্রয়োজন হয়নি। আত্মস্তোকের প্রয়োজন থাকায় যোগেনদা ভাবতে লাগলেন, তাহলে বাঘ ঐদিকেই গিয়েছে। নিশ্চয় একলা যায়নি, বামুনঠাকুরকেও নিয়ে গিয়েছে। যোগেনদার ভিতর থেকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। নিশ্চিন্ত হলেন, আহার ফেলে বাঘ এদিকে আসছে না।

একজন মৃত্যুতে অপরের সান্ত্বনাকে নিন্দনীয় ভাবা স্বাভাবিক, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' প্রবাদ বাক্যটি উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

এদিকে টিন পেটানো থেমে গেলে কি হয়, সব ক'টা মাচানে মশাল জ্বলে উঠেছে। ঘোর অন্ধকারের মাঝে মশালের আগুন স্থানটিকে যেন শ্মশানভূমিতে পরিণত করে ফেলেছে। একটার পর একটা চিতা জলায় মনে হচ্ছে মড়কের মড়া পুড়ছে। কোনদিকে কোন শব্দ নেই। কেবল মানুষের হাতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের নৃত্য চলেছে।

জঙ্গল-ঘেঁষা গ্রামে মানুষের অভিজ্ঞতা যতই নির্ভরশীল হোক নিশ্চিন্ত হবার প্রতিশ্রুতি সব সময় থাকে না। বাঘেরও আচরণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন, কোন বাঘ ভীতু, কোন বাঘ বেজায় সাহসী, চালাক, কোনটা সাবধানতা সম্বন্ধে নির্বিকার। মানুষের মতই ওদের চরিত্রের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কূলকিনারা পাওয়া যায় না।

খুব সম্ভব অতি নিকটে টিনের শব্দ ও মানুষের চিৎকার শুনে বাঘ বামুন-ঠাকুরকে ফেলে পালিয়েছিল। এর পর বেশ খানিকটা সময় কেটে যেতে মশালের আলোও ঝিমিয়ে যেতে লাগল।

যোগেনদা সঙ্কেত-জড়িত শব্দের দিকে এতক্ষণ কান খাড়া রেখেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জেগে থাকা সম্ভব হলো না, বসা অবস্থাতেই হাঁটুর উপর কপাল রেখে ঘুমের মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন। বেশীক্ষণ আরাম কপালে ছিল না। আতঙ্ক গা ঘেঁষে থাকায় সামান্য শব্দতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল; শুনলেন, টাটির পাশে

ষ্টীলের ট্রাঙ্ককে কিছুতে যেন আঁচড়াচ্ছে। ঘুমের ঘোর তখন কেটে গিয়েছে, বাক্সের দিকে তাকিয়ে দেখেন সেটা নড়ছে। যত বড়ই ইঁদুর হোক, অত ভারী ট্রাঙ্ককে তো নড়াবার ক্ষমতা ইঁদুরের থাকতে পারে না। ঘরে আলো জ্বলছে, সুতরাং ভৌতিক ব্যাপারও সম্ভব নয়। ঘটনাটি উঠে দেখতে হলো। কাছে এসে দেখেন একটি প্রকাণ্ড থাবা, টাটির দেয়াল ফুটো করে বাক্সটা ঠেলার চেষ্টা করছে। আর কিছুক্ষণ এইভাবে চেষ্টা চললেই গোটা দেহ ভিতরে এসে পড়তে পারে। প্রথমটা বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু উপস্থিত-বুদ্ধি তাঁর সহায় হলো। যোগেনদা ট্রাঙ্কের একটা দিক তুলে ধরলেন, বাধা সরে যাওয়ায় বাঘের পা অনেকটা ভিতরে এসে গেল।

থাবা বাক্সের তলায় আসতেই প্রাণপণ শক্তিতে তার উপর বাক্স আছাড় মারলেন। বাক্সের কিনারা সশব্দে এসে পড়ল বাঘের নখের উপর। নখের উপর পড়তেই যোগেনদা সমস্ত দেহভার তার উপর চাপিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেঘ-গর্জনের মত হুঙ্কার দিয়ে হেঁচকা টানে বাঘ থাবা বার করে নিল। যোগেনদা বাক্সের উপর বসে পড়েছিলেন, হেঁচকায় মেঝের উপর পড়ে গেলেন।

পরের দিন তিনকড়ি এবং অন্য চাষীরা নায়েববাবুকে খবর দিতে এসে দেখে ঘর ভিতর থেকে বন্ধ—তাছাড়া রোয়াকে থোকা থোকা শুকনো রক্ত এবং দরজার পাশেই খানিকটা গর্ত। সন্দেহজনক দৃশ্য, চাষাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। অনেক ডাকাডাকিতেও যখন দরজা খুলল না, তখন জোর দিয়ে দরজা ভেঙ্গে ঢুকতে হলো। লোকগুলি ভিতরে প্রবেশ করে দেখে, নায়েববাবু অজ্ঞান অবস্থায় বাক্সের পাশেই পড়ে আছেন। চোখে-মুখে জল দিতে কিছুক্ষণ বাদে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল।

জ্ঞান ফিরে আসতে শুনলেন, বামুনঠাকুর মারা গিয়েছে। বাঘে মেরেছিল এবং তিনকড়ির মাচানের তলায় ফেলে গিয়েছে।

এত বড় বাঘ নাকি ওরা কখনও দেখেনি। ঘটনাটির খবর ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগল না। স্থানীয় দারোগাবাবুকে খবর দেবার পরই মেজবাবুকে বিশদ বিবরণসহ লম্বা জরুরী টেলিগ্রামে জানানো হলো—এখনি শিকারীর ব্যবস্থা না হলে চাষীরা ক্ষেতে যেতে পারছে না।

মেজবাবু জমিদার-পরিবারের মেজ ছেলে। বয়স যৌবনকে পাশ কাটালেও স্বাস্থ্য তাঁকে যুবক করে রেখেছে। ছেলেবেলা থেকেই কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, ঘোড়ায় চড়া, শিকার ইত্যাদি খেলাধুলার প্রতি বিশেষ আসক্তি থাকায় 'বাবু' খেতাবটি

কাজে লাগানোর অবকাশ পাননি। টেলিগ্রামে মানুষ মারার খবর পেয়েই জলা-পাহাড়ের কাছারীতে এসে উপস্থিত হলেন। লটবহর সঙ্গে কিছুই ছিল না। শিকারের জন্য যা একান্ত প্রয়োজন তাই নিয়ে এসেছিলেন। পুরো একদিন রেলপথে ভ্রমণের পর প্রায় আট মাইল গরুর গাড়ীর ঝাঁকুনি খেয়ে যে মানুষ ক্লান্তি বোধ করে না সে আবার কেমনতর জমিদার? এই ধরনের আলোচনা যখন প্রজাদের মধ্যে চলছিল, তখন মেজবাবু শিকারের আয়োজনে নেমে পড়েছেন।

রওনা হবার আগে তারযোগেই খবর দিয়েছিলেন যেন লাশ পোড়ানো না হয়। বামুনঠাকুরকে বাঘে মারা kill হিসাবে ব্যবহার করলে সামান্য চেষ্টাতেই বাঘকে পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এসে খবর পেলেন দাহক্রিয়া শেষ হয়ে গিয়েছে! বাঘ মারার একটা বড় স্বযোগ নষ্ট হওয়ায় খুবই খারাপ লাগল।

ঘটনার প্রধান সাক্ষী তিনকড়ি। তখন কিছু করার না থাকায় তিনকড়ির কাছ থেকে খবর নিতে লাগলেন, এর আগে বাঘ এদিকে মানুষকে ঘর থেকে বার করে নিয়েছিল কিনা, রাস্তায় বা মাঠে কোন লোক আক্রান্ত হয়েছিল কিনা, আক্রমণ করার সময় সামনে থেকে আসে না পিছন থেকে লাফিয়ে পড়ে। অত কাছে হঠাৎ মাচান থেকে চিৎকার করে ওঠায় বাঘ কোনরকম বিরক্তি প্রকাশ করেছিল কিনা, ইত্যাদি। উত্তর যা শুনলেন, তাতে লাভজনক কিছু পাওয়া গেল না। কি প্রকৃতির তা সম্পূর্ণ অনুমানের উপর দাঁড় করাতে হলো। মোটমাট যে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন তাতে জন্তুটিকে বেয়ানা চালের নরভুক্ বলা চলে। বার্ধক্য বা বিকলাঙ্গের অজুহাতে যারা মানুষ মারে তাদের সাহস আসে ক্ষুধার তাড়নায় এবং দৈহিক শক্তি অকেজো হবার দরুন। দু'একবার সাহস কাজে লাগলে মানুষ মারা সহজ হয়ে যায়।

বর্তমান আসামী, স্ব-হস্তে যোগাড়-করা আহার ছেড়ে এই অঞ্চল থেকেই চলে গিয়েছে—তার মানে দূর গ্রামে আহারের সন্ধানে ঘুরছে। শরীরে যথেষ্ট শক্তি না থাকলে এবং তার সঙ্গে বেজায় চালাক না হলে এরূপটি সম্ভব নয়।

বাঘের চরিত্র বা শিকার ধরার পদ্ধতি যাই হোক, এখন যেখানে মরা মানুষটিকে ফেলেছিল সেই জায়গাটা পরীক্ষা করা দরকার। তিনকড়িকে বললেন, "চল্ দেখিয়ে দে কোথায় বামুনঠাকুরকে ফেলেছিল।" তিনি জানতেন দুদিনের পুরানো পদচিহ্নে বিশেষ কিছু পাওয়া যাবে না, তবু যদি কিছু আশাপ্রদ জুটে

য়। যথাস্থানে এসে দেখলেন, জায়গাটি কর্দমাক্ত। বহুলোকের সমাগমে াটি একেবারে ময়দাঠাসা হয়ে গিয়েছে।

শিকারের গোড়াতেই যত রকমের কুলক্ষণ এগিয়ে আসায় উৎসাহ ঝিমিয়ে যাবার যোগাড় হয়েছিল। তবে মেজবাবু দমে যাবার পাত্র ন'ন। তিনি ভাবলেন, ঘর থেকে মানুষ টেনে বার করার সাহস যে বাঘের থাকে ও মানুষ ধরার পর যদি হাতে পাওয়া আহার পরিত্যাগ করে পালাতে হয়, তাহলে নয় কাছাকাছি কোন গ্রামে সে মানুষ মারবে অথবা আবার এদিকে ফিরে আসবে।

কারণ, ঘর থেকে মানুষ বার করার সাহস একটি ঘটনায় সংগ্রহ হয়নি। ওটা বেশ কিছুদিনের পুরানো অভ্যাস। তবে সব বাঘেরই আহার সন্ধানে টহল দেবার রীতি আলাদা। কোন বাঘ একদিন অন্তর একই রাস্তায় ফিরে আসে, কোনটি দুদিন, এইভাবে সপ্তাহকাল বা ততোধিক সময় পর্যন্ত প্রত্যাবর্তনের দিন স্থির থাকে। মেজবাবু ভাবলেন, জিম করবেটের (Jim Corbet, শিকারী) মত নিজেই বাঘের আহার হয়ে কোন মগুড়ায় অপেক্ষা করলে কি হয়। কিন্তু যেখানে বাঘেরই পাত্তা নেই সেখানে মগুড়ার কথা অবান্তর। আপন মনেই একটা ফন্দী বার করেন, তার জবাবে অপ্রিয় সত্য সামনে এলে ভিন্ন মতলবের দিকে ঘুরতে হয়। অনেকরকম ঘোরপ্যাচের তোলপাড়ে নাজেহাল হয়ে ভাবলেন, নায়েব মহাশয়ের প্রতি বাঘ আকৃষ্ট হয়েছিল। ঐ ঘরে শুলে কেমন হয়? ও-ঘরে শুতে হলে, নায়েব মহাশয়কে তাঁবুতে যেতে হয়। কাপড়ের ঘরে উনি শোবেন বলে মনে হয় না, তবু বলে দেখা যাক। প্রস্তাবটি উত্থাপন করতেই যোগেনদা বললেন, সে কি একটা কথা হলো, আপনি শোবেন খোড়ো ঘরে, আর আরাম করব আমি আপনার তাঁবুতে? আপনি হলেন মুনিব, আর আমি—"। আপত্তির কারণ বুঝতে মেজবাবুর সময় লাগল না।

আরাম-ভোগের জন্য মেজবাবু এখানে আসেননি। আসলে আজ থেকেই টোপ ফেলে কোন্ জায়গায় বসবেন ঠিক করে এসেছিলেন।

তাঁবু ঘিরে যেভাবে চুলী জ্বালানো ও লোকজনকে দেহরক্ষী হিসাবে রাখা হয়েছে তাতে আবেষ্টনীতে শিকারের আবহাওয়া অপেক্ষা বাইজী-নাচের প্রত্যাশা বেশী। এই ব্যবস্থার পিছনে যে স্বাচ্ছন্দ্য দেবার আন্তরিক চেষ্টা ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। ঐ কারণেই মেজবাবু বললেন, "ব্যবস্থা খুব ভাল হয়েছে, তবে অত সুখ আমার ধাতে সইবে না। দেরী হয়ে গেলে সব-কিছু পণ্ড হয়ে যেতে পারে, তাই আজ থেকেই আমি নিজে একটু খানা

তল্লাসী করে আসি। পূর্ণিমার রাতে আলো ধরার জন্যে লোকেরও দরকার হবে না। বন্দুকে লাগানো ১৮ সেলের (shell) টর্চ (Torch) তো আছেই, তাছাড়া আলাদা একটি ছোট টর্চ পকেটে রইল, আপনার কিছু ভাবনা নেই। মানুষ-খেকো বাঘের সঙ্গে রাত্রিবেলা একলা পরিচয় করতে যাবার প্রস্তাবে সকলেই আপত্তি তুললেন, কিন্তু মেজবাবু একবার কোন সিদ্ধান্তে এলে তার পরিবর্তন অসম্ভব।

যোগেনদাকে তোয়াজ করার প্রয়োজন থাকায় আহারে পর বিশ্রামের পালা শেষ করে বিকাল থেকেই বন্দুকের কলকব্জা দেখে নিতে লাগলেন।

কোন্ পকেটে কোন্ টোটা রাখবেন, তাড়াতাড়ি কিভাবে বার করবেন, অভ্যাস করে দেখা দরকার ছিল। তাঁব শিকার তো উঁচু মাচান বা হাতীর উপর থেকে হাওদায় চড়ে গুলী চালানো নয় যে একজন পিছন থেকে যাবতীয় প্রয়োজনের সরবরাহ করবে। মৃত্যুর সঙ্গে খেলার উৎসাহ দেখে অনেকেই ভাবল— নিশ্চয় কোন ঘরোয়া ঝগড়া হয়েছে, বাবু আত্মহত্যার জন্য এখানে এসেছেন!

বিকাল পার হয়ে সন্ধ্যা এসে গিয়েছে। এরই ভিতব চাঁদের আলো গাছ-পালার ফাঁক দিয়ে উঁকিমাবা শুরু করে দিয়েছে, মেজবাবুও চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। যে-সব চাষীকে বাবুর দেহরক্ষী হিসাবে সংগ্রহ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই উবে গিয়েছে—তাঁবুতে বাবু শুচ্ছেন না শুনে। যে কয়জনকে চোখে দেখা যাচ্ছিল তারাও চারধারে চুলি জ্বালিয়ে তাঁবুর মধ্যে গা-ঢাকা দিল। ভিড় কমে যাওয়ায় যোগেনদা উস্‌খুস্ করছেন দেখে মেজবাবু বললেন, "আপনি ঘরে ঢুকে হুড়কো দিন।" না চাইতেই একান্ত প্রয়োজনীয়কে পেয়ে যাওয়ায় যোগেনদা বললেন—"হুজুর যখন বলছেন তখন আপনার আদেশ অমান্য করি কেমন করে।" কথাটা শেষ করেই বাধ্যতার প্রমাণ দিতে সময়ক্ষেপ করলেন না।

যোগেনদা যে সত্যই ভিতরে গিয়ে হুড়কো লাগাবেন এতটা বিশ্বাস করতে পারেননি। তাঁর ব্যবহারে আদর্শ প্রভুভক্তির নমুনা দেখে মেজবাবু মনে মনে হাসলেন। বন্দুকের ঘোড়া (trigger) পরীক্ষা করে, দুই নলে দু'রকম টোটা ভরে নিলেন। তারপর আমাদের চেনা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। গম্যস্থল বলে নির্দিষ্ট কিছু ছিল না, চলাটাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য, যদি প্রার্থিত জীবটির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। পরিষ্কার ও জানা রাস্তা পেলে বাঘ কখনও অন্য পথে চলতে চায় না। খুব সম্ভবতঃ কাঁটার ভয়েই এরূপটি হয়ে থাকে, কারণ বাঘের পায়ের তলায় sponge rubber-এর মত প্যাডিং (padding) থাকে নিঃশব্দে

হাঁটার জন্য। চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেই এগোচ্ছিলেন—চতুর্দিক বলতে পিছনটাও বাদ দেননি, মাঝে মাঝে ওদিকটাও ঘুরে দেখে নিচ্ছিলেন—কারণ, হিসাব-করা আক্রমণে বাঘ কখনও সামনে থেকে আসে না। খানিক পথ হাঁটার পর মনে হলো একটু দূরে বাঘ তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে এবং মাঝে মাঝে জঙ্গলের দু'পাশে তাকাচ্ছে। ফিনফোটা জোৎস্নার আলোয় দৃষ্টিভ্রমের প্রশ্ন ছিল না। মেজবাবু বন্দুক ঠিক করে দাঁড়িয়ে গেলেন। বাঘ তখন টর্চের পাল্লার বাইরে, একশ গজের উপরে হবে।

আশ্চর্যের কথা! মানুষ-খেকো বাঘ, রাস্তার মাঝখানে লোভনীয় আহারকে দেখেও সোজা তাঁরই দিকে এগিয়ে আসছে। ষাট গজের কাছাকাছি আসতে বাঘ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। মেজবাবুও আলো জ্বালার আগে আন্দাজে যতটা সম্ভব মাথার উপর নিশানা ঠিক করে টর্চের সুইচ টিপবেন ঠিক করেছিলেন। সুইচের কাছে আঙ্গুল এগিয়ে গিয়েছে এমন সময় বাঘ লাফ মেরে কাছারীবাড়ীর দিকে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে গেল। তখন উত্তেজনা এমনভাবেই তাঁকে পেয়ে বসেছিল যে, কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।

খানিকক্ষণ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। ভাবতে লাগলেন বাঘের অস্বাভাবিক আচরণের কথা। হয়ত অন্যমনস্ক হয়েছিল, কিন্তু যে বাঘ নরভুক্ সে নিরালায় অত সুবিধার মধ্যে মানুষকে দেখে অন্যমনস্ক হয় কেমন করে? এছাড়া হয়ত আরও অনেক প্রশ্ন তাঁকে ভাবিয়ে তুলত কিন্তু কাছারীর দিক থেকে হৈ-চৈ-এর আওয়াজ উঠল। সব চিন্তা ফেলে মেজবাবু ছুটে গোলমালের জায়গায় এসে উপস্থিত হলেন। যা ভেবেছিলেন তাই ঘটেছে, যোগাড়-করা মানুষদের মধ্যে একজন কমে গিয়েছে। এইটুকু সময়ের ভিতর চিলে ছোঁ-মারার মত ভিড় থেকে মানুষকে নিয়ে যাবে এতটা ভাবতে পারেননি। অনুমান করেছিলেন, বাঘকে দেখে সকলে চীৎকার করে উঠেছিল।

ঘটনাটি এইরূপ, লোকটা প্রকৃতির ডাকে ঝোপের দিকে গিয়েছিল। কাজের শেষে রাস্তার দিকে পিছন ফিরতে বাঘ লোকটির উপর লাফিয়ে পড়ে এবং মানুষটি পড়ে যেতেই তাকে হিঁচড়ে ঝোপের ভিতর টেনে নিয়ে যায়। এত বড় বাঘ যে ওদিকে এগোতে কেউ সাহস পায়নি। লোকটাকে নিয়ে যাবার সময় তার গলা দিয়ে একটুও আওয়াজ বের হয়নি।

শান্তভাবে মেজবাবু সব শুনলেন। তার পরেই তাঁর মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। বললেন, শীগ্‌গির জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে তাঁর পিছনে আসতে। বলাটা

'অনুরোধের স্তরে ছিল, ফলে বেশীর ভাগ লোকই পিছনে আসার পরিবর্তে পিছিয়ে পড়ল। যে কয়জন সাহসী ছিল তারা মেজবাবুর বাতি-লাগানো বন্দুককে বিশ্বাস করে ফেলেছিল, নির্দেশকে এড়িয়ে যাওয়া দরকার বোধ করল না।

বন্দুক-সংলগ্ন আঠারো সেলের (shell) টর্চকে (torch) জ্বালিয়ে রাখার উপায় নেই, কারণ বালবের (bulb) আয়ু মাত্র সাত সেকেণ্ড, তারপরেই ফিউজ হয়ে যায়।

আলোটি কেবল গুলী চালানোর সময় জ্বালা হয়। পকেটের ছোট টর্চ খুব কার্যকর না হলেও, বাঘের চোখ খোঁজার জন্য ঐটুকুই প্রধান অবলম্বন। খানিকটা ঝোপের দিকে যেতেই যে গর্জন শোনা গেল তাতে সব কয়টি সাহসী পুরুষ যে যেদিকে পারল চোখ-কান বুজে ছুট দিল। বাঘ এত কাছে যে টর্চ ব্যবহার করা চলে না—কিছু দেখা গেলেও, দুই হাত জোড়া থাকায় বন্দুক চালানোর বিশেষ অসুবিধা হবে, কারণ কিছু ঘটলে নিশানা করার সময় পাওয়া যাবে না। গত্যন্তরে রেডি ট্রিগারযুক্ত বন্দুকে লাগানো টর্চই জ্বালতে হলো। যেদিক থেকে গর্জন শুনেছিলেন সেদিকে বাঘের চোখ দেখা গেল না। এদিক-ওদিক ঘোরাতে যেটুকু সময় লাগল তাতেই আলোর আয়ু শেষ হয়ে গেল। ঘন ঝোপের তলা তখন ঘোর অন্ধকারে চাপা পড়েছে। বাঘ কয়েক হাতের মধ্যেই তাঁকে দেখছে। অথচ মেজবাবু তাকে দেখতে পাচ্ছেন না। এরূপ অবস্থায় বাঘকে তাড়াতে হলে শূন্যে গুলী চালানো ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। বিকট আওয়াজের সঙ্গে গুলী বেরিয়ে যেতেই পুনরায় গর্জন শুনলেন, তার পরেই কয়েকটি শুকনো কাঠি-ভাঙ্গার আওয়াজ পেলেন। শুভ সঙ্কেত, বাঘ শিকার ছেড়ে পালিয়েছে, তবে কত দূর গিয়েছে বলা শক্ত।

এক হাতে বন্দুক ধরে পুনরায় ছোট টর্চের সাহায্যে জ্বলন্ত চোখ খুঁজতে লাগলেন, কারণ তিনি নিশ্চিত জানতেন নরখাদক যেদিকেই যাক সে মাঝে মাঝে ফিরে তাকাবেই। আলো কাছাকাছি সব জায়গাতেই ঘুরে এল, কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না।

এখন কি করা যায়? মানুষটা হয়ত বেঁচে থাকতে পারে। তাকে বাঘের গ্রাস থেকে বাঁচাতে হলে এখুনি চেষ্টা না করলে কাল আর তাকে পাওয়া যাবে না। শিকারীর আত্মমর্যাদা যেন ভিতর থেকে আদেশ দিল নিজের মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে মানুষটাকে বাঁচাও। তোমাকে বিপদের বাইরে রাখার জন্যই লোকটা এখানে এসেছিল। তুমিই ওর মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে, যদি নোংরা

কাপুরুষের মত ফিরে যাও। পরিহাসজড়িত অন্তরের আদেশ তাঁকে উত্তেজিত করে তুলল। সামনে কয়েক পা এগিয়ে আসতে ঘন কাঁটাগাছের ডাল তাঁর হাতের উপর এসে পড়ল। বিষাক্ত কাঁটার ঘনিষ্ঠতায় ভীমরুলের হুল ফোটানোর প্রতিক্রিয়া ছিল। হঠাৎ হাত নাড়াতেই ট্রিগারের উপর আঙ্গুলেও কাঁটা বিঁধে গেল। তার পরমুহূর্তেই অতি নিকটে কয়েক হাতের মধ্যে বিকট গর্জন শুনলেন। বন্দুকের দুইটি নলই খালি।

পকেট থেকে টোটা বার করার সাহসও নেই। সামান্য নড়াচড়াতেই বাঘের দৃষ্টি বেশী করে আকৃষ্ট হবে। নিশ্চল অবস্থায় মৃত্যুর অপেক্ষায় পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। এরই ভিতর বাঘের গোঙ্গানীর আওয়াজ শোনা গেল, এই জাতীয় শব্দের সঙ্গে মেজবাবুর বহুবার পরিচয় হয়েছে। নিশ্চিন্ত হলেন বাঘের শ্বাসক্রিয়া শুরু হয়েছে, আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ওর ভয়াল ভবলীলা শেষ হয়ে যাবে। প্রত্যাশায় ভুল হয়নি, কিছুক্ষণ পরেই আবেষ্টনী নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এইটুকু সময়ের ভিতর যে কালঘাম তাঁকে ভিজিয়ে দিয়েছিল বুঝতে পারেননি। উত্তেজনা স্তিমিত হওয়ায় মনে হলো বরফ দিয়ে তাঁকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। আরো খানিকটা সময় কেটে যেতে কাছারীর দিকে ফিরলেন।

উঠানে একটি লোকও নেই। তাঁবুর ভিতর থেকেও কোন মানুষের গলা পাওয়া যাচ্ছে না। নায়েব মহাশয়ের দরজা ভিতর থেকে বন্ধই আছে। পুরুষের আগমনে অন্তঃপুরিকাদের যেভাবে গলা খাকবানী দিয়ে সাবধান করে দেওয়া হয় ঠিক সেইভাবে মেজবাবু সঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করতেই একজন দু'জন করে তাঁবুর ভিতর থেকে পর্দানশীন পুরুষদের মাথা বার হতে লাগল।

ভীতচকিত নানারূপ মুখাকৃতি দেখে, জঙ্গলের বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করার ইচ্ছা এসেছিল, কিন্তু একটি মুহূর্তও নষ্ট করার সময় ছিল না—রাশভারী গলায় জানালেন, এখনি আট-দশটা মশাল চাই। নিজেদের কাপড় ছিঁড়ে, বাঁশ কিংবা ডালে বাঁধ আর আমার ঘি, তেল যা এসেছে তাই দিয়ে ভেজাও। মেজবাবুর গলা শুনে যোগেনদা একটু দরজা খুলেছিলেন, ঘি তেল দিয়ে মশাল জ্বালার আদেশ শুনে ধীরে আবার দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বাঘের হুঙ্কার ছিল ভাল, মেজবাবুর হুকুম তার চেয়েও ভীতিপ্রদ। বাঘের কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচা যায়, কিন্তু মেজবাবুর হুকুম না মানলে সব-কিছুই ঘটতে পারে। দেখতে দেখতে মশাল তৈরী হয়ে গেল। লোকেরা এবার সত্যি মেজ-বাবুর পিছু নিল। অতগুলি মশালের আলো বাঘকে খুঁজে পেতে সময় লাগল

না, দেখা গেল, মহাশক্তিশালী ভয়ঙ্করের প্রতীক অসাড় অবস্থায় পড়ে আছে। বাঘে-ধরা মানুষটি সজ্ঞানে পড়েছিল। লোকটার কথা বলার চেষ্টায় কতকগুলি জড়ান শব্দ বার হলো মাত্র—যা বলল তা অর্থহীন। ভয়ে লোকটা পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। গলায় বা মুখে কোথাও কামরের দাগ নেই। বাঘ ধরেছিল কাঁধের কাছে।

পিঠে যে থাবা পড়েছিল সেটি সাঙ্ঘাতিক। কাছারীতে নিয়ে পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট কড়াভাবে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেওয়ার যে যন্ত্রণা উঠল তা দেখার চেয়ে লোকটার মৃত্যু হলে ভাল হতো। রেলগাড়ীতে পাঠালেন, এ তল্লাটে ৫০ মাইলের ভিতর বাঘে-খাওয়া মানুষের শুশ্রূষার উপযুক্ত হাসপাতাল নেই। মেজবাবু বিশদ বিবরণসহ চিঠির মত লম্বা টেলিগ্রাম পাঠালেন ওষুধসহ ডাক্তারকে পাঠানোর জন্য। উপযুক্ত সময় ডাক্তার এসে পড়েছিলেন, তা না হলে লোকটাও বাঁচত না এবং লাখেরাজ চার বিঘা আবাদি জমিও বংশপম্পরায় ভোগদখলের অধিকার পেতো না।

সামান্য কাঁটাও যে ঘটনাচক্রের সহায়তায় বাঘ শিকার করতে পারে, মানুষকে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচাতে পারে, এ কথা কেউ বিশ্বাস করবেন না বলেই গল্পটি মেজবাবুর অনুমতি নিয়ে লিখতে হলো।

শিকার

পাহাড়ী দেশ, রামগড়ের কাছেই। বেলা পড়ে এসেছে, আকাশ ঘোরঘটা করে কালো মেঘে ভরে গিয়েছে, তার সঙ্গে ঝির্ ঝির্ করে ইলসে-গুঁড়ির মত বৃষ্টি। জামা-কাপড় ভিজে চপচপে হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে কখন জঙ্গলের এদিকে এসে পড়েছি বুঝতে পারিনি। শিকার মাথায় উঠে গিয়েছে, এখন একটা আশ্রয় পেলে বাঁচি।

মানুষের মাথা পর্যন্ত উঁচু খাড়াই ঘাস আর আগাছার ঝোপ ঠেলে আমরা এগুচ্ছিলাম। অন্ধকার যেভাবে জমাট বাঁধতে আরম্ভ করেছে তাতে এক-পা আগে কি পাছে যাবার উপায় নেই। ঝোপের আড়াল থেকে হঠাৎ বাঘ বা লেপার্ড সেখানে এসে পড়লে ভারী রাইফেলকে (rifle) shot gun-এর মত ব্যবহার করা চলবে না। কাছে shot gun-এর সুবিধা অনেক। বাঘ বা বরাহের মত জানোয়ারের উপর চোখ-কান বুজে বড় ছর্‌রার (L.G.) মার একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র। ছোট গুলী যেন vital spot খুঁজে বার করে। মাথায় লক্ষ্য করা গুলী লেজে লাগলেও বুককে ছেড়ে কথা কয় না। আমার হাতে যে রাইফেল ছিল তা 425 high velocity Westly Richard, 425 বোর নিয়ে যার কারবার তার নিশানা অব্যর্থ হলে কি হয় লক্ষ্যভেদের প্রথায় অনেক নিয়মকানুন মানতে হয়, অর্থাৎ শিকারীর দৃষ্টি রাইফেলের rear ও foresight এবং target-এর যোগ ঘটলে তবেই গুলী বধ্যকে বধ করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

সঙ্গে মালবাহীদের মধ্যে একজনের কাছে L.G. ছর্‌রা-ভরা দোনলা shot gun রাখা ছিল। লোকটাকে ঠিক আমার পিছনে হাতের নাগালে থাকতে বলেছিলাম। ওদের সঙ্গে নিয়েছিলাম পথ দেখানো এবং সুবিধা পেলে মাচান বাঁধার জন্য। পিছন ফিরে দেখি সব কয়জন উধাও হয়েছে। বিস্ময়কর ঘটনা, কোনরকম শব্দ না করে কিভাবে পালাল এবং কেনই বা এমনটি ঘটল বুঝতে পারলাম না। নিশ্চয় কিছু দেখেছিল, হয়ত এত কাছ থেকে দেখেছিল যে আমাকে সাবধান করে দেবার সময় পায়নি।

যখন বন্দুক বদলের জন্য পিছন ফিরেছিলাম, ঠিক সেই সময় আমার কাছ থেকে কোন ভারী জানোয়ার ঝোপের মধ্যে চলে গেল। দেহ দেখতে না পেলেও

ঝোপের ডগা নড়া থেকে বুঝলাম কে আমার পিছু নিয়েছিল। একাধিক লোক সঙ্গে থাকায় কাছে ঘেঁষতে সাহস পায়নি এবং কতক্ষণ আমার পিছু নিয়েছে তাও বলা কঠিন। আমি হঠাৎ পিছন না ফিরলে এখনি একটা কিছু ঘটে যেত। Ready trigger-এ আঙুল রেখে রাইফেল-সংলগ্ন টর্চ টিপলাম এবং বড় বাঘের খাড়াই আন্দাজ করে সন্দেহজনক ছোট আগাছার উপর আলো ফেলতে লাগলাম। এটা নিশ্চিত জানতাম, বাঘ ঝোপের আড়ালে দেহ লুকালেও চোখ আমার দিকেই আছে, আমার গতিবিধি লক্ষ্য করেছে। বাঘের চোখে আলো পড়লে ফিকে সবুজ রং যেন জ্বলে ওঠে। বিভিন্ন দিকে আলো পড়ায় এক জায়গায় জ্বলন্ত চোখ নজরে পড়ল বটে, কিন্তু রং তার ডগডগে লাল এবং একটার সঙ্গে আর একটার ব্যবধান এত কম যে ভুল করেও বাঘের চোখ ভাবা চলে না। তাছাড়া, চাহনী যেন নিশাচর পাখীর মত, যেমন প্যাঁচা। খরগোশের মত ছোট জানোয়ারের চোখেও আলো পড়লে এইভাবে জ্বলে। ভারী রাইফেল দিয়ে প্যাঁচা বা খরগোশ মারবার জন্য এখানে আসিনি। বন্দুক অন্য দিকে ঘোরাতে যাচ্ছিলাম, এমনি সময় দেখি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি এপাশে-ওপাশে দুলছে এবং আস্তে আস্তে মাটি থেকে উপরে উঠে যাচ্ছে। রোমাঞ্চকর দৃশ্য, দেহ নেই তবু দৃষ্টি শূন্যে দুলছে। চোখের তলায় মাঝে মাঝে আলোর নড়াচড়ায় মোটা কালো দড়ির মত কিছু চক চক করে উঠছে। ভয়কে সামলাতে হলে অনুমানে সাপের মত বলা যেতে পারে, কিন্তু সন্দিগ্ধ আত্মস্তোকই জিজ্ঞাসা করে বসে মানুষের কোমর পর্যন্ত উঁচুতে মাথা তুলতে পারে সে কোন্ জাতের সাপ? যেখানে দৃষ্টির দোলা দেখেছিলাম ঠিক তার কয়েক হাত দূরে ঝোপের পাতা নড়তেই জ্বলন্ত দৃষ্টি যেন উড়ে কিছুর উপর পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে বাঘের বিকট গর্জন (কাশির মত বেজায় মোটা গলাখাকরানির শব্দ) শুনলাম। তারপরই জঙ্গল তোলপাড় হয়ে গেল। বাঘ দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কোন্ দিকে পালাল বুঝতে পারলাম না। পরক্ষণেই পালানোর কারণ দেখলাম, রাজগোক্ষুর। এতক্ষণ তারই দৃষ্টি দেখছিলাম।

অদ্ভুত ঘটনায় আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত হয়ে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ বাদে নিজেকে ফিরে পেলাম। জ্বলন্ত দৃষ্টির দোলা আর দেখতে পেলাম না। আলো ভিন্ন দিকে ঘোরাতে একটি জীর্ণ প্রাচীন মন্দির চোখে পড়ল; চার পাশে গাছের ডালপালা আর শিকড় এমনভাবেই স্থাপত্যকে আড়াল করেছিল যে, টর্চের তীব্র আলোতেও প্রথমটা বুঝতে পারিনি যে সন্ধানের জায়গায় এসে

পড়েছি। এদিকে আসার সময় অনেক ইট-পাটকেলের সঙ্গে ঠোকর খেয়েছিলাম। ওগুলো ভগ্ন দেউলের বিক্ষিপ্ত অংশ। খবর অনুসারে বাঘের আস্তানা এবং রহস্যময় পরিবেশের নাগালে এসে পড়েছি। এই মন্দিরকে জড়িয়ে অনেক কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে। শিকারে বার হবার আগে অনেকেই সাবধান করে দিয়েছিল, সন্ধ্যার আগে ফিরে এসো।

অন্ধকারে বিপদ যখন চারধার থেকে ঘিরে ধরে তখন কোনপ্রকারে একটার কোপ থেকে রক্ষা পেলে মেনে নিতে হয় বাঁচা গেল। বাঘের আকস্মিক আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ায় ভেবেছিলাম বড়রকমের ফাঁড়া কাটল। বৃষ্টির সঙ্গে যেভাবে কাঁপুনি-দেওয়া হাওয়া বইছে তাতে মন্দিরের ভিতরে ঢুকতে পারলে আশ্রয় পাওয়া যাবে। মন্দিরের দরজা সামনে ছিল। দ্বার কবাটহীন, তথাপি প্রবেশপথ রুদ্ধ। বট এবং অন্যান্য গাছের মোটা শিকড় মন্দিরের ছাদ ও দেয়াল ফাটিয়ে দরজাকে আঁকড়ে ধরেছে। বটের শিকড় বেশীর ভাগই মাটি কামড়ে আছে। এতক্ষণ রাইফেলে লাগানো টর্চ জ্বালিয়ে রেখেছিলাম—কাজটা ভাল করিনি। এরই ভিতর ব্যাটারীর তেজ ঝিমিয়ে এসেছে। এরকম আবেষ্টনীতে অন্ধকার আমাকে আতঙ্কিত করে তোলে, যা দেখতে চাই না তাই চোখের সামনে এসে উপস্থিত হয়, তার সঙ্গে তেড়ে আসে কল্পনা। অসম্ভব রূপকেও বাস্তবে জড়িয়ে ফেলি—সংক্ষেপে অন্ধকারকে আমি ভয় পাই, আলোর ক্ষীণ রশ্মিও এরকম সময়ে আমার কাছে মস্ত বড় সহায়। রাইফেল-সংযুক্ত আলোক সতেজ রাখবার জন্য পকেট থেকে ছোট টর্চ বার করে বড় আলো নিবিয়ে দিলাম। এখন মন্দিরের ভিতরে ঢুকতে হলে শিকারের যাবতীয় সরঞ্জাম পিঠ থেকে নামাতে হয়। ব্যাটারীর কেস, পানীয় জলের ফেল্ট দিয়ে মোড় ফ্লাস্ক, কার্তুজ-ভরা বেল্ট ইত্যাদি। বস্তুগুলি শিকড়ের ফাঁকে হাত বাড়িয়ে মন্দিরের ভিতরে রাখলাম। এবার গোটা শরীর নিয়ে ভিতরে ঢোকার ব্যবস্থা করতে হয়। ছোট টর্চের আলোয় শিকড়ে যে ঘনীভূত জড়াজড়ি দেখলাম তাতে অশরীরী অথবা আধুনিক স্লিম-মার্কা শরীর না হলে শিকড়ের বেড়াকে পাশ কাটানোর উপায় নেই। কম বয়সে শক্তি-পরীক্ষার অনেক ঘটনা মনে আসতে লাগল। আধ ইঞ্চি মোটা লোহার শিকল পিঠের চাড়ে টেনে ছিঁড়েছি, দুই ইঞ্চি বারও বেঁকিয়ে দর্শকের তারিফ যোগাড় করেছি, আর মাটি-কামড়ানো শিকড় সামান্য হেলিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারব না? অতীতের দম্ভ বর্তমানের শক্তি-পরীক্ষায় এগিয়ে দিল। সবচেয়ে দুর্বল শিকড়ের উপর বলপ্রয়োগ

বুদ্ধির কাজ হবে—দুর্বলকে দাবিয়ে দেওয়াই তো শক্তির কাজ। বুদ্ধির ব্যবহার ঠিকই হলো, কিন্তু এগোতে সময় লাগল। দুর্বল স্থান মুচকে যেতে দেহকে দুই শিকড়ের মাঝখান দিয়ে ভিতরে দেবার চেষ্টা করলাম। মনের বল ও দৈহিক শক্তির মিলনে কোনপ্রকারে শরীরকে ভিতরের দিকে এনে ফেলেছি, এমনি সময় চাড়ের জায়গাতে হাত পিছলে যেতেই মোটা স্প্রীংএর মত শিকড় আমার বুকের উপর এসে পড়ল। এমন একটি জায়গায় আমাকে চেপে ধরেছিল যে দম বন্ধ হবার যোগাড়। এই সময় আমাকে কোন মাংসভুকের প্রয়োজন থাকলে, আমিই নিজেকে বেঁধে-ধরে তার মুখের গ্রাস তুলে দিতাম। এরূপ সম্ভাবনার কথা মনে আসতেই পকেট থেকে ছোট টর্চ বার করে বাইরেটা দেখে নিলাম। কেউ ওৎ পেতে আছে বলে মনে হলো না। কোনরকম বাধা না পাওয়ায় বুকের উপর চাপ বেড়েই চলেছিল। বাঁচার দরকার থাকায় পুনরায় শিকড়ের উপর হাত লাগালাম এবং মরিয়া হয়ে কিভাবে শক্তিপ্রয়োগ করেছিলাম বলতে পারি না, হঠাৎ যেন পিছলে মন্দিরের ভিতরে এসে পড়লাম। ঘষ্টানিতে বুক ও পিঠের চামড়া খানিকটা জখম হয়েছিল। ও-বিষয় চিন্তা করবার সময় ছিল না; তাড়াতাড়ি রাইফেলের সঙ্গে অন্য জিনিসগুলো তুলে নিয়ে দেখতে হলো মন্দিরের ভিতর বাঘের পরিবার আছে কিনা।

রাইফেলে লাগানো বড় টর্চই জ্বালি রাখতে হলো। পায়ের তলায় জমির অনুভূতি থেকে অনুমান করলাম মেজে পাথর দিয়ে বাঁধান। মেজের উপর নরম ধুলো জায়গায় জায়গার জমাট বেঁধে গিয়েছে। ঠিক পায়ের কাছে দৃষ্টি পড়তে চমকে উঠলাম—বিরাট সাপের খোলস, যেমন মোটা তেমনি লম্বা। এ খোলস রাজগোক্ষুরের না হয়ে যায় না। পরিত্যক্ত খোলসের পাশেই বিরাট থাবার দাগ। পদচিহ্নে কুলগৌরবের ছাপ আছে। স্বয়ং অরণ্যের অধিপতি যে মন্দিরের স্থায়ী বাসিন্দা সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না! কারণ, এখানে শোওয়া-বসা সব-কিছুর প্রমাণই ধুলোয় রেখে দিয়েছে। বাঘ যে এখানেই দিবানিদ্রার বিলাস সেরেছে সে খবরও জমাট ধুলোর কাছ থেকে পাওয়া গেল, চিৎ হয়ে শোওয়ার জন্য। যে সময়ে বাঘের আরাম-কামরা পরীক্ষা করছিলাম সেই সময় আমার বিপরীত দিকে বিকট হাসি শুনতে পেলাম। আতঙ্ক আমাকে চেপে ধরবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু ভয়কে তফাতে রাখার জন্য ভাবলাম শব্দটির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। যেদিক থেকে

শব্দ এসেছিল সেদিক দিয়ে মন্দিরে ঢোকার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা জানার জন্য বিপরীত দিকে আলো ফেলতেই আর একটি কবাটহীন ছোট দরজা বার হলো। পরক্ষণেই দেখি একটি হায়না দরজার কাছে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। টর্চের তীব্র আলোয় চোখ ঝলসিয়ে গিয়েছিল, আমাকে দেখতে পায়নি। ইচ্ছে করলেই গুলী চালাতে পারতাম, কিন্তু বিরত হতে হলো ; অপ্রত্যাশিত আলো দেখেও যদি ফিরে না যায়, তাহলে রাইফেলের বাঁট দিয়ে পেটানো ছাড়া আক্রমণ থেকে বাঁচবার কোন উপায় নেই। এইটুকু জায়গার মধ্যে গুলী চালালে হায়নার শরীর এফোঁড়-ওফোঁড় করে কোন দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে গুলী আমার দিকে ফিরে যে আসবে না তারও স্থিরতা নেই। আলো জ্বালিয়ে রেখেই পরের ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে হলো। কপাল ভাল, তীব্র রশ্মি সহ্য করতে না পেরে হায়না অন্ধকারে মিশে গেল। হায়না চলে যেতে দেখলাম, যেখানে জানোয়ার দাঁড়িয়েছিল সেটা সুড়ঙ্গের পথ, মাটির তলায় চলে গিয়েছে—দরজার সামনেই সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ। এদিকেও শিকড় নেমেছে, তবে যাতায়াতের কোন অসুবিধা নেই। হায়না জানিয়ে গেল কোন্ পথ দিয়ে বাঘ মন্দিরে যাওয়া-আসা করে। যে পথে হায়না ফিরে গেল নিশ্চয় সেই পথের শেষ জঙ্গলে গিয়ে মিশেছে। আজ যেখানে গভীর জঙ্গল হয়ে গিয়েছে, অতীতে হয়ত সেখানেই প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান ছিল। হয়ত অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরিকারা উদ্যানে পুষ্পচয়নের পর সুড়ঙ্গপথ দিয়ে মন্দিরে পূজার অর্ঘ্য দিতে আসতেন। পূজার প্রসঙ্গে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মহাকালীর মূর্তির কথা মনে পড়ে গেল। এই মূর্তি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। মণিমাণিক্য-ভূষিতা দেবী-দর্শনের আশায় দূর গ্রাম থেকে মানুষ এদিকে আসতো। কিন্তু দেবীর অস্তিত্ব তো মন্দিরে নেই। আলো ব্যবহার করে যা দেখতে পেলাম তাকে কালের ধ্বংসলীলা অপেক্ষা অধিকতর ধ্বংসকারী মানুষের জঘন্য প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গেল। পাথরের দেহ থেকে অলঙ্কার অপহরণের জন্য বিভিন্ন দেহাংশ খণ্ড খণ্ড করে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। কারণ অলঙ্কার এমনভাবেই পাথরের সঙ্গে আটকানো ছিল যে দেহ ও ভূষণের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে হলে অঙ্গচ্ছেদ ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

প্রাচীনের প্রতি আমার আকর্ষণ যথেষ্ট থাকলেও যে পরিবেশের মধ্যে গিয়েছি, তাতে ইতিহাসের সম্পদ সংগ্রহেরও উৎসাহ ছিল না। অজানা বিপদ আমাকে আত্মরক্ষার জন্য উদ্ব্যস্ত করে তুলেছিল।

নরখাদক বাঘের শিকারে আসা মানেই মৃত্যুর সঙ্গে খেলা, বিশেষ করে মাটিতে দাঁড়িয়ে মহাপরাক্রমশালী জীবটির সঙ্গে বোঝাপড়া করবার সম্ভাবনা থাকে বেশী। কিন্তু যেখানে কোনরকম সাবধানতার অবলম্বন নেই সেরূপ জায়গার অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে হয়নি। যে-সব আশঙ্কার কারণ মন্দিরের ভিতর পাওয়া গেল তাতে স্থানটি আশ্রয়ের পরিবর্তে ঘোরতর বিপদসঙ্কুল বলে মনে হলো। কোনপ্রকারে বাইরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। একমাত্র উপায়, সুড়ঙ্গপথ দিয়ে জঙ্গলের সন্ধানে ঘোরা। অনুমান ঠিক হলে নিশ্চয় একটি গাছ খুঁজে নিতে পারব, যার উপরে যেতে পারলে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে। তারপর যা ঘটতে পারে তা ভবিষ্যতের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল। যে সময় সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে ফাঁকায় আসবার কথা ভাবছিলাম ঠিক সেই সময় সুড়ঙ্গের ভিতরেই যে ডাক শুনলাম তাতে বোঝা গেল বাঁচার ইচ্ছা প্রবল হলেও আয়ুকে প্রয়োজন অনুসারে বাড়িয়ে নেওয়া যায় না। ডাক এসেছিল বাঘের কাছ থেকে, জরুরী ডাক—প্রেয়সীর সন্ধানে আদিরস-সংক্রান্ত ব্যাপার। বনের রাজা মিলনাকাঙ্ক্ষী, রানীর সন্ধানে বেরিয়েছে। মন্দিরের দিকেই আসছে। নিরালা প্রমোদগারে রানীর পরিবর্তে আমাকে দেখলে অবস্থা কিরকম দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়।

ভেবে দেখলাম, মন্দিরের ভিতরে যখন গুলী চালাবার উপায় নেই তখন সুড়ঙ্গের ভিতরই কপাল পরীক্ষা করা ভাল। এই পথে কয়েক পা এগোতেই দেখি রাস্তা সোজা নয়, আঁকা বাঁকা পথ—দুধারে পাথরের দেয়াল, ছাদও পাথরে গাঁথা। রাইফেল-সংলগ্ন টর্চ জ্বালাই ছিল, কিন্তু আলো জেলে রাখাও বৃথা। কয়েক পা অগ্রসর হলে বাঁকের ও-পাশে কি আছে জানবার উপায় নেই। কূট চিন্তার ফলেই বোধ হয় ভূগর্ভে এইরূপ স্থাপত্যে ঘেরা পথ তৈরী হয়েছিল। এরূপ দৃষ্টান্ত পুরানো দুর্গে দেখেছি। বিপদের চিন্তায় বিচার করে দেখলাম, এখন যে অবস্থায় এসে পড়েছি তাতে মরি বা মারির মন্ত্র মানা ছাড়া আর কোন গতি নেই। একমাত্র আশা, যদি সুড়ঙ্গের মধ্যে অপ্রত্যাশিত আলো দেখে বাঘ ভয় পায় এবং হায়নার মত উল্টোপথে ফিরে যায়। চোখের উপর আলো ফেলতে পারলে ঝলসানো দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দেখতে পাবে না, ঐটুকু সময়ের মধ্যে যদি বাঁচার কোন উপায় বার করা যায় তবেই রক্ষা।

হেড-লং কলিসনের (head-long collision) জন্য প্রস্তুত থেকেই এক-পা দু'পা করে এগোতে যাচ্ছিলাম। কিছুটা পথ আসতে মন্দিরের দিক থেকে

প্রতীক্ষমানা রানী, রাজার ডাকে সাড়া দিল। হতে পারে আমি মন্দিরে ঢোকার আগে রানীই আমাকে অনুসরণ করেছিল। প্রেমের বার্তা এখানে ওখানে সেখানে শোনা যেতে লাগল। অসহিষ্ণুতার লক্ষণ, খোঁজার তাগিদে রানী অস্থির হয়ে পড়েছে এদিক-ওদিক ঘুরছে।

পথ সঙ্কীর্ণ, দু'জন পাশাপাশি চলা যায় না। কতদূর অগ্রসর হলে বদ্ধ বায়ু এবং চামচিকের দম বন্ধ-করা উগ্র গন্ধ থেকে রেহাই পাবো জানি না, ভূগর্ভের বিষাক্ত বায়ু আমাকে জ্ঞানহীনের মত করে আনছিল। আমি চলেছি কতকটা স্বপ্নের ঘোরে হাঁটার মত। পা টলছে, তথাপি চলেছি। প্রতিটি পদক্ষেপে বুক দুরুদুরু করে উঠছে। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু যেন আমাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। সংক্ষেপে ঘটনাগুলির উপলব্ধি আছে, কিন্তু কিভাবে ঘটছে বুঝতে পারছি না। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল। বাঁদিকে দেয়ালের দিকে শরীর ঢলে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে শিকলে শিকলে ঠোকাঠুকিতে ঝনঝন্ শব্দ উঠল। শুদ্ধ আবেষ্টনীর বদ্ধ বায়ু যেন কম্পিত হয়ে উঠল। নিস্তব্ধতা বিধ্বস্ত হওয়ায় আর একটি শব্দ শুনলাম—একেবারে কাছে বাঁকের ওপাশ থেকে বিরক্তির অভিযোগ, তারপরই পলাতক ভারী জন্তুর পাদক্ষেপ থেকে অনুমান করলাম; বাঘ ভয় পেয়েছে; তা না হলে যে জানোয়ার শব্দকে সব দিক দিয়ে এড়িয়ে চলে তার পক্ষে এত সহজে আত্মপরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। বোধ হয় নতুন বিপদের সঙ্গে সামনাসামনি ঘনিষ্ঠতার আগে সুড়ঙ্গের বাইরে এসে পড়তে পারব। তখনও শিকলের উপর আমার দেহের চাপ ছিল—দেখলাম ছোট কুলোর মত মরচে-পড়া প্রকাণ্ড তালা মোটা লোহার শিকলের সঙ্গে আটকান—মজবুত রুদ্ধ কবাটকে আগলে আছে। কে বলতে পারে রামগড়ের গুপ্ত ধনের সন্ধান পেতে হলে রুদ্ধ কবাট খোলার প্রয়োজন হয় কি না। অতীতের কাহিনী কতক্ষণ কল্পনাকে ঘেরাও করেছিল বলতে পারি না—তবে খানিকটা সময় অতিবাহিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। বর্তমানে ফিরে আসতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার অবকাশ পেলাম—অভিজ্ঞতা জানিয়ে দিল বাঘ কাছাকাছি কোথাও নেই।

শিকল নড়ার আওয়াজে যে সুবিধা পাওয়া গেল তা কাজে লাগাতে হলে এখনি বাইরের দিকে চলতে হয়। সুড়ঙ্গের পথ কত লম্বা কিছুই জানি না, এদিকে আলোর তেজও একটু করে ঝিমিয়ে আসছে। অন্ধকারে পা বাড়াবারও সাহস পাচ্ছি না। সাপ মাড়িয়ে ফেললে ছোবলের আপ্যায়ন থেকে

পরিত্রাণ নেই। আত্মরক্ষার কথা ভাবতে গিয়ে মৃত্যুর ডাক এমনভাবেই চারধার থেকে শুনতে লাগলাম যে, শেষ পর্যন্ত বাঁচার চিন্তাই আমাকে মরিয়া করে তুলল। এটা নিশ্চয় জানতাম, যে সরীসৃপের খোলস মন্দিরের ভিতর দেখেছি সেই বিষধর পায়ের সামনে পড়ে গেলে, মাড়াবার দরকার হবে না, আলো থাক বা না থাক, তেড়ে এসে বিষদাঁতের ব্যবহার করতে সময় নষ্ট করবে না। সাপের কথা ভাবতে আলো জ্বালিয়ে রাখার প্রয়োজন বোধ করলাম না। কপালের গুণে বাঘ অত কাছে এসেও যদি ফিরে গিয়ে থাকে তা হলে আয়ু সম্বন্ধে হতাশ হবার কিছু নেই। ভিতরে ঘোর অন্ধকার, তাই বাঁকের দেয়ালে মাথা ঠোকা থেকে রক্ষা পাবার জন্য মাঝে মাঝে আলোর সুইচ টিপে দেখে নিচ্ছিলাম। দেয়ালের গায়ে হাত রেখে চলতে পারলে টর্চের ব্যবহার কমিয়ে ফেলার দরকার হতো না, কিন্তু কোন্ দেয়ালে কি আছে জানার উপায় না থাকায় টর্চের ব্যবহারই সঙ্গত মনে হয়েছিল। তাছাড়া, পাথরের গাঁথুনীর মাঝে গর্তের ভিতর একটু আগেই যে কাঁকড়া-বিছে দেখেছিলাম তার দৈহিক মাপের বর্ণনা দিলে অনেকে বিশ্বাস করবেন না যে বিষাক্ত কীটটির আকার প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা, তার উপর সমস্ত দেহ কালো লোমে ভরা। দুটি দাঁড়া সত্যই বড় গলদা চিংড়ির সমান। এদের দৌড় দেবার শক্তিও অদ্ভুত। যাই হোক, ওরাও জঙ্গলের ভয়াল জীব, সুতরাং বিপদের বর্ণনায় ওদের উপস্থিতিকে স্বীকার করলে অবান্তর কথা ভাবা উচিত হবে না।

নিঃশব্দে চলছিলাম। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি, এইবার ঠাণ্ডা এবং মুক্ত হাওয়ার অনুভূতি পেলাম। বাইরের হাওয়ার সঙ্গে বাঘের গর্জনও শুনতে পেলাম। একাধিক বাঘ একই জায়গায় জড় হয়েছে—গর্জনের পিছনে প্রেমালাপের অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার কলহ ছিল কিনা বলতে পারি না, একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, বাঘের দল দূরে আছে। কোথায় এসেছি জানবার জন্য রাইফেল-সংলগ্ন টর্চের সুইচ টিপলাম। আলো একটু জ্বলেই নিবে গেল। টর্চে হাত পড়তে ছ্যাঁক করে উঠল। টর্চের উপরটা বেশ গরম হয়ে গিয়েছে। তার মানে পিঠে বাঁধা ব্যাটারীগুলো নিজেদের মধ্যে অন্যায়ভাবে ছোঁয়াছুঁয়ি করে দম ফুরিয়ে ফেলেছে। এখন আলোর অন্য একমাত্র সম্বল পকেটে রাখা ছোট টর্চ। গত্যন্তরে তাই বার করে সুইচ টিপতে দেখি বাইরে এসে পড়েছি। সামনেই একটি আম গাছ। হাতের নাগালে একটি ডালও পেয়ে গেলাম। রাইফেল পিঠে ঝুলিয়ে উপরে উঠে যেতে কিছু অসুবিধা হলো না। এটা পুরানো অভ্যাসের

ফল। যাঁরা হাতী, beaters বা বেজায় উঁচু মাচান ব্যবহার করবার সুবিধা পান না তাঁরা শিকারের সঙ্গে আদিম প্রবৃত্তির যোগ ঘটানোর ইচ্ছা থাকলে তড়িৎবেগে গাছে ওঠার কৌশল আয়ত্ত করলে শিকারে বহুপ্রকারের সুবিধা পেতে পারেন। অবশ্য রাজা-মহারাজা বা অতিমার্জিতেরা বুনো অভ্যাসে দক্ষতা লাভ করবেন এমনটি আশা করি না। গাছে ওঠার আগে ছোট টর্চের আলোয় যতদূর দেখা যায় পরীক্ষা করে নিলাম। কোনো জানোয়ার ওৎ পেতে ছিল না। উপরে উঠে একটি দোফালা ডাল পাওয়ায় সেখানে গুছিয়ে বসলাম। আন্দাজের হিসাবে নিরাপদ স্থানে বসেছিলাম।

ইতিমধ্যে বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। মাঝে মাঝে দূরে বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে আকাশে মেঘগর্জন শুনছি, তার সঙ্গে মাঝে মাঝে পাতা-ঝরা জল পড়ার শব্দ। মেঘের ডাক ছাড়া জঙ্গল একরকম নিস্তব্ধই বলতে হয়। একটু নিশ্চিন্ত ভাব আসছিল, কিন্তু শিকারীর কান খাড়াই ছিল, গাছের তলায় চেনা চলার শব্দ আরামকে সরিয়ে দিল। রাইফেল ধীরে বগলে তুলে চলার স্থান এবং নীচের জানোয়ারের গতির ভঙ্গিতে উদ্দেশ্য খুঁজতে লাগলাম। সন্দিগ্ধ পা ফেলার বৈশিষ্ট্য থেকেই বুঝলাম তলার জীবটি বাঘ। তাহলে কি আমাকে গাছে উঠতে দেখেছিল? যদি দেখে থাকে তাহলে গাছে ওঠার সময়েই পিছন থেকে আমাকে ধরার সুবিটা ছিল বেশী। অমন সুবিধা পেয়েও আমাকে ছেড়ে দিল কেন? বহু কেনর সদুত্তর না পেলেও এটুকু বুঝেছিলাম যে, আমাকে মাটিতে না দেখলেও উপরে গাছের ডাল খোঁজার সময় ছোট টর্চের আলো দেখেছে—তাছাড়া, রাইফেলের বাঁট ডালে লেগে আওয়াজ হওয়ায় যেদিকেই বাঘের মুখ থাক শব্দের দিকে মুখ ফেরাতে হয়েছে, তার পর শব্দের কারণ জেনে এদিকে এসে পড়েছে। আচরণ দেখে নিশ্চিন্ত হলাম যে এইবার নরখাদকের সঙ্গে বোঝাপড়ার সুবিধা এসেছে। মানুষ-খেকো বাঘ না হলে এতখানি সাহস দেখানোর প্রবৃত্তি সাধারণ বাঘ বা লেপার্ডের দ্বারা সম্ভব হতো না। বাঘ গাছের কাছে আসার আগে গুঁড়িকে কেন্দ্র করে চারধারে প্রদক্ষিণ শুরু করে দিল।

প্রদক্ষিণের পথে পিছন দিকে থমকে দাঁড়িয়ে যাওয়ায় যে সম্ভাবনা আমাকে সতর্ক করে দিল তাতে নির্লিপ্তভাবে বসে থাকা চলল না। কোনপ্রকারে আশ-পাশের ডাল ধরে দাঁড়ালাম, যতটা সম্ভব পিছনদিকে ঘোরবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু চেষ্টা কাজে এলো না। আমি উঠে দাঁড়াতে অদৃশ্য জন্তুর চলা দ্রুত হয়ে উঠল। গাছের চারধারে কাদা-জলে ঘোরার জন্য যে শব্দ হচ্ছিল তাতে অনুমান করা

চলে, ধৈর্যচ্যুতি বাঘকে বেপরোয়া করে ছেড়েছে। বাঘের চেয়ে আমার উত্তেজনাও কম নয়, শিকারীর আদিম প্রবৃত্তি যেন আমার কানে দৃষ্টির শক্তি দিয়ে দিল। বাঘকে একটু বাঁদিকে এবং সামনে পেলেই আলো জ্বালতে পারি, অন্যথায় এদিকে-ওদিকে আলো ফেললে ঐটুকু ত্রুটির সুবিধা পেলেই বাঘ নরখাদক হলেও আত্মরক্ষার জন্য চোখের আড়ালে চলে যাবে। একটু পরেই বেশ উঁচু থেকে বেজায় ভারী জন্তু গাছের গোড়ায় আছাড় খেলো। বেসামাল পতন সম্বন্ধে কিছুমাত্র ভুল করিনি। যে-রকম জায়গায় বাঘকে চেয়েছিলাম ঠিক সেইখানে না পেলেও বন্দুকের ব্যবহার কোনপ্রকারে নেওয়া যায়। আমিও ধৈর্য হারিয়েছিলাম। আর বেশী সুবিধার জন্য বিলম্ব করা পোষাল না, শব্দের স্থান অনুমান করে আলো ফেলতে দেখি সত্যই বিরাট আকারের বাঘ, কর্দমাক্ত দেহ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে এবং আমাকেই ধরবার চেষ্টায় লাফ মারার জন্য পুনরায় প্রস্তুত হয়েছে। লক্ষ্যের জায়গা বুক না পেলেও মাথা একেবারে সামনাসামনি পেয়েছিলাম। ক্ষণিকের মধ্যে যথাস্থনে গুলী চালিয়ে দিলাম। Westly Rihard কোম্পানীকে শত নমস্কার, গুলী মাথায় লাগলে কি হয়, রক্ত বার হতে লাগল পেটের কাছ থেকে—যেখানে একরাশ কাদা উড়িয়ে গুলী কোথায় চলে গিয়েছে কে জানে। বাঘের মুখ এরই ভিতর অসাড় হয়ে কাদার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। রাইফেলের চক্র খাওয়া গুলী, ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেড়িয়েছে। একটু পরে আলস্য ভাঙ্গার মত যখন পিছনের পা দুটো সোজা করে দিল তখন নিশ্চিন্ত হলাম, এতক্ষণে ভয়াল শার্দুল মরার মতন মরল। বাঘ মরল বটে কিন্তু আমাকে মড়ার পাহারায় রেখে গেল। ওর চামড়াটা আমার দম্ভের পুঁজি। সুতরাং পাহারা না দিলেই নয়। পাহারায় না থেকে উপায় আছে? হায়না, ভালুক, বুনো কুকুরের দল যে কোনটা মাংস ছিঁড়ে খাবে। বাঘ বনের রাজা হলে কি হয়, মরেছে জানলে খেয়ে ফেলায় কোন আপত্তি ওঠে না।

উত্তেজনা স্তিমিত হবার পর শরীরটাও ঝিমিয়ে আসছিল। বিবেচনা করে দেখলাম, কড়া পাহারার প্রয়োজন নেই। একটু আগেই বন্দুকের আওয়াজে যেভাবে জঙ্গল তোলপাড় হয়ে গিয়েছে তাতে কোন জানোয়ার এদিকে আসবে না। জানোয়াররা বজ্রপাত ও বন্দুকের বারুদ-ফাটার আওয়াজের পার্থক্য জানে। একান্ত কোন মাংসভুক্ লোভ সামলাতে না পেরে এদিকে এসে পড়লে জলছিটকানোর শব্দে তার গতিবিধির সন্ধান ঠিক বুঝতে পারব।

নিশ্চিন্ত ভাব আমাকে এমনই বেকার অবস্থায় ফেলে দিল যে কোন একটা

কাজ যোগাড় না করতে পারলে হয়ত মরা বাঘকে নেড়েচেড়ে দেখার ইচ্ছাই প্রবল হয়ে উঠবে। এটা মোটেই শুভ লক্ষণ নয়; কারণ সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত বাঘ অনেক সময় মড়ার মত পড়ে থাকে, কিন্তু পরীক্ষারত জীবন্ত শিকারীর ছোঁয়া পেলে বাঘ স্বধর্মপালনে পিছিয়ে যায় না, শিকারীকে আদর-অভ্যর্থনা করে হাস-পাতালে পাঠায়—অনেক সময় রাস্তাতেই শিকারীর মৃত্যু ঘটে। বিবেচনা করে দেখলাম অযথা মরাটা ভাল কাজ নয়। অথচ একটা কিছু কাজ চাই, তা না হলে সজাগ অবস্থায় রাত কাটাই কেমন করে? বসে থাকতে থাকতে যদি ঘুম আসে এবং নীচুদিকে ঝুঁকে পড়ি, তাহলে পতন ও মৃত্যু সুনিশ্চিত। মনে পড়ে গেল—বিশেষ প্রয়োজনীয় কর্তব্যের কথা ভাবতে লাগলাম - যেভাবে ভিজেছি তাতে সর্দি নিমোনিয়া সবকিছুই হতে পারে। সুতরাং গরম দাওয়াই এখনি কাজে লাগানো দরকায়। গরম দাওয়াই পকেটেই ছিল। বিলিতী flaskএ রাখা বিদেশী খাঁটি দাওয়াই বেশ খানিকটা পান করে ফেললাম। পরিমাণকে অনুমানে ঠিক করতে হলে এরূপ ক্ষেত্রে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক একটু-আধটু মাত্রাধিক্য হয়েই থাকে।

ভেজালহীন ওষুধ তরলাগ্নির মত অন্তরে প্রবেশাধিকার পেয়ে আমাকে উর্ধ্বে তুলে নিল। তাতে বুঝলাম আমার আত্মাও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, ঘোর অন্ধকারে আলোকরশ্মি আমাকে জ্ঞানমার্গে তুলে নিয়েছে। অদৃশ্য শক্তি জ্যোতির্ময় রূপ নিয়ে সামনে উপস্থিত, অনুভূতির দ্বারা সবই দেখেছি—আনন্দ তেড়ে আসছে আমাকে মশগুল করে দেবার জন্য, সাত্বিক ও তামসিক আকর্ষণের মাঝে আমি উদ্‌ভ্রান্ত হতে বসেছি। এই সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমার কাছে অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। আত্মাও উত্তপ্ত উন্নত হয়ে কোন্ স্তরে উঠেছিল আজকে বলা সম্ভব নয়। তবে মনে আছে বজ্রপাতের গুরুগম্ভীর শব্দ আমার ধ্যানস্থ মনকে বিব্রত করায় প্রকৃতিকে অশোভন আচরণের জন্য ধমক দিয়েছিলাম এবং স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলাম—এই ধরনের অসভ্যতা চলবে না। আশ্চর্যের বিষয়, আদেশ অগ্রাহ্য হলো এবং এত বড় গুরুতর অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিলাম। বাধ্যতামূলক ঔদার্যের জন্য আমার ক্ষোভের কিছু নেই। ভবিষ্যতে যতই অশোভনীয় আচরণ হোক, অভিশাপ তোলা রইল ঠিক সময়ে কাজে লাগাব।

সময় কাটছিল, নিজেকে তাতিয়ে রাখা ছাড়া অন্য কোন কাজ ছিল না। ভাতের প্রতিক্রিয়ার বোধ হয় মশগুলি কেন্দ্রের বাইরে গিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ বাঘের নধর দেহ স্পর্শ করবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। মনে ছিল, আমি মাটি

থেকে ঊর্ধ্বে কোন বিশিষ্ট আসনে বসেছিলাম। নীচে নামতে হলে, শ্বেতপাথরে বাঁধান গ্রাণ্ড ষ্টেয়ার-কেস (grand staircase) দরকার, অভিনন্দন জানাবার জন্য সারবন্দী বন্দুকধারীরা সামরিক প্রথায় সেলিউট (salute) না দিলে আত্মাভিমানে ব্যথা পেতে পারে। সর্বোপরি নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে হবে। এতটা বাড়াবাড়ি চোখ খুলে স্বপ্ন দেখার মৌজ যখন আমাকে বেশ মাতিয়েছে সেই সময় কাছেই শ্যামবার (Sambar) হরিণের ডাক শুনলাম, ত্রাসের ডাক। তার পরেই কাছ দিয়ে ছুটে পালাল। এতক্ষণ ব্যোমে বিরাজ করছিলাম, মৌজ মেজাজকে যেখানে নিয়ে তুলুক, হরিণের ডাকে ত্রাসের সাড়া পেয়ে অন্তর মোচড় খেয়ে গেল, বাস্তবে ফিরে এলাম।

শ্যামবার ছুটে পালানোর পরে কিছুক্ষণ সময় কেটে গিয়েছে, পরের ঘটনার অপেক্ষায় রয়েছি। এবার অভাবনীয় ঘটনা ঘটতে লাগল। গাছের কাছে ভারী জানোয়ারের সন্ত্রস্ত পদক্ষেপ শুনতে পেলাম, কাদামাটিতে পা আটকিয়ে গেলে টেনে তোলার চেষ্টায় মনে হলো মরা বাঘ বেঁচে উঠেছে। বাঘ সামনে চলেছে। শিকারীর চরম সম্পদ অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে জীবহত্যার দম্ভ, তাই কেড়ে নিতে চায় মরা বাঘ! বিবেককে দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিলাম মরা বাঘকে আর একবার মারলে জীবহত্যার পাপ ডবল করে হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু রাইফেল বগলে তোলার আগে বাঘ সামনের দিকে একটু দূরে চলে গেল। শব্দ অনুসরণ করে চলার দিগ্‌নির্ণয় কিছুমাত্র ভুল করিনি। বাঘ যেদিকে গিয়েছিল সেই দিকে বিকট আর্তনাদ শুরু হলো। চীৎকার শুনলে মানুষের গলা বলে ভ্রম হয়। নরখাদক নিশ্চয় কোন মানুষকে আক্রমণ করেছে। কিন্তু এই দুর্যোগে, গভীর জঙ্গলে মানুষ এলো কেমন করে? দুপুর রাতে, একলা বাঘে-ভরা জঙ্গলে যে মানুষ ঘোরাফেরা করে, নিশ্চয় সে গুপ্তধনের সন্ধান রাখে এবং বাঘ-ভালুককেও এড়িয়ে চলার অভ্যাস আছে, যেমন গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ডাকহরকরা বল্লমের ডগায় ঘণ্টা বাজিয়ে ছোটে। কিন্তু ঘণ্টার আওয়াজ তো শুনিনি। তাও তো বটে, যে মানুষ গুপ্তধন আত্মসাৎ করতে চায় সে কি শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়ে ধরা পড়ার জন্য আত্মবিজ্ঞপ্তি প্রচার করবে? গভীর জঙ্গলে, দুপুর রাতে, একলা অরণ্যভ্রমণের বিলাস যেমন আশ্চর্যের ব্যাপার, তার চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা বাঘের সঙ্গে মানুষের মল্লযুদ্ধ। যেদিক থেকে চিৎকার শুনেছিলাম ঠিক সেই জায়গা থেকে ধস্তাধস্তির শব্দ আসতে লাগল। বাঘের শক্তি কি হতে পারে আমি তা জানি এবং আক্রমণের পর কিভাবে শিকারকে মারে সে খবরও

রাখি। স্বচক্ষে দেখেছি, পিঠের উপর চড়াও হয়ে একটিমাত্র কামড় ও ঝাঁকুনিতে পূর্ণাবয়ব মোষকে নিঃশব্দে ধরাশায়ী করেছে। প্রকাণ্ড মূলতানী ষাঁড়কে মেরে অবলীলাক্রমে নালার কাছ থেকে প্রায় নয় ফিট উপরে টেনে তুলেছে, যা ডজনখানেক জোয়ান মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এই মহাশক্তিশালীর সঙ্গে মানুষের মল্লযুদ্ধের কথা ভাবতে সবল আত্মার কথা মনে পড়ে গেল। নিশ্চয় বাঘের আত্মা স্বগোষ্ঠির কোন বিশেষ বাঘের সঙ্গে বোঝাপড়া চালিয়েছে। গা ছম্ ছম্ করে উঠল। আত্মার রূপ দর্শনে দ্বিধা থাকলেও কৌতূহল আমাকে চেপে ধরেছিল। ছোট টর্চই কোনপ্রকারে বাঁ হাতে বন্দুকের নলের সঙ্গে ধরে সুইচ টিপলাম। রাইফেল-সংলগ্ন টর্চের মত ছোট টর্চ তেজস্বী না হলেও, অস্পষ্টতার বাধা সত্ত্বেও ১০-১৫ গজের মধ্যে দৃষ্টিকে বিশ্বাস করা চলে। যে দৃশ্য দেখলাম তা অভাবনীয়। সত্যই বাঘের পিছনে একটি বিশালকায় মিশকালো লোমশ মানুষ দুই পায়ে ভর করে সোজা দাঁড়িয়ে এক হাতে বাঘের কাঁধ ধরেছে, অপর হাত পেটের কাছে। কালো হাতের নীচে বাঘের শাদা ও হলদে চামড়ার উপর যেন রক্তবহার স্রোত চলেছে। হঠাৎ বাঘ লোমশ মানুষকে কামড়ে এমন ঝাঁকুনি দিল যাতে উভয়কে একসঙ্গে মাটিতে আছাড় খেতে হলো। এই সময় দেখতে পেলাম তলার মানুষ একটি বিরাট ভালুক। অদৃশ্য আত্মার গোলমাল না থাকায় 'এক ঢিলে দুই পাখী' মারার সুযোগ ছাড়তে পারলাম না। নিশ্চিত জানতাম বাঘের মাথা ও কাঁধের মাঝে মারতে পারলে, বাঘের তলার জীবটির বুক বা গলাকেও গুলী এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেবে। Shol gun দিয়ে snap shot-এ একসঙ্গে একাধিক হাঁস বা snipes মেরেছি বটে, কিন্তু বাঘ ও ভালুকের মত জানোয়ারকে একসঙ্গে জোড়ে মারার সুবিধা কখনো পাইনি। তাড়াহুড়া না করে রাইফেলের নল ডালের উপর রেখে বেশ তোয়াজ করেই টিপ করলাম, তারপর ট্রিগার টিপে দিলাম। গুলী চলার পর বাঘের দেহ এতটুকু নড়ল না, কেবল মাথাটা ভালুকের মুখের উপর গিয়ে পড়ল। ভালুকও তখন অসাড়।

লক্ষ্যভেদের সাফল্য আমার আত্মশ্লাঘাকে চঞ্চল করে তুলেছিল। এরূপ অবস্থায় নিজেকে পুরস্কৃত না করলেই নয়, গরম দাওয়াইএর অনেকটা পড়েছিল। এক চুমুকে flask নিঃশেষ করে ফেললাম। ফলে দাওয়াই গলাধঃকরণের পর আমার অস্তিত্ব এমন একটি স্তরে উঠে গেল যার নাগাল পাওয়া সাত্ত্বিক আদর্শবাদীর পক্ষে সম্ভব নয়। সোজা কথা অসম্ভবকে সম্ভব করা আমার ইচ্ছাধীন

হয়ে গেল। ভয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ ঘটে। মড়ার পাহারায় বসে থাকার অপেক্ষা, ভালুক আর বাঘ দুটোকেই গাছের উপর তুলে রাত্রিটা মৌজে কাটা ঠিক করলাম। একবার মনে হলো, কে যেন কানের কাছে বলে গেল-সাবাশ পালোয়ান, এ তুমারি কাম বাঘের ওজন প্রায় সাত মণ এবং ভালুকও কম যায় না; তুমি না হলে একসঙ্গে তের-চোদ্দ মণ ওজন কেউ গাছের উপর তুলতে পারে? বাহবা আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলল। গাছ থেকে নামতে যাচ্ছি, অবাক্ হয়ে গেলাম পায়ের তলায় সব-কিছুই শূন্যে হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় পাহারার বালাইং কাটল, মল্লভূমিতে আবার কাদা-ছিটকানর আওয়াজ শুনলাম। টর্চের আলো ফেলে দেখি ভালুক কেমন করে বাঘের তলা থেকে বেরিয়ে পড়ে বড় ঝোপের দিকে টলতে টলতে চলেছে। কেবল পিছন ছাড়া আর কিছু দেখছি না। আন্দাজে শিরদাঁড়ার উপর গুলি চালাবার ইচ্ছা এলেও লক্ষ্যভেদ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা না থাকায় ভালুককে যেতে দিলাম। আসল কথা, গরম দাওয়াই আমার দেহ-মন-প্রাণ সব-কিছুই টলিয়ে দিয়েছিল। রাইফেল ছোঁড়ার রীতিনীতি মেনে চলার অবস্থা ছিল না। রাইফেলের নলকে বগলদাবা করে trigger টিপলে সত্যই আমার আত্মা আমার তাগমারিকে বাহাদুরী দিত। কিছুক্ষণ বাদে অনুভব করলাম আমার অমর আত্মাও খাবি খেতে আরম্ভ করেছে। বেশীক্ষণ সময় লাগল না, আমি ব্যোমে বিলীন হয়ে গেলাম। গাছের উপরেই জ্ঞান হারিয়েছিলাম। দোফালা ডালের মাঝে এমনভাবে আটকে গিয়েছিলাম যে নীচ থেকে টেনে নামানোও লোকের পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার হতো। নিরাপদ হবার জন্য আরামের স্থানটি নিজেই বেছে নিয়েছিলাম, তারপর কখন কিভাবে আটকে পড়েছিলাম মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম তখন সকাল হয়ে গিয়েছে, মুরগী তিত্তির ইত্যাদি বুনো পাখীর ডাক শুনছি। উঠে ভাল করে বসতে গিয়ে দেখি আরামের বাঁধন আমাকে আঁকড়ে ধরেছে। তার উপর সারা গায়ে সাঙ্ঘাতিক বেদনা, জ্বরও তেড়ে এসেছে, একশ তিনের কাছাকাছি হবে। বহু কষ্টে দুই ডালের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করলাম বটে, কিন্তু প্রত্যেকটি অঙ্গ যেন অবশ হয়ে গিয়েছে—হাত-পা নাড়াতে হলে চেষ্টা দরকার।

রাত্রের ঘটনা, সব-কিছুই স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল। গাছের নীচে দৃষ্টি পড়তে দেখি বাঘ কাদার মধ্যে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, মোষের মত বাঘকে কাদায় শুতে কখনও দেখিনি। একটু ভাল করে দেখার দরকার হলো। বাঘের পায়ের তলায় মাছি ভন্ ভন্ করছে, কানের গর্তেও দু'চারটে মাছি আনাগোনা শুরু করেছে কিন্তু কান

নড়ছে না, নিশ্বাস নেওয়ার কোন লক্ষণ দেখছি না। স্বপ্ন যেন সত্য হয়ে বাস্তবে এসে উপস্থিত হলো।

জ্বর আমাকে কাবু করলেও শিকারীর মন এই অবস্থায় কি হতে পারে তা অভিজ্ঞকে বোঝাবার চেষ্টা করব না। শিকারে বার হলে সব সময় পকেটে ছোট ঢিল নিয়ে বার হই। জ্বর নিয়েই গাছ থেকে নেমে বাঘকে পরীক্ষা করবার ইচ্ছা অদমনীয় হওয়ায়, দু'একটা ঢিল বাঘের মাথায় ফেললাম। ছোঁড়ার দরকার ছিল না। বাঘের দিক থেকে যে সঙ্কেত পেলাম তা মড়ার। গাছ থেকে নেমে এলাম। বাঘের পিছনের বাঁ পা ফুলে গোদের মত হয়ে গিয়েছে, কাছে আসতে বার হলো ঘা এত পুরান যে ঘায়ের গর্ত মাংস ভেদ করে হাড়ে দিয়ে পৌঁছেছে। যে বাঘ চলৎশক্তিহীন তার পক্ষে লাফ মেরে আমার কাছে পৌঁছতে না পারায় আশ্চর্যের বিষয় কিছু নয়। রাত্রে গাছে ওঠার সময় বুঝতে পারিনি। আমি যে ডালে বসেছিলাম তা মাটী থেকে বেশী উঁচুতে নয়। এবার একরকম নিঃসন্দেহ হলাম যে বাঘটি প্রাচীন নরখাদক, কারণ দ্রুতগামী জন্তুকে ধরবার শক্তি বাঘ ক্ষতস্থান পেকে ওঠার পর থেকেই হারিয়েছে। গাছের নীচে মরা বাঘ যখন স্বপ্নের ঘটনা নয় তখন বাঘ-ভালুকে মল্লযুদ্ধে স্থানটি দেখা দরকার। আন্দাজমত যথাস্থানে দৃষ্টি চালাতে প্রথমটা কিছু নজরে পড়ল না। এদিকে একসঙ্গে বাঘ ও ভালুককে মেরেছিলাম বলেই তো মনে পড়েছে, তবে কি আত্মা ভোজবাজীর খেলা দেখিয়ে দিল। নিজের বিশ্বাস একটু বাড়িয়ে নিয়ে মল্লভূমির দিকে যাওয়াই স্থির করলাম। মনস্থির হলো বটে, কিন্তু পা চলতে চায় না, হাড়গুলোয় যেন জোড় খুলে গিয়েছে। অপরদিকে শিকারীর অন্তর অস্থির হয়ে উঠেছে, উত্তেজনা যেভাবে খোঁজ নেবার তাগিদ দিতে লাগল তাতে এখনি সত্যি মিথ্যে যাই হোক আসল ঘটনা জানতে পারলে জ্বর হয়তো আরো বেড়ে যাবে।

এক-পা দু'পা করে বেসামাল অবস্থায় খানিকটা অগ্রসর হতে, ঘাসের তলায় দেখতে পেলাম বাঘের লেজ, কেবল ডগাটা; লেজের অসাড় অবস্থা দেখে বলা চলে, মরেছে। কিন্তু বাকি দেহটা কতটা মরেছে জানতে না পারলে কাছে যাওয়া ঠিক হবে না! কয়েকটা ঝোপ পার হয়ে যেখানে এসে পৌঁছলাম সেখান থেকে বাঘের মাথা আড়াল পড়লেও পিঠ অনেকটা দেখা যায়। পিছনদিকে এসে পড়েছিলাম। কাদার মধ্যে যেভাবে মুখ গুজড়ে বাঘ পড়ে ছিল তা কোন জীবন্ত জন্তুর পক্ষেই সম্ভব নয়। আবার কাছে যাবার আগে ঢিল ছুঁড়লাম। বাঘ নড়ল না, কিন্তু কাছ থেকেই গোঙানীর মত একটা আওয়াজ শুনলাম। পরক্ষণে কাছ

থেকেই একটি ভালুক বেগে আমার দিকে ছুটে এল। ঘটনাটি এমন আকস্মিক-ভাবে ঘটল যে রাইফেল বগলে তোলার আগেই ভালুক প্রায় আমার উপর এসে পড়েছে, তখন বন্দুক যেখানে ছিল সেখান থেকেই নল ভালুকের দিকে এনে ঘোড়া টিপে দিয়েছিলাম। 425 bore-এর high velocity রাইফেলের Racoil বন্দুকের বাঁট ঠিক আমার বুকের তলায় ভীষণ বেগে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে টাল সামলাতে না পেরে আমিও মাটিতে পড়ে গেলাম।

পরের ঘটনা, যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম তখন দেখি আটচালার ভিতর তক্তা-পোষের উপর শুয়ে আছি। মোড়লদের বড় ছেলে আমার কাছেই মাটিতে বসে। উঠানের দিকে টাটির দরজা খোলা, বাইরে লোক গিজগিজ করছে। ভিড়েয় মধ্যে ছেলে মেয়ে বুড়ো কেউ বাদ পড়েনি। আমি চোখ খুলেছি দেখে, মোড়লদের ছেলে বললে—কর্তাবাবু, আমরা তো ভেবেছিলাম, আপনি কি বলে মানে আপনাকে বাঘে লিয়েছে, তা লিবে লয়, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বলি আপনার গতরটি তো কম নয়, একটা কেন সাতটা বাঘের পেট ভরিয়েও কিছু মাংস বেঁচে যাবে। সকালবেলা বন্দুক ছোটার শব্দ শুনে বুঝলাম আপনি বেঁচে আছেন। তখন কর্তাবাবু, আপনার সাথে যারা গেছল তাদের এইসান গাল দিলাম যে ব্যাটাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে ছাড়লাম। তারপর কর্তাবাবু, এই শর্মা গাঁয়ে গিকে লোক যোগাড় করলাম—যে যা হাতিয়ার সামনে পেলো তাই নিয়ে লড়াইয়ের পল্টনের মত জঙ্গলের দিকে চললাম। আপনার লেগে বাবু গাঁয়ে একটা বাঁটি-দা রইল না। ঘরে ঘরে কুটনো-কোটা বন্ধ। বৌ-এর দল একেবারে রেগে কাঁই হয়েছিল। কিন্তু আমরা যখন বারোজন লোক হিমশিম খেয়ে দু-দুটো ডবল সাইজের বাঘ আর তার সঙ্গে তেমনি পেরকাণ্ড ভালুক আনলাম তখন মেয়েরাই ভিড় করে যেন ঠাকুর দেখতে এলো। ঠাকুর বলতে আপনাকেই বলতেছি কর্তাবাবু। তার পর দু-একটা বাড়ীতে ঘরোয়া বিবাদ বেধে গেছে। বাধবে না, মাইয়ামানুষ ঘর ছেড়ে পুরুষ দেখতে এলে বাধবে না। তবে কর্তা ভয় পাবেন না—আপনার তরে যে বদ্যি আসতেছে সে একেবারে কি বলে শত-মারি চিকিৎসক—ওষুধ ধরলে আর দেখতি হবে না, একেবারে কাজ হাঁসিল করে ছাড়বে। তা কর্তাবাবু, বাড়াবাড়ি হবার আগে লোকগুলোকে কিছু বকশিস দিয়া দেন, ওদের আশীর্বাদেই আপনি সাইরা উঠবেন।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের প্রস্তাব শুনে সত্যই ভয় পেয়ে গেলাম। শতমারি চিকিৎসকের ওষুধ সেবন থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য বকশিসের ঋণ শোধ করে এখানকার পাঠ তোলার আয়োজন শুরু করে দিলাম।

ভয়ঙ্কর সুন্দর

রাত দুটো হবে। অসহ্য গরমে ঘুম ভেঙ্গে গেল। জানালার পাশেই শুয়েছিলাম, চোখ খুলতেই দেখি, তেঁতুলগাছের গোড়ায় একটি অতিকায় জীব সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং মাথার উপর দুটো হাত তুলে দিয়ে কিছু টেনে নামাবার চেষ্টা করছে—দৃষ্টিভ্রম না হলে বলতে হয়, আচরণটি কতকটা আঁচড়ানর মতন।

কৃষ্ণপক্ষের ঝিমানো চাঁদ, তাও জঙ্গলের ওদিকটায় ঝুঁকে পড়ায় এদিকে গাছের ছায়ায় প্রায় অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। এত ক্ষীণ আলোয় দৃষ্টিকে বিশ্বাস করতে হলে অনুমানের সাহায্য না নিয়ে উপায় নেই। দুটির সহযোগিতায় যা বার হলো, তাতে তৎক্ষণাৎ খাটিয়া পরিত্যাগ করার জন্য উঠে বসলাম। তাড়া হুড়ায় পুরানো পচা দড়ির বাঁধন দু'এক জায়গায় ছিঁড়ে গেল। দড়ি ছেঁড়ার সামান্য শব্দ শুনেই জীবটি জানালার দিকে ফিরে তাকাল, তার পর চার পায়ের উপর ভর দিয়ে সমস্ত দেহটা আমার দিকে ঘুরিয়ে দিল। যা দেখলাম তাতে চক্ষু স্থির হয়ে গেল। এই সময় চতুষ্পদীর মাথার দিকটা ছায়ার বাইরে এসে পড়েছিল। বড় বাছুরের মত প্রকাণ্ড বাঘ।

হঠাৎ উঠে বসার দরুন খাটিয়ার উপর সমস্ত দেহভার এক জায়গায় পড়েছিল, ফলে দুর্বল স্থানের বাঁধনগুলি দু'একটি করে ছিঁড়তে লাগল। বাঘ গোড়াতেই চমকেছিল। শব্দের ক্রমবৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

জঙ্গলের গোড়াতেই তেঁতুল, শিমুল ও শাল গাছের ভিড়। ফরেস্ট বাংলোর সামনের যেটুকু জায়গা পরিষ্কার ছিল, তার ওপাশেই হাত-দেড়েক উঁচু আগাছা ও আশসেওরার ঝোপ। আশ্চর্যের ব্যাপার, ঐটুকুর আড়াল পেতেই অত বড় বাঘ গা-ঢাকা দিয়েছিল। কিন্তু লুকোচুরি খেলা মুহূর্তে ভীতিপদ হয়ে উঠল। দেখি, জঙ্গলের গোড়া থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসে খোলা জায়গায় হাঁটু গেড়ে বসেছে। কিভাবে এবং কেমন করে ওখানে এল অনুমান করা শক্ত। ইতিমধ্যে হাঁটু ও কুনুই-এর উপর বসে লেজ নাড়ায় আক্রমণের পূর্ব লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠল। বাঘের মুখ জানালার দিকে, খুব সম্ভবতঃ আমাকেই খুঁজছিল।

ঘরের ভিতর গাঢ় অন্ধকার হলেও নিশাচরের দৃষ্টিকে অত কাছ থেকে এড়ানো সম্ভব নয়। আমাদের মাঝে ব্যবধান তখন বিপদসঙ্কুল কেন্দ্রের ভিতর এসে পড়েছে। জানালায় লোহার গরাদ লাগানো থাকলেও নিরাপদ ভাবা চলে না। দীর্ঘকালের অবহেলা এবং মরচের প্রকোপে কোন্ গরাদের শেষাংশ কতটা উবে গিয়েছে জানা নেই। সন্দিগ্ধ বাঘ যদি কোন প্রকারে ভয় কাটিয়ে ফেলতে পারে, তাহলে এগিয়ে এসে গাছে আঁচড়-কাটার মত সোজা দাঁড়ালে, গরাদ পথ ছেড়ে দিতে পারে, অথবা বাঘের ওজনেই কিছু ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়।

সচরাচর এরূপটী ঘটে না বলেই জানালার অত কাছে খাটিয়া টেনে এনেছিলাম। খাটিয়ার গায়ে হেলান দিয়ে ভরা বন্দুকও রেখেছিলাম। কিন্তু ঘটনাচক্রের ফলে অস্ত্রটি অত কাছে থেকেও বিপদের সময়ে নাগালের বাইরে রয়ে গেল। একটু হেলে হাত বাড়লেই বন্দুকে কাছে পাওয়া যায়, কিন্তু ঐটুকু নড়লেই বাঘকে বেশী করে আকৃষ্ট করবার আশঙ্কা থাকায় নিরস্ত হলাম।

বাঘ ঠায় জানালার দিকে তাকিয়ে পাথরের মত অটল অবস্থায় বসে রইল। পলে পলে সময় এগিয়ে চলেছে। অনেকক্ষণ আড়ষ্ট অবস্থায় বসে থাকায়, জানু ও গোড়ালী অসাড় হয়ে আসতে লাগল। পায়ে সংঘাতিক ঝিন্‌ঝিনি ধরেছে। মাঝে মাঝে ভাবছি—যা থাকে কপালে হবে, পা দুটো নাড়াই। হয়ত শেষ পর্যন্ত বেপরোয়া হয়ে যেতাম। হঠাৎ জন্তুটি উঠে বাংলোর পিছনদিকে চলে গেল। চলার ভঙ্গীতে বেশ তাড়া ছিল! পিছনদিকের দরজা বন্ধ করেছিলাম বলেই মনে পড়ে। বন্ধ হলেও আশ্বস্ত হবার মত কিছু ছিল না। লোহার গরাদের মতই হয়ত কাঠের শক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে।

বাঘ উঠে যেতেই বন্দুক তুলে নিলাম। নলের কাছে হাত আসতে বুঝলাম, টর্চ লাগানো হয়নি। উপরি টর্চ বাক্স থেকে বার করতে পারিনি বলে বন্দুকটি বালিসের তলায় রেখে দিয়েছিলাম, সব কাজে ব্যবহারের জন্য। বন্দুক থেকে টর্চ পৃথক হওয়ায় একত্রে উভয়ের ব্যবহার সম্ভব নয়। অসুবিধায় পড়ে গেলাম। অন্ধকারে কলকজার সঙ্গে মিল রেখে আলোকে বন্দুক-সংলগ্ন করাও অসম্ভব। তবু উভয়কে একসঙ্গে ব্যবহার করবার চেষ্টায় ধাতুর ঠোকাঠুকিতে যে শব্দ হলো তাতে জানালার পাশেই বুক-কাঁপান হুঙ্কার শুনলাম। বাঘ পিছনদিক থেকে ঘুরে এসে ঐখানে বসেছিল। শব্দ না হলে হয়ত জানালার উপর এসে দাঁড়াত এবং দেহের খানিকটা ওজনেই গরাদগুলির কি অবস্থা হতো বলা যায় না। হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই বাঘ লাফ মেরেছিল। পরক্ষণে দেখলাম বাঘ

উঠানের মাঝখানে। এই সময় জঙ্গলের ভিতর একাধিক ছোট জানোয়ারের ছোটাছুটি শুরু হলো। ছোটাছুটির শব্দে পালানোর সঙ্কেত ছিল না, খেলার ইঙ্গিত পাচ্ছিলাম। বাঘও জঙ্গলের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজ করতে লাগল, ঠিক যেভাবে বেড়ালছানা কাছে থাকলে তাদের মা নিজের উপস্থিতি জানায়। অল্পক্ষণ পরেই জঙ্গলের ভিতর থেকে দুটি বাঘের বাচ্চা বেরিয়ে এল। দুটিই প্রায় সাবালক হয়ে উঠেছে। বাচ্চাগুলি মায়ের কাছে আসার আগেই মা নিজে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আলো ফেললাম। দুটি জ্বলন্ত চোখের উপর আলো পড়ল, তারপর আবার ছোটার শব্দ শুনতে পেলাম। চোখও অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। থেকে থেকে শুকনো পাতা বা কুটো মুচড়ে যাওয়ার আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যেতে কতকটা নিশ্চিন্ত হলাম বটে, কিন্তু নিরাপদ ভাবার অবকাশ ছিল না। পাল্লাহীন জানালায় ঢাকাঢুকির কোন ব্যবস্থা না থাকায় বাকি রাত জেগেই কাটাতে হলো।

ডবল ফাঁড়া কাটল। বন্দুকে টর্চ লাগান থাকলে উত্তেজনাকে ঠেকিয়ে রাখা যেতো না। বাঘিনীর পিছনে ধাওয়া করলে হয় বাচ্চার মা রুখে দাঁড়াত, অথবা বাচ্চাদের বাপ তেড়ে এলে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। বাচ্চাগুলির চরে খাবার বয়স হয়েছিল। বাঘিনী পুনরায় বিবাহযোগ্যা হওয়ায় নতুন স্বামীর খোঁজে ছিল না এমন কথা বলা যায় না।

সকাল হতে প্রথমেই জানালার পাশে পায়ের দাগ পরীক্ষায় লেগে গেলাম। এইখানেই কাল সন্ধ্যাবেলা জলে-ভর্তি বালতি উল্টেছিল। রোয়াক এখন কাদায় ভরে আছে। স্থানটির কাছে আসতেই বিরাট থাবার ছাপ দেখা গেল। বাঘ শুধু জানালার কাছে আসেনি, এখান থেকে ফিরে স্নানের ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিল। এই সময় বাচ্চাদের জঙ্গলের বাইরে দেখে ফিরে যায়।

পিছনটাও দেখে আসব কিনা ভাবছি এমনি সময় ঐদিকে বাংলোর গায়ে লাগা গাছের উপর থেকে হনুমানের ডাক শুনলাম। ও ডাকের অর্থ জানার জন্য অভিধান দেখতে হয় না। হনুমান আগডালে বসে পাহারা দিচ্ছিল, বাঘ কিংবা লেপার্ড দেখলে গলা থেকে একরকম আওয়াজ বার করে, যা শুনলে দলভুক্তরা সাবধান হয়ে যায়। দলভুক্ত কেন, জঙ্গলের যে কোন জীব আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। সন্দেহ রইল না বাঘ কাছেই ঘুরছে।

সতর্কতার সঙ্কেত শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বিশ্বস্ত অস্ত্র সঙ্গে ছিল, নির্ভয়ে পিছনের দিকে গেলাম। খিড়কির কবাটের কাছে আসতে দেখি, সেটি

খোলা। বাঘের আচরণও অদ্ভুত—সে এদিকে কেবল আসেনি, খোলা কবাটের সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। শুকনো বালির উপর চলার গতি, দাঁড়ান এবং লেজ-নাড়ার বিশেষ সঙ্কেতপূর্ণ ভঙ্গী সুস্পষ্ট হয়ে আছে। প্রমাণকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। নিজেকেই প্রশ্ন করলাম - পোড়ো বাড়ী পেয়ে বাঘ সপরিবারে এখানেই বসবাস করছিল না তো? পিছনের জঙ্গল একেবারে বাংলোর গায়ে লেগে মাইলের পর মাইল পাহাড় ঘিরে আছে। লক্ষ্য করলাম, একটি মোটা গাছের ডাল ছাদের উপর ভর করায় খোলা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে।

সামনের দিকে ফিরে এলাম বাংলোর পরিস্থিতি দেখার জন্য। শোবার ঘরের পাশেই স্নান ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। এখন এদিককার দেয়াল পড়ে গিয়ে আব্রুর বালাই সরিয়ে ফেলেছে। দুই পাল্লার কবাটের অস্তিত্ব নেই। ইচ্ছা করলে এদিক দিয়েও ভিতরে যাবার প্রবেশপথ করে নেওয়া যায়। কবাটের কাছেই দেয়াল ধসে-যাওয়া ইটের স্তূপ ও ধুলার ঢিপি হয়ে গিয়েছিল। ইটের মাঝে ফাঁকগুলিও ভীতিপ্রদ। যে কোনটিকে গোক্ষুর সাপ বাস্তুভিটা বলে দাবী করলে উচ্ছেদের নালিশ আদালত মানবে না। সংক্ষেপে বাংলোটি রাত্রিবাসের পক্ষে একেবারেই নিরাপদ নয়। লোকজন এলেই এখান থেকে পাততাড়ি গোটাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম। বিপদ সামনে থাকলে তাকে সামলান যায়, কিন্তু আনাচে-কানাচে ওৎ পাতা-বাঘ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার মত বোকামি আর কিছু নেই।

ঘরে ঢুকলাম খিড়কির কবাট বন্ধ করবার জন্য। চেষ্টায় মরচেধরা কবাট যে আওয়াজ করল তাতে হনুমানের সতর্কতার ডাক ফলদায়ী হয়ে গেল। কবাটের একটু দূরেই বাঘ বসেছিল—বিপরীত দিকে মুখ থাকাই স্বাভাবিক, হয়ত অন্যমনস্কতার যোগও ঘটে থাকবে। এই কারণে আমার উপস্থিতি বুঝতে পারেনি। লোহার সংঘর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ঝোপ নড়া শুরু হলো এবং অদৃশ্য জানোয়ার মন্থরগতিতে দূরে চলে যেতে লাগল। ঝোপের ভিতর চলার ভঙ্গীতে যে বৈশিষ্ট্য ছিল তাতে বাঘ ছাড়া অন্য কোন জানোয়ারকে ভাবা চলে না। শব্দের দূরত্ব নিরাপদ হতে বহু কষ্টে কবাট বন্ধ করলাম বটে, তবে অত কষ্ট না করলেও চলত। দুটি পাল্লারই নীচের দিকটা উইপোকা খেয়ে গিয়েছে। উচ্ছিষ্টের প্রাচুর্য যেটুকু পড়ে আছে তা আঙুলের ছোঁয়া লাগলেই ছেঁদা হয়ে যায়। তবু বন্ধ করায় সান্ত্বনা আছে। ঐটুকু লাভ সংগ্রহ হওয়াতে ফিরে এসে খাটিয়ায় বসতে গেলাম,

অত সুখ কপালে সইল না—হঠাৎ উঁচু থেকে সমস্ত দেহভার একই জায়গায় পড়তে যে কয়টা বাঁধনের জায়গা ছিঁড়তে বাকি ছিল সেগুলি শেষ কর্তব্য সেরে আমাকে সুদ্ধ মাটিতে বসিয়ে দিল। পিছনটা সামনে পড়ায় পা দুটো উপরদিকে উঠে গেল। ছোট শিশুকে চিৎ করে শুইয়ে দিলে যেভাবে সে উপরদিকে পা ছোঁড়ে, আমার অবস্থাও দাঁড়াল তদ্রূপ। কপাল-জোর, রেডি ট্রিগারযুক্ত ভরা-বন্দুক হাতে ছিল না। বিশেষ চেষ্টা দ্বারা মানুষ-ধরা ফাঁদ থেকে মুক্তি পেয়ে একটি শিকারের সরঞ্জামপূর্ণ কাঠের বাক্সের উপর বসতে যাবো, দেখি বিশাল মাকড়সা মাছি ধরে আহারের আয়োজন চালিয়েছে। দৃশ্যটি আমার কাছে আক্রমণোদ্যত বাঘের চেয়েও ভয়াবহ। একটা যাহোক কিছু খুঁজছিলাম ওটাকে মারার জন্য। উপযুক্ত অস্ত্র, ঝাঁটা, মুড়ো-ঝাঁটা এখানে দুর্লভ—খুঁজে পাওয়া গেল না। জুতা পেটাবার সাহস নেই—নিজের হাত মাকড়সার অত্যন্ত কাছে এসে পড়বে। বাইরে গেলাম, বাঁশের কঞ্চি বা ছোট ডাল যাহোক কিছু যোগাড় করতে। একটা পাওয়া গেল। ফিরে এসে দেখি শিকার ধরে মাকড়সা আমার খাটিয়ার তলায় একরাশ ছেঁড়া দড়ির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। পলাতককে ছেড়ে দিলাম, কারণ বন্দুকের তাগ-মারিতে সিদ্ধহস্ত হলেও কঞ্চিকে বিশ্বাস নেই। মার ঠিক জায়গায় না পড়লে এই জাতীয় কীট লাফ মারে। মাকড়সার কামড়ে ঘায়ে জর্জরিত হয়ে মানুষকে মরণাপন্ন হতে দেখেছি। সুতরাং আমার ভীতিকে হাস্যকর ভাবা চলে না। ওদের লাফের বহর না দেখলে বিশ্বাস করবার উপায় নেই।

খাটিয়ার তলায় বিষধর কীট চলে যেতে, আর একটা বাক্সের উপর বসে পড়লাম রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, তার উপর উত্তেজনা ঝিমিয়ে যেতে অবসাদ-গ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কাষ্ঠাসন হলেও দেয়ালের ঠেসান পেতে আরামের খপ্পরে গিয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণ তন্দ্রাভূত হয়েছিলাম। আরাম বেশীক্ষণ ভোগ করা গেল না। খাটিয়ার তলায় খট্ খট্ শব্দ হতে সজাগ হয়ে বসলাম, আর এক শিকারের দৃশ্য চোখের সামনে উপস্থিত। একটি পাহাড়ী টিকটিকি কোন পোকা ধরে সেটাকে গলাধঃকরণের চেষ্টায় সাংঘাতিক ঝাঁকুনি দিচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুখও শুকনো মেজেতে ঠুঁকে যাচ্ছে। যেখানে এসেছি, সেখানে অধিকাংশ জীবেরই খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ। ওদিকে নজর দিয়ে লাভ নেই। দেখতে দেখতে বেলা বেড়ে উঠতে লাগল। এর ভিতর দু'জন জঙ্গীর ফিরে আসার কথা।

আহারের ব্যবস্থার জন্য টাকাও দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন পর্যন্ত ওদের পাত্তা নেই সারা রাত আহার না জোটায় ক্ষিধের উৎপাত শুরু হয়ে গিয়েছে। সঞ্চয় যা ছিল তারই উপর নজর দিতে হলো। শিকারে বার হলে এদিকটার সংস্থান সব সময় কাছে রাখি। শুকনো চিঁড়ে, রোদে পোড়া পাঁউরুটি ও কিছু মাখন টিফিন বাস্কেটে রাখা ছিল। সেগুলির শরণাপন্ন হতে গিয়ে মনে পড়ল, কাল বিকালেই সব নিঃশেষ হয়েছে। বদান্যতার প্রাচুর্যে নিজেকে বঞ্চিত করেছি। স্টেসন থেকে আসার পর কুলীরা বললে, সারাদিন ওদের খাওয়া হয়নি। ভোরবেলায় যে ট্রেন আসবার কথা, সে গাড়ী বিকেলের দিকে পৌছানোয় এরূপ ঘটেছিল। অভুক্তদের আবেদন মানতে হলো, যা সঙ্গে ছিল দিলাম। লোকগুলি যে আসল জঙ্গলী তা গোড়ায় বুঝতে পারিনি। খেতে আরম্ভ করলে আর থামতে চায় না। সত্য কথা বলতে হলে স্বীকার করতে হয়, কেবল করুণা-প্রদর্শনের জন্য দেউলিয়া হবার ব্যবস্থা করিনি, নিজের স্বার্থও ছিল যথেষ্ট। জঙ্গলীরা ভদ্রাচার জানলে আমার জন্য কিছু থেকে যেতো।

যাই হোক, পাচজন কুলীর মিলিত চেষ্টায় আমার এক সপ্তাহের সংস্থান শেষ হয়ে গেল। ওদের মধ্যে যে দুজনের ফিরে আসার কথা ছিল তারা কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন হওয়ায় সব-কিছুই অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। লোকালয় এখান থেকে বহু দূরে। অতগুলি বন্দুক, টোটা এবং লোভনীয় টর্চ ফেলে গ্রামের দিকে যাই কেমন করে ? বন্দুকের মত দ্রব্যের উপর আমার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারের শর্ত থাকলেও চুরি গেলে পুলিশ আমাকেই ধরবে। চুরি তো দূরের কথা, কারো জিম্মায় রাখতে হলেও রক্ষকের (retainer) নাম লেখাতে হয়। বালতি-ভর্তি পানীয় জলও কাল উজাড় হয়ে গিয়েছে। আহারের পর জল যেটুকু খাওয়ার দরকার ছিল তা তো খেলোই—অবশিষ্ট অংশ বললে কিনা আচমকা ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়েছে। ক্ষিদের চেয়ে এখন তেষ্টা বেড়ে উঠছে। বাংলোর কাছেই রাস্তার ধারে পাতকুয়া দেখে এসেছিলাম। ওখানকার জল খাওয়া চলে না—সাপ থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় কীটের বাসস্থান হয়ে আছে। সাপ হয়ত পাড়ের উপর ব্যাঙ ধরতে এসে পড়ে গিয়েছিল। মাটি থেকে মাত্র হাত-খানেক উঁচু পাড়। এরূপ হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।

ক্রমান্বয়ে বেলা বেড়ে উঠতে লাগল। আকাশে আগুন লেগে গিয়েছে। নিস্তব্ধ আবেষ্টনীতে মাঝে মাঝে ঝিল্লির ডাক শুনছি। ওদের উল্লাস থেমে গেলেই ভাবছি জঙ্গলীরা আহার এবং জল নিয়ে আসছে। বহুবার এইভাবে

আশাহীন হওয়ায় একটা-কিছু ব্যবস্থার জন্য স্বাবলম্বী হতে হলো। ক্ষুধার তাড়না তখন এমন উৎকট হয়ে উঠছে যে আলোনা কাঁচা মাংস খেতেও কোন আপত্তি নেই।

মাংসের সন্ধানেই বন্দুক টোটা ভরে প্রস্তুত হলাম। বাঘের জঙ্গলে বার হতে হলে রাইফেলের ব্যবহারই প্রশস্ত, অপরদিকে ঘুর্ণিপাক-খাওয়া গুলী পাখীর উপর পড়লে মাংসের ছাতু খেতে হয়। সব দিক ভেবে সাধারণ দোনলায় চার ও ছয় নম্বরের ছর্‌রা পুরে নিলাম। চার নম্বরে তিন ইঞ্চি টোটা নিয়েছিলাম, ময়ূর দূরে থাকলেও কোন অসুবিধা হবে না বলে। এছাড়া বুশকোটের পকেটে কয়েকটা উপরি বল নিয়ে নিলাম, বলা যায় না শ্যামবার জাতীয় বড় হরিণও পেয়ে যেতে পারি। তখন লিথেল বল বিশেষ কাজে আসবে।

রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। জনহীন নিরিবিলি পথ। এদিকে কতদিন আগে মানুষ-চলা বন্ধ হয়েছে তার ঠিক নেই পাখী আরম্ভ করে হরিণ ময়ূর সব-কিছুই এখানে পাওয়া উচিত। আসবার সময় ঘুঘু আর সবুজ পায়রার ঝাঁক দেখেছিলাম। এখন তাদের আশা করা অন্যায়। পাখীর দল দুপুর রোদে নিশ্চয় ঝিমোচ্ছে।

পাখী ঘুমাক, উপস্থিত একটা জলাশয় বার করতে পারলে বাঁচি। গরম এমন প্রচণ্ড যে, বুশকোটের সঙ্গত ব্যবহার পোষাল না। সেটা পিঠে ঝুলিয়ে নিলাম। মাথায় সোলার টুপি ছিল। গায়ে হাওয়া লাগায় কিছু আরাম পাওয়া গেল।

বাংলো থেকে খানিকটা আসবার পরই কেবল মনে হচ্ছিল, হিসাব-করা ব্যবধান রেখে কোন জন্তু আমাকে অনুসরণ করছে। অনুসরণের ভঙ্গী আমার কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। পিছন থেকে মাথার উপরেই আশঙ্কার কারণকে আর এগুতে দিলে বিপদকে মাথা নত করেই মানতে হবে সুতরাং এখনি পরীক্ষা করা উচিত, ব্যাপারটা কি। রাস্তার একদিকে গভীর খাদ, অপরদিকে রাস্তার জন্য কাটা পাহাড়ের উপরটা—অর্থাৎ যেখানে ভয়ের কারণ জড় হয়েছে। ঐ জায়গাটির উপর নজর ফেলতে হলে খাদের দিকে কোন উঁচু গাছে উঠতে হয়। কাছেই সুবিধা পাওয়ার কাজে লেগে গেলাম। চুনের বোতল, পিঠে ঝোলান বন্দুক আর বুশকোট গাছে চড়ার সহজ গতিকে অসুবিধায় ফেলেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঁচু ডালে পৌঁছে গেলাম। এখান থেকে সন্দেহের জায়গাটি চমৎকার দেখা যায়। আগাছা বা বেঁটে ঝোপের বালাই নেই। রোদের তাপে

ঘাস পর্যন্ত উধাও হয়ে মাটিকে উলঙ্গ করে ছেড়েছে। নজর কড়া করেও কোথাও সচল জীবের সন্ধান পাওয়া গেল না।

গাছের উপর থেকে কোন জানোয়ারকে দেখতে না পেলেও, দূরে ঝরণার সন্ধান পাওয়া গেল। আর একবার সন্দেহের জায়গাটি দেখে নিয়ে যে ডালটিতে দাঁড়িয়েছিলাম সেটি চিহ্নিত করে নেমে এলাম। ফেরবার পথে দিগ্‌ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকায় গাছে গাছে চিহ্ন রাখা আমার মত পায়ে-হাঁটা শিকারীর পক্ষে মস্ত বড় সহায়।

ঝরণার দিকে অগ্রসর হবার জন্য রাস্তার অপর দিকে উপস্থিত হলাম। মানুষের তৈরী সিঁড়ির ধাপ প্রস্তুত না থাকলেও জলে ধুয়ে যাওয়া গাছের শিকড় মইএর চড়বার মত ব্যবস্থা রেখেছিল। যাবতীয় দোলায়মান বোঝা পিঠের উপর থাকলেও উপরে উঠে আসতে বেগ পেতে হলো না।

উপরে এসে দেখি, প্রকাণ্ড বাঘ দুটি বাচ্চাকে নিয়ে বাংলোর দিকে চলেছে। আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে বাঘের দল এত দূরে ছিল যে ছররার পাল্লায় কোন কাজ হতো না, টোটা বদল করে নিশানা করলেও কোন সুবিধা হতো না কারণ পিছনে গুলী লাগলে লেজের খানিকটা জখম হতো। আমার শিক্ষানবিশীকালে লেজকে vital part বলে ধরা হতো না; vital part না পেলে, গুলী চালানোর নিষেধ থাকায় শিকার দেখতে পেয়েও অস্ত্রকে বেকার রাখতে হলো। এই সূত্রে একটা সান্ত্বনা পেলাম, জঙ্গলে চলার জন্য তৈরী কান আমাকে ঠকায়নি। আরো একটি বিষয় নিশ্চিত হয়ে গেল যে, বাংলোর ভোগ-দখল-স্বত্বে বাঘদেরই অধিকার বেশী। বাংলোর আশেপাশের সব জায়গাতেই ওদের মৌরাস-মোকররীর দাবী আছে। অনধিকার প্রবেশের জন্য কৈফিয়ত দরকার থাকায় ওরা আমার পিছু নিয়েছিল। অনেকটা পথ অনুসরণ করবার পর যখন বুঝল আমি গৃহত্যাগ করে চলেছি, তখন আমাকে ছাড়ান দিয়ে ঘর মুখো হয়েছিল।

এতক্ষণে ঘটনাটি চিন্তার বিষয় হয়ে উঠলো। নিরস্ত্র জঙ্গলীরা আমার অনুপস্থিতিতে ফিরে এলে, ওদের কি অবস্থা হবে। বাঘের দল তো বাংলোর দিকেই গেল এবং ঐখানেই থাকবে। ভাবলাম, এখানেই মহড়া আগলে থাকি—এদিকে আসতে দেখলেই সাবধান করে দিতে পারব। ওদের সঙ্গে করে ঝরণার দিকেও নিয়ে যেতে পারি। ঐখান থেকেই জল আনার ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তার স্থিরতা নেই এবং মোটের

উপর ফিরবে কিনা তাও বলা চলে না। ওদের চিন্তার সঙ্গে তৃষ্ণাও বেড়ে উঠছিল, ঝরণার ডাকে জলের দিকে চলা শুরু করে দিলাম। প্রতিটি পদবিক্ষেপে ঝিল্লির ডাক থেমে যাচ্ছে। শব্দ থেমে যাওয়ার নিস্তব্ধতা যেন আবেষ্টনীকে প্রেত-লোকে পরিণত করে দিচ্ছে।

মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড তাপে চতুর্দিক নিঝুম মেরে গিয়েছে। শুকনো পাতা বা কুটো পায়ের তলায় মুচড়ে গেলে চমকে উঠছি। সতর্কতায় অভ্যস্ত মন সামান্য কারণেই আতঙ্কিত হয়ে উঠছে। ক্রমান্বয়ে দু'টি ছোট পাহাড় অতিক্রম করে এলাম। ঝরণার দূরত্ব আর কমতে চায় না। ইতিমধ্যে মাইলখানেক চলে এসেছি। দুপুরের রোদ মাথায় নিয়ে অভুক্ত অবস্থায় চড়াই ও খাদে ওঠা-নামা আমার মত শহুরের পক্ষে সহজসাধ্য কাজ নয়। শেষ পর্যন্ত যখন জলাশয়ের কাছে এসে পৌছলাম তখন বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কোট আর বন্দুক একটা পাথরের চাঁই-এর উপর রেখে প্রাণভরে জল খেলাম। যেখানে দাঁড়িয়ে তৃষ্ণা নিবৃত্তি করছিলাম সেখান থেকে পাথরের পাড় খাড়াইভাবে ফুট-দশেক উপরে উঠে গিয়েছে। উপরটা জলের দিকে ঝোঁকা। ঝোঁকা কেন বলি, পাড়ের কিনারা থেকে ওজন-দেওয়া সুতো ঝুলিয়ে দিলে হয়ত জলের উপর এসে পড়বে। অর্থাৎ, একেবারে উপরের কিনারায় এসে না দাঁড়ালে ঠিক তলায় কিছু দেখা যায় না। ক্লান্তির কিছুটা উপশম হওয়ায় যেখানে বন্দুক আর টোটা-ভরা কোট রেখেছিলাম তারই উপর বসে পড়লাম।

সামনের দিকে তাকিয়েছিলাম। ঝরণার শ্বেত প্রবাহে রৌদ্রছটা পড়ায় মনে হচ্ছিল রুপোর চাদর হাওয়ার মৃদু দোলায় দুলছে। শীতল জলের সান্নিধ্যে সবুজ অপূর্ব সাজে সেজেছে। পোড়া-মাটির চটাফাটা চেহারা দেখে এসেছিলাম, তার তুলনায় প্রকৃতির শান্ত রূপ আমাকে মুগ্ধ করে ফেলেছিল। যে দুঃখভয়, হতাশা ও দৈহিক ক্লেশকে সুন্দর ভোলাতে পারে তার দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বেও পেয়েছি, কিন্তু বর্তমানের পরিবেশ ভিন্নভাবে আমার উপর প্রভাব বিস্তার করছিল। নিজের হিংস্র প্রকৃতির কথাই মনে আসছিল, ভাবছিলাম, কোন্ অধিকারে মহাপরাক্রম-শালী বনের রাজাকে হত্যা করবার জন্য সাজ-গোজ করে এখানে এসেছি! বাঘের প্রকৃতি হিংস্র হলেও তা নিরবচ্ছিন্ন খাঁচার অবলম্বন। আত্মরক্ষার প্রয়োজন না থাকলে অথবা বিকলাঙ্গ না হলে বাঘ তো কখন মানুষকে আক্রমণ করে না। তবে কি দম্ভকে প্রশ্রয় দেবার জন্যই হত্যার সৌখীনতা! কিংবা হতেও পারে, আদিম বুনো প্রভাব আজও আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে।

যে সময় হিংস্র প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বিচার করছিলাম, সেই সময় মাথার উপর থেকে একটু দূরে চলন্ত ছায়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ছায়ার মালিক কে, না দেখলেও চেনার কোন অসুবিধা ছিল না। মুহূর্তে বিচারের চরম নিষ্পত্তি আমার হিংস্র স্বভাবকে সমর্থন করে গেল, বন্দুক তুলে নিলাম। ছায়ার দিকে নল ঠিক করে প্রস্তুত হয়ে রইলাম, কিন্তু ছায়া পাড়ের পিছনে চলে গেল। পরক্ষণেই দু' তিনটি ময়ূর একসঙ্গে ডেকে উঠল, ত্রাসের ডাক—জঙ্গলের রাজার আগমনবার্তা। মাথার উপরেই অনুসন্ধানী বাঘ লাফিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকায় বন্দুক নিয়ে উঠে পড়লাম।

হঠাৎ আতঙ্ক ঘাড়ে চাপলে আত্মরক্ষার জন্য যে তাড়া আসে তাতেও অনেক-কিছু ভুলিয়ে ছাড়ে। উপস্থিত ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। বসার জায়গা থেকে উঠে আসবার সময় বুশকোট পাথরের উপর ফেলে এসেছিলাম। উপরি বড় টোটা কোটের পকেটেই রয়ে গেল। ভরা-বন্দুক সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও ভরসা ছিল না। পাখী-মারা গুলা দিয়ে বাঘ মারা চলে না। দোনলার মধ্যে তাগড়া প্যারাডকস (paradox) নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু আসল সাবধানতাই ভুল হয়ে গিয়েছিল—একটাতে লিথেল বল ভরে নিলে ভয় পাবার মত কিছু থাকত না। দুটোতেই ছর্‌রা ভরে নেওয়ায় বিপদ আমাকে ঘিরে রইল।

বাঘ নিশ্চয় আমাকে দেখেনি, দেখলে, বুঝতে হবে নরভুক্ নয়। তথাপি হঠাৎ সামনাসামনি পড়ে গেলে আত্মরক্ষার জন্যই আক্রমণ করতে পারে। এখন একমাত্র চিন্তা দাঁড়াল, কেমন করে কোটের পকেট থেকে উপযুক্ত টোটা বার করে আনা যায়। তখন কোট ও আমার মাঝে ২০/২৫ হাতের ব্যবধান হয়ে গিয়েছে। পাড়ের উপরে বাঘ কোথায় আছে জানতে না পারলে ঐটুকু জায়গা অতিক্রম করতে গেলে আত্মঘাতী হবার সুব্যবস্থা হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত বিচার করে দেখলাম—শিকারে এসে ভয়ের কাছে নত হওয়া অপেক্ষা বিপদকে স্বীকার করে বাঁচার চেষ্টা ঢের বেশী ভাল। সিদ্ধান্ত দৃঢ় হয়ে গিয়েছিল, কোটের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। ময়ূরের ডাক শুনতে পাচ্ছি না। বাঘ যে খোলা জমিতে পাড়ের কাছে নেই সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। পাথরের কাছে এসে সবে কোট তুলেছি, এমনি সময় দেখি, একটু দূরে ডালপালা আর কয়েকটা বড় পাথরের ওপাশে বাঘ জল খাচ্ছে। ঠিক ঐ জায়গায় খানিকটা জঙ্গলের ফালি এগিয়ে যাওয়ায় আমাকে দেখতে পায়নি।

কিন্তু দেখতে কতক্ষণ। কোট রেখে দিয়ে সন্তর্পণে যেখানে বসেছিলাম

তার বিপরীত দিকে চলে গেলাম এবং পাথরের আড়াল পেতেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। সাবধানতার ত্রুটি ছিল না, তথাপি নড়াচড়ায় দু'একটা ছোট নুড়ি ঢালুর দিকে গড়িয়ে গেল—নিস্তব্ধ পাহাড়ে ঢালুর দিকে গড়াতে আরম্ভ করলে চীনে-পটকার আওয়াজ করে ছাড়ে। শব্দ শুনে বাঘ জল খাওয়া বন্ধ করে কোটের দিকে তাকাল। জঙ্গলে মানুষহীন কোটও বাঘের কাছে সন্দেহের জিনিস। অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেও যখন সন্দেহভঞ্জন হলো না, তখন এক-পা দু'পা করে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কয়েক কদম আসে আবার কান খাড়া করে থমকে দাঁড়ায় এবং যখন দাঁড়ায় তখন পরীক্ষার দৃষ্টি আরো প্রখর হয়ে ওঠে। ভাগ্যগুণে হাওয়ার গতি বাঘের দিক থেকে আসছিল, ফলে পরীক্ষার সময় কানের কাজ অকেজো হয়ে গিয়েছিল। বন্দুকের নল ঠিক বাঘের মাথা লক্ষ্য করে ধরা ছিল; কিন্তু কতক্ষণ একইভাবে হাঁটুর উপর কনুই রেখে ভারী বন্দুক ধরে রাখা যায়। হয়ত নলের ডগা সামান্য নড়ে গিয়েছিল, ঐটুকুই বাঘের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। হঠাৎ একটা পা তুলে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। এতক্ষণ লেজের দোলা ছিল না, এইবার শুরু হলো। আর এক মুহূর্ত বেশী সময় দিলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। প্রায় চোখ-কান বুজেই একসঙ্গে দুটো ঘোড়া (trigger) টিপে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আহত বাঘ সাংঘাতিক গর্জন করে সোজা শূন্যে দশ ফিটের কাছাকাছি লাফিয়ে উঠল, তারপর মাটিতে পড়ে যেতেই ঢালুর দিকে গড়াতে শুরু করল। জলের উপর পড়তে চিৎ অবস্থায় বলির পাঁঠার মত উপরদিকে পা ছুঁড়তে বুঝলাম আর বেশীক্ষণ নেই। অত কাছ থেকে তিন ইঞ্চি S.S.G. চোখে লাগায় দুটো চোখই অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। খুলির ভিতর ঘিলুও বোধ হয় ভালরকম জখম হয়েছিল, তা না হলে বন্দুকধারীকেই আক্রমণ করে বসত। এই সুযোগ ছাড়বার নয়। যেখানে হাঁটু গেড়ে বসেছিলাম সেখান থেকেই ধীরে কোট আমার দিকে টেনে নিলাম। আশঙ্কা ছিল, কোট নাড়াবার সময় একটা-কিছু ঘটতে পারে। সেরকম কোন লক্ষণ না দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। বাঘের উত্থানশক্তি রহিত হয়েছে। হয়ত বা মরেওছে। মরলেও মড়াকে দুবার মারলে পাপ বাড়ে না। বড় গুলী ভরে নিয়ে বুকের উপর চালিয়ে দিলাম।

তৃতীয় গুলীতে হৃদয়ের স্পন্দনও থেমে গেল। এখন মহাশক্তির প্রতীক কেবল অসাড় মাংসের স্তূপমাত্র। জল থেকে তুলে শুকনো জমির উপর না ফেলতে পারলে মাছের উৎপাতে চামড়ার কিছু থাকবে না। জল থেকে তোলার

আগে কয়েকটা নুড়ি ছুড়ে মারলাম। মড়ার কাছ থেকে কোন অভিযোগ এল না। কাছে এসে লেজ ধরে টান মারতে গিয়ে দেখি শেষের অংশ অপহৃত হয়েছে। যেখান থেকে লেজ ছিঁড়েছে সেখানে হাড় বেড়িয়ে পড়েছে। উন্মুক্ত হাড়ের উপরে বেজায় ফোলা। হাড় বেরোনোর কারণ অনুমান করা চলে, ক্ষত স্থান বাঘ চাটতে চাটতে ঐরূপ অবস্থায় এনেছে। কিন্তু জীবন্ত বাঘের লেজ নিয়ে টানা-পোড়েন করতে গেল কে! অদৃশ্য দুঃসাহসীকে নমস্কার করে মড়ার লেজ ধরে টানতে লাগলাম, জল থেকে একচুল নড়াতে পারলাম না। নম্রতার মাথায় ঘোমটা টেনে বলতে পারি আমার শারীরিক শক্তি অনেক পালোয়ানের পক্ষেও হিংসার বিষয়। তথাপি অসাড়কে নড়ানো গেল না। নিশ্চয় জানতাম, এই অবস্থায় মাংসপুষ্ট দেহ ফেলে গেলে আকাশ, মাটি ও জল থেকে মাংসভুকের দল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বাঘকে সনাক্তের বাইরে নিয়ে গিয়ে ছাড়বে। প্রথমেই আসবে শকুনি, ওদের বভুক্ষু জঠর শান্ত করার পরেও যদি কিছু পড়ে থাকে তাহলে হায়না বা শিয়াল এসে বাকী কাজ শেষ করে দেবে, তার উপর মাছের উৎপাত তো আছেই। আমার জন্যে পড়ে থাকবে কয়েকটা বিক্ষিপ্ত অস্থি। মৃত্যুর সঙ্গে খেলার একমাত্র প্রমাণ হতো শার্দুলের চামড়া। দন্তের এতবড় পুরস্কার ফেলে আসতে আমার মনের অবস্থা কি হয়েছিল তা প্রকাশ করা শক্ত।

বেলা ইতিমধ্যে মধ্যাহ্নের দিকে ঝুঁকেছে। ক্ষুধার তাড়না আবার ফিরে এসেছে। ক্ষুন্নিবৃত্তির কোন উপায় না থাকায় আবার খানিকটা জল খেয়ে ফেললাম। তারপর মরা বাঘকে প্রাণভরে দেখতে লাগলাম। বাস্তবিকই প্রকাণ্ড বাঘ। খুব সম্ভবতঃ স্বয়ম্বরার আসরে পরিচিত বাঘিনীর প্রত্যাশায় এদিকে এসেছিল।

মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। বেলাও পড়ন্তের দিকে। দেখার পালা শেষ করে উঠে পড়লাম। কুলীদের মধ্যে কেহ ফিরে থাকলে আমার অনুপস্থিতি ওরা সহজভাবে নিতো না, চিৎকার করে জঙ্গল মাতিয়ে ছাড়ত। যেখানে বাঘের উৎপাত বেশী সেখানে ঘর থেকে মানুষ অন্তর্ধান করলে বাঘে খাওয়ার কথাই আগে মনে আসে। হঠাৎ সাপের গায়ে পা পড়লে যা হয় -- আমার কাছে যেমন সব সরীসৃপই বিষাক্ত, তেমনি চলতি মতে সব বাঘই নরভুক্।

কুলীদের ডাক শুনিনি, সুতরাং ফেরেনি। এখন করি কি? উপবাস অসহনীয় হয়ে উঠেছে। জঙ্গলের কোন ফল চিনি না। কোন্‌টা খেতে গিয়ে কি হয়ে যাবে তার ঠিক নেই। একমাত্র নিরাপদ আহার পাখী। গ্রাম থেকে

এত দূরে এসে পড়েছি যে এখানে শালিক বা চড়ুই পর্যন্ত দেখা যায় না। কাক সামনে পেলে কি করতাম বলতে পারি না।

ক্ষুধার তাড়নায় দন্তের কথা ভুলেছি। বন্দুকের নল দুটোয় পাখী-মারার টোটা প্রাধান্য পেলেও একটিতে তিন ইঞ্চি এল্, জি,(L.G large game slugs) স্থান দিয়েছিলাম। প্যারাডক্সের পেঁচানো নলেই বৃহদাকার ছর্‌রা পুরলাম। কথায় বলে নেড়া কবার বেলতলায় যায়। প্রাচীন প্রশ্ন আমাকে গুলী সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিল। L.G. কাছ থেকে, ঝালে-ঝোলে, অম্বলে সবেতেই চলে; বড় ছর্‌রা—প্যারাডক্সের নল থেকে বার হলে বাঘকেও কাবু হতে হয়।

বাংলোমুখোই চলতে লাগলাম। হাঁটার জন্য সহজ রাস্তার দরকার হয়ে পড়েছিল। দিগ্‌ভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা ছিল না। জঙ্গলী প্রথায় দশ-বারটি অন্তর গাছে গোলা চুন ছিটিয়ে এসেছিলাম। শুকনো চুনের সাদা, শান্ত সবুজের পরিবেশে বিকট হলেও পথপ্রদর্শক হিসাবে খুবই কাজে লাগছিল। আমার চিহ্ন দেবার প্রথা অভিনবও ছিল। সাবান-রাখার প্লাসটিক বোতলে গোলা চুন সঙ্গে এনেছিলাম। প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ গাছের উপর চিহ্ন দিতে হলে বোতল টিপলেই পিচকারির মত খানিকটা সাদা ছিটিয়ে পড়ছিল। কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করতে হয়নি।

চলার পথে নজর কেবল চিহ্নের দিকে আটক ছিল না, ডালপালা এবং ঝোপগুলিও দেখে নিচ্ছিলাম। ময়ূরের প্রতি আকর্ষণ ছিল বেশী। বন্দুকের আওয়াজে ঝরণার কাছ থেকে পালালেও নিজেদের পাড়া ছেড়ে কতদূর আর যাবে। আশাকে আঁকড়ে ধরে এগোতে লাগলাম। অনেকটা পথ চলে এসেছি। সামান্য দূরেই খাদের ধারে চিহ্নিত গাছ নজরে এসে গিয়েছে। রাস্তায় নামতে হলে, আবার তল্পিতল্পা পিঠে ঝোলাতে হবে। বন্দুকের প্রস্তুত ঘোড়া (ready trigger) অচল (safe) করব কিনা ভাবছি এমন সময় সমস্ত পাহাড় কাঁপিয়ে বন্দুক ছোড়ার শব্দ শুরু হলো।

একটার পর একটা গুলী চলেছে, কতকটা পল্টনের কুচকাওয়াজ অভ্যাসের মত। বিস্ময়কর ঘটনা, এমন একটি স্থানে পল্টনের আবির্ভাব হলো কেন বুঝলাম না। অনুমানকে বহুদিকে ছোটালাম, কোন ফল পেলাম না। গুলী যেভাবে চলছিল তাতে নির্দিষ্ট নিশানার কিছু থাকলে এতক্ষণে ছোট দুর্গ পর্যন্ত ধূলিসাৎ অথবা লুট হয়ে যেত। কৌতূহলে যখন দিশাহারা হবার অবস্থা তখন একটু দূরে রাস্তার ধারেই অনেকগুলি ঝোপ একসঙ্গে নড়ে উঠল। বন্দুক বগলে তুলে

নিলাম। ঝোপ যেভাবে নাড়া খেয়েছিল তাতে একাধিক বড় জানোয়ারের আগমন-সঙ্কেত পেয়েছিলাম। দুটো ঘোড়াতেই আঙ্গুল ছুঁইয়ে রাখলাম। বধ্য জীবের আকার অনুপাতে যখন যেটা দরকার হবে তখন সেইটি টিপে দেব। ঝোপের নাড়া বেগে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল, হঠাৎ গতি থেমে গেল। ঝোপ ছোট হলেও উপরে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। নীচের দিকে লক্ষ্য করতেই বাঘের থাবা নজরে পড়ল—সামনের দুটো পা অসাধারণ চওড়া। খুব সম্ভবতঃ গত রাত্রের বাঘিনীই হবে, বাংলোর কাছে তাড়া খেয়ে, জঙ্গলের আড়াল নিয়ে এদিকে এসে পড়েছে। বাচ্চা-সমেত তাড়া-খাওয়া বাঘের উপর আন্দাজে গুলী চালাবার সাহস পাচ্ছি না। অজায়গায় গুলী লাগলে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। জঙ্গলের নড়া যেখানে থেমেছে সেখান থেকে বাঘ এক লাফেই আমার উপর এসে পড়তে পারে। কোন দিক দিয়ে বাঁচার উপায় না থাকায়, আমার অনুপাতে বাঘের আকার অনুমান করে বুকের প্যারাডক্সের নল খালি করে দিলাম। ঝোপ যেটুকু নড়ল তাতে বাঘের গায়ে গুলী লাগল কিনা বুঝতে পারলাম না, কিন্তু পিছনের ঝোপ সাংঘাতিকভাবে নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঝোপের ভিতরেই পলাতক জানোয়ারদের গতি দেখলাম রাস্তার দিকে।

এই সঙ্কট অবস্থায় কিভাবে সাহস পেলাম বলতে পারি না। মৃত্যুদূত সামনে থাকা সত্ত্বেও খালি নল বড় টোটা দিয়ে ভরে নিলাম। তারপর অটল-ভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম। কোন গাছের আড়াল নেবার সুবিধা ছিল না। পিছন ফিরলে আক্রমণের সুযোগ আমি নিজেই দিয়ে দেব। বেশ খানিকক্ষণ সময় কেটে যেতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, নয় বাঘ মরেছে, অথবা পালিয়েছে। মরা সম্বন্ধেই নিশ্চিত হলাম। তা না হলে জখমি বাঘ অত কাছ থেকে বন্দুকধারীকে ছেড়ে দিত না। অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে এগোতে লাগলাম। ঢিল ছুঁড়ে অনুমানকে পরীক্ষার প্রশ্ন অবান্তর কারণ বেঁচে থাকলে ঢিল ছোড়ার পর উপযুক্তভাবে বন্দুক ধরারও সময় পাব না, জখমি বাঘ সঙ্গে সঙ্গে লাফ মারবে। নীচু হয়ে নুড়ি কুড়োতে গেলে একই অবস্থা হবে। দু'এক পা অগ্রসর হবার পরই মনে হলো কাজটা ঠিক করছি না। বরং পিছু হেঁটে কোন গাছের ছোঁয়া যদি পাই তাহলে উপরে উঠলে ওখানে বাঘ আছে কিনা জানতে পারা যাবে। মুখ সামনের দিকে থাকলে এবং কপাল একান্ত খারাপ না হলে আর একবার গুলী চালাতে পারব। পরের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে পিছুতে লাগ-

লাম। কপালগুণে উপযুক্ত দূরত্বের কাছে পৌঁছতে একটি গাছের ছোঁয়া পেতেই ওপাশে চলে গেলাম এবং সামনের দিকে মুখ রেখে উপরে ওঠা শুরু করে দিলাম। উপরের দিকে কয়েকটা ডাল পার হতেই ঝোপের অপর দিকে বাঘের পিছন-দিককার গোটা পা দেখতে পেলাম। বাঘ শুয়ে পড়েছে। হাতে ঝোলান বন্দুক কোনপ্রকারে বগলে বসিয়ে আবার আন্দাজে গুলী চালালাম। বাঘ নড়ল না, এবার নিশ্চিন্ত হয়ে নেমে এলাম। ঝোপের কাছে এসে হতাশ হতে হলো। বাঘ মারিনি। ঝোপের তলায় ব্যাঙের ছাতা এবং শুকনো ঘাসের জংঝামুড়িতে হুবহু দূর থেকে বাঘের পিছনকার মতো দেখাচ্ছিল। কল্পনা তেড়ে ওঠায় ঘটনাটি হাস্যকর হয়ে উঠল।

মায়ার বন্ধন না থাকায় বাংলোমুখো হতে হলো। বেশীদূর যাইনি, মোটর-গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। লোকজন রাস্তায় নেই, তবু অবিরাম হর্ন বেজেই চলেছে। গাড়ী বাংলোর দিক থেকেই বেগে ছুটে আসছিল। গাড়ী একটা নয়, দুটো জিপ—একরাশ লোক। পিছনের গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া সাহেবী ধরনের দুইটি অল্পবয়স্ক যুবক পিছনের সিটের পাদানীতে বসেছে। বাইরে থেকে কেবল তাদের মাথার খানিকটা দেখা যায়। বন্দুকের নলও আকাশের দিকে। অকস্মাৎ আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম তার কাছে আসতেই আবার অনবরত গুলী চলতে লাগল। ম্যাগাজীন রিপিটার রাইফেল (Magazine repeater rifle) থেকে গুলি বার হচ্ছিল।

ইতিপূর্বে রাইফেল চালিয়ে কাকেও আতসবাজী ছোঁড়ার সাধ মেটাতে দেখিনি। নলের মুখ আকাশের দিকে থাকলেই বা কি হয়। নল আমার দিকে ঘুরে গেলে মাথাটাই উড়ে যেতে পারে। হঠাৎ উবুড় হয়ে মাটির উপর শুয়ে পড়লাম। উপস্থিত বুদ্ধি প্রাণ বাঁচিয়ে দিল। উবুড় হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছ থেকে হাত দুই দূরে একটি মোটা পাথরের চাঁইতে গুলী লাগায় ফেটে চৌচির হয়ে গেল। মোটরের শব্দ বহুদূরে মিলিয়ে যেতে ওঠার সাহস পেলাম। বন্দুক আর হর্নের আওয়াজে জঙ্গল তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল। বাঘিনী কেন, ওর চৌদ্দপুরুষ জঙ্গল ছেড়ে শহরে গিয়ে উঠল কিনা কে জানে।

বাঘ তাড়ানোর চূড়ান্ত ব্যবস্থা শেষ হলে পরম নির্লিপ্তের মত আস্তানার দিকে চলতে লাগলাম। বাংলোয় ফিরেই বা করব কি। অনাহার ও তৃষ্ণার পীড়ন তো শিকারে অপরিহার্য সাথী আছেই, তার উপর সাফল্যের জন্য যদি নির্লিপ্ততাকে প্রস্তুত রাখতে হয়, পরম বাঞ্ছিতকেও মায়ার দোহাই পেড়ে পরিত্যাগ করতে হয়

—তাহলে শিকারের সখও ছাড়তে হয়। কিন্তু আমার কাছে শিকার তো সখ নয়, রোমাঞ্চের নেশা। জঙ্গলী ফুলের গন্ধ, বিশাল বনস্পতির রূপ, আদিম কালের বুড়ো পাথর—তার সঙ্গে নানা ভয়ের সম্ভাবনা আমাকে টেনে আনে জঙ্গলের ভিতর। ইতিপূর্বে বহু ব্যর্থতা আমাকে হতাশ করেছে। ব্যর্থতার পর সঙ্কল্প দ্বারা নিজের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি আর শিকারে আসব না। বন্দুকগুলো সব আছড়ে ভাঙব। কিন্তু সুযোগ পেলেই বনের আহ্বানে আবার ফিরে এসেছি।

সাফল্য ও ব্যর্থতার চিন্তা নিয়ে বাংলোয় পৌছতেই নজর পড়লো একজোড়া পুষ্ট মুরগীর উপর। চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। দুর্ভাগ্য পিছু নিয়ে থাকায় মনে হলো আর একটি ছলনার ব্যবস্থা হয়েছে। মুরগী দুটোর পা-বাঁধা রোয়াকের উপর পড়ে আছে। কোন মানুষকে দেখতে পাচ্ছি না, ওগুলো এলো কেমন করে? প্রশ্নোত্তর পাওয়ার আগেই আর একদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। সেই তেঁতুল গাছের ডাল থেকে একটি মৃত হরিণের বাচ্চাকে ঝোলানো হয়েছে। খানিকটা ছাল ছাড়ানো। ব্যাপারটি অনুমান করে বুঝলাম, সাহেবী ধরনের যুবক দুইটি এদিকে শিকারেই এসেছিল।

নতুন শিকারীদের খুব সম্ভবতঃ পাশও নেই। বধ্য পাখী বা জন্তু সম্বন্ধে সরকারী আইন জানা থাকলে হরিণের বাচ্চা মেরে মোটা টাকা জরিমানা দেবার ব্যবস্থা করত না। বাচ্চা তো দূরের কথা, প্রাপ্তবয়স্ক হরিণের সিং মেপে গুলী চালাতে হয়। দৈর্ঘ্যের মাপে সামান্য কমতি পড়লেই আইনের প্যাচ মস্তক মুণ্ডিত করে পাপক্ষয়েরও ব্যবস্থা করিয়ে ছাড়ে। এই কারণে শোনা যায় নীতিবাদীরা সঙ্গত আইনকে আরো শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, দূরবীণাক্ষীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে বন্দুকধারীর জঙ্গলে প্রবেশ নিষিদ্ধ হোক।

নতুন শিকারীর দল। জনহীন খালি বাংলো দেখে এদিকে এসে পড়েছিল এবং শিকারলব্ধ বাচ্চার ছাল ছাড়ানোর আদেশ দিয়ে আশে-পাশের জঙ্গলে ঘুরছিল। ইতিমধ্যে বাঘিনীর পরিবার গাছ থেকে ঝোলা ছাল ছাড়ানো মাংসের গন্ধ পেয়ে এদিকে আসে। মাঝপথে হিংস্র জীবটির সঙ্গে নিশ্চয় সাক্ষাৎ হয়ে গিয়েছিল। তারপর কোন দিকে দৃকপাত না করে আকাশ লক্ষ করে গুলী চালায় এবং কালক্ষেপ না করে গাড়ীতে চড়ে বসে। সামনের গাড়ীতে বসতে সাহস পায়নি। দেহরক্ষীদের এগিয়ে দিয়ে বিপদকে হাল্কা করে নিয়েছিল।

ঘরের দরজা খোলাই ছিল। প্রবেশপথে কয়েক জোড়া স্থানীয় চপ্পল (চটি জুতো) নজরে পড়ল। কোনটাতে গোটা চামড়া নেই। বহু তাপ্পির আবির্ভাবে সাজানো ঘুণ্টি অন্তর্ধান করেছে। বুঝলাম জঙ্গলীরা ফিরে এসেছে। ঘরের ভিতরে ঢুকতে দেখি, তিনজন জড়সড় হয়ে একটি কোণায় বসে আছে। আমাকে দেখে একজন এগিয়ে এসে যা বলল, তাতে আমার অনুমানে বিশেষ কোন গলদ পাওয়া গেল না। ওরা বাংলোর কাছে আসতেই গুলী চলা শুরু হওয়ায় বাঁধা মুরগী দুটিকে রোয়াকে ফেলেই ঘরে ঢুকে পড়েছিল। ওদের সঙ্গে সাহেবের লোকদেরও ডেকে নিয়েছিল। বাঘ যদি ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে তো ওদের মধ্যেই কা'কেও আগে নেবে। বিপদে পড়লে সব মানুষের মনই যে চিন্তাশীল হতে পারে, তা জঙ্গলের অভিজ্ঞতা না থাকলে বিশ্বাস করা চলে না।

শূন্যে গুলী চালিয়ে বাঘ মারার বাহাদুরী দেখে আমার বিশ্বাস জন্মাল, ওরাই নিহত বাঘের মাথায় মারতে গিয়ে লেজের খানিকটা উড়িয়ে দিয়েছে।

জঙ্গলীরা যখন জিজ্ঞাসা করল—মরা হরিণটা সাহেবরা ছেড়ে গিয়েছে, ওটাকে নিয়ে কি করা যায় তখন আমাকেও চিন্তাশীল হতে হলো। ভুলক্রমে কোন ফরেস্ট অফিসার এদিকে এসে পড়লেই তো চমৎকার মাথা মুড়ানোর ব্যবস্থা আমার উপর দিয়েই শেষ করবে। বিপৎসঙ্কুল প্রমাণ সামনে রাখার চেয়ে উদরস্থ করে ফেলা ভাল। বলে দিলাম, তাড়াতাড়ি ছাল ছাড়িয়ে ফেল, তারপর চারটে পা রান্না কর শুধু মাংস খেয়ে পেট ভরাতে হলে কিছু পড়ে থাকবে না। বাকি মাংস ডালে ঝুলিয়ে রাখতে বললাম। উদ্দেশ্য ছিল। বাঘিনীর সঙ্গে বোঝাপড়ার লোভ তখনো ছাড়তে পারিনি। ঠিক জানতাম, সপরিবারে যখন এখানেই বসবাস করছে তখন রাত্রে ঠিক এদিকে ফিরে আসবে। সম্ভাবনা জঙ্গলীদের বললে সুবিধা হবে না জেনেই উদ্দেশ্যের কথা তুলিনি।

ইত্যবসরে জানালা, কবাট ও স্নানঘরের ধসা জায়গাটা গাছের ডাল দিয়ে নিরাপদ করা দরকার। দু'জন ছাল ছাড়ানোর কাজে লেগে যাওয়ায় উপরি লোকটিকে ডাল কেটে আনতে বললাম। সে কিছুতেই এক-পা জঙ্গলের ভিতর যেতে চায় না। অবশেষে আমাকে বন্দুক নিয়ে অনুসরণ করতে হলো। ডালগুলি সংগ্রহ হওয়ায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করলাম।

মেরে-আসা বাঘ সম্বন্ধে পুনরায় আশা এগিয়ে আসতে লাগল। শেষের লোকটিকে কাছে ডেকে কোন কথা বলবার আগেই তার হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললাম, "আরো দেবো, যদি গ্রাম থেকে কতকগুলি

জোয়ান লোক নিয়ে আসতে পারো"—প্রকাণ্ড বাঘ মেরেছি। সেটা ঝরণার কাছেই পড়ে আছে। সাহেবরা ঐ বাঘটাকে জখম করে পালিয়েছে। জখমি বাঘের কথা উঠতেই লোকটা জোড় হস্তে অদৃশ্য দেবতাকে প্রণাম করল, তারপর নোট আমাকে ফেরত দিয়ে বললে—ও বাঘকে কেউ মারতে পারে না। জঙ্গলের দেওতার উপর গুলী চালিয়ে আমি মহাপাতক করেছি। এর পর বিপদ কোন্ রূপ নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হবে কেউ বলতে পারে না। অজ্ঞাত বিপদের কথা বলে লোকটা আমাকেও আশঙ্কান্বিত করে তুলল। বাকি লোক দুটি যদি এ সদুপদেশ শুনে আমাকে ফেলে পালায় তা হলে বিপদ বাস্তবিকই ফলপ্রদ হয়ে যাবে। অন্ধ বিশ্বাস চাক্ষুষ প্রমাণেও টলবে না। ডবল লোকসান থেকে অব্যাহতি পেতে হলে ফিরতি টাকা নিয়ে নেওয়াই ভাল। এ-বিষয়ে অধিক কথা না বলে নোটটি পকেটস্থ করে ফেললাম।

হরিণের মাংসে আহার ভালই হলো। মুরগী দুটো ঘরে পুরে, আমরা সকলেই ভিতরে আশ্রয় নিলাম। গভীর রাত্রে বাঘিনীর এদিকে আসার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ঘরের ভিতর আলো জ্বালিয়ে রাখতে হলো। খাটিয়ার ভোগ বঞ্চিত হওয়ায় মাটিতেই হোল্ড-অল পেতে শোওয়া ছাড়া গতি ছিল না। মাকড়সার ভয়ে ঘুম আর আসতে চায় না। কীটের উৎপাত না হলে আলো নিবিয়ে বাঘের জন্য অপেক্ষা করতে পারতাম। বাঘের জন্যে জেগে থাকা এক জিনিস, আর ভয়ের তাড়নায় ঘুম না আসা অন্য ব্যাপার। কোন সুতার শেষাংশ গায়ে লাগলেই মনে হচ্ছে ঐ বুঝি এলো। শতরঞ্চির কারুকার্য একটু বাহারি হওয়ায় কথায় কথায় আতঙ্ক তেড়ে আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আরাম বর্জন করে উঠে বসলাম। কতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকা যায়—একটা সিগারেট ধরালাম। ঘরের বাইরে দৃষ্টির পথ আগেই বন্ধ করে দিয়েছি। গাছের ডাল ও লোহার গরাদ মিলে জানালার উপর চৌকোশ বুনন হয়ে গিয়েছে। যেটুকু জায়গায় বড় ফাঁক টর্চ-লাগানো বন্দুকের নল বার করবার জন্য আছে, সেখান মুখ নিয়ে কিছু দেখবার ইচ্ছা ছিল না।

রাত্রি গভীর হয়ে গিয়েছে। জঙ্গলেও জাগরণের সাড়া শুনছি। তিনটে মানুষই ঘুমিয়ে পড়েছে। নাক-ডাকার আওয়াজে শাস্ত্রী-পাহারার হাঁক জঙ্গলময় ছড়িয়ে পড়ছে। লণ্ঠনের আলো, নাসিকার হুঙ্কার ও বিকালে সামরিক প্রথায় বন্দুক চলা সত্ত্বেও বাংলোর পিছনেই ফেউএর ডাক শুনতে পেলাম। বিছানার পাশেই তিন ইঞ্চি এল.জি.-(মোটা ছর্‌রা) ভরা দোনলা রাখা ছিল। টর্চ-সংযুক্ত

বন্দুক তুলে আলো নিবিয়ে দিলাম। তারপর অতি সন্তর্পণে জানালার পাশে বসে বন্দুকের নল বার করে দিলাম। ফেউএর ডাক বাংলোর তিন পাশে ঘুরতে লাগল—কিছুতেই সামনে এলো না।

কিছুক্ষণ বাদে ফেউএর ডাকও দূরে মিলিয়ে গেল। প্রথমতঃ মারা বাঘ হাতছাড়া হওয়ায় দমে গিয়েছিলাম। আবার যখন সুযোগ পেয়েছি তখন ছেড়ে দিলে লোকে আমাকে টিটকারী দেবে। বাঘ মারবার বাহাদুরী কেহই বিশ্বাস করবে না। দম্ভের কশাঘাত আমাকে ঘর থেকে বার করিয়ে ছাড়ল। ঝোলানো মাংসের সামনে খোলা রোয়াকে বসলে কোন লাভ হবে না। কোন দিক থেকে আমাকে দেখতে পেলে বাঘ মাংসের ত্রিসীমানায় আসবে না। ভাবলাম, পিছনদিক থেকে গাছে চড়ে যদি খোলার ছাদে বসতে পারি, তা হলে শিকার মাংসের কাছে গেলে এল.জি. নিজের কেরামতি দেখিয়ে দেবে। চিন্তাকে কার্যে পরিণত করায় দ্বিধার কিছু ছিল না। স্নানের ঘরের পাশেই খিড়কির কবাট। কবাটের সামনেই ডালটি উঠে গিয়েছে ছাদের উপর। স্নানের ঘরের কাছে এসে ডালের দিকে টর্চের আলো ফেলতে ডালের উপর তা গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রোষমিশ্রিত চাপা গর্জন শুনলাম। অমন একটি জায়গা থেকে বাঘের বিরক্তিপ্রকাশ হবে আশা করিনি। আলো আরো উপরে ফেলতে দেখি, —বাঘ ডালের উপর মাঝপথে আড়ভাবে নীচুদিকে দেখছে। চোখের উপর আলো পড়ায় আমাকে দেখতে পায়নি; আমার দিকে ঘোরবার যথেষ্ট জায়গা না থাকায় ওখানে দাঁড়িয়েই লেজ নাড়ছে। প্রথমটা আমার বুক কেঁপে গিয়েছিল; কিন্তু বাঘের বুক তাগ করে এগিয়ে দেওয়ার নিশানা না করেই ঘোড়া টিপে দিলাম। বাঘ থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল, তারপর মাটিতে পড়ে গেল। মাটিতে পড়বার আগেই আর একটা নল খালি করেছিলাম। স্ন্যাপ সটে (snap shot) অভ্যস্ত না থাকলে, অকস্মাৎ টিপ না করে গুলী চালাতে পারতাম না। গল্প লেখার অভ্যাসও সেদিন বাঘ শেষ করে দিত।

ঘটনাগুলি মনে পড়লে ফেলে-আসা যৌবনকে ফিরে পেতে ইচ্ছা করে। ম্যালেরিয়া, মাকড়সা, সাপ এবং বাগদা চিংড়ীর মত বৃহৎ দাঁড়াযুক্ত কাঁকড়াবিছের সঙ্গে সহবাসের সাহস না থাকলেও জঙ্গলের ভয়ঙ্কর রূপ আজও আমাকে ডাক দেয়। অবসর পেলে বন্দুকগুলো যখন পরিষ্কার করি তখন ঘুমন্ত হিংস্র প্রবৃত্তি সজাগ হয়ে ওঠে। আমার সান্ত্বনা এইটুকু, বলিদানে পূজার্ঘ্য দিয়ে জীবহত্যার পুণ্য সঞ্চয় করি না, জঙ্গলে ঘোরায় আনন্দ পাই। মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘ মারতে পারলে সাহসীর দম্ভ প্রতিষ্ঠায় আরো খুশী হই।

শার্দূল সন্ধানে

প্রায় নয় মাইল লোকালয় পিছনে ফেলে এসেছি। সারা দুপুর রোদ মাথায় নিয়ে, খাড়াই পাহাড়ে হাঁটা সম্ভব হতো না, যদি-না শিকারের নেশা আমাকে টেনে না নিয়ে চলত। ছাউনীআলা দুটো গরুর গাড়ী যোগাড় হয়েছিল। গোড়ার দিকে ছায়ার আশার গাড়ীর ভিতরেই বসেছিলাম, কিন্তু নুড়ির ঠোকরে ছাউনীর দু'চারটে হেঁচকা মাথায় লাগায় আরাম সুবিধার লাগল না; গাড়ী থেকে নেমে পড়তে হলো—তারপর সারা রাস্তা হেঁটেই আসছি। টেনিস্‌সু-র রবার-সোল প্রায় গলে যাবার যোগাড়। পায়ের তলায় গরম অসহ্য হলে মাঝে মাঝে জল ঢেলে দিচ্ছি। এরই মধ্যে গাছের ছায়ায় দুবার বসেছি, চলাব ক্লান্তি দূর করবার জন্যে নয়—জুতার ভিতর গরম জলে পা দুটো হেজে যাবার মত হয়েছিল, একটু হাওয়া না লাগিয়ে পারিনি।

শেষ পযন্ত মালকোণ্ডা সেণ্টারে পৌছানো গেল---বেলা আন্দাজ পাচটার কাছাকাছি হবে। শীতকাল, বিকালের শেষে পাহাড়ী ঠাণ্ডা জানিয়ে আসছিল স্থানটি অন্ধ্রপ্রদেশে, করনুল অঞ্চলে। এখানে আর একবার বাঘ শিকারেই এসেছিলাম। এক বৎসব আগের কথা। সেবার গাছের উপর মাচান বাঁধার সময় না পাওয়ায় মাটিতে বসতে হয়েছিল। মাটিতে এর আগেও বসেছি, তখন তাড়াহুড়া ছিল না, আড়ালের জন্য সব-কিছু মনের মত করে গুছিয়ে নেওয়া গিয়েছিল। কিন্তু গতবার সবকিছুই ওলোট-পালট হয়ে গেল। ১৫/১৬ হাতের মধ্যে খোলা জায়গায় বাঘ পেয়েও গুলী চালাতে পারিনি। এই কারণে বে-দরদীদের কাছ থেকে টিটকারীও শুনতে হয়েছিল। অনেকে বলেছিলেন, সাহস যদি নেই তো বাঘের গায়ে বন্দুক ঠেকিয়ে শিকার করতে যাওয়া কেন? কথা গুলো আজও ভুলতে পারিনি।

সে-রাত্রির ঘটনা বললে যে কোন অভিজ্ঞ শিকারী আমার উপস্থিত বুদ্ধিকে সমর্থন করবেন। ঘটনাটি এইরূপ। কৃত্রিম ঝোপ বানিয়ে তার আড়ালে মাটিতেই বসেছিলাম। বাঘের natural kill আমার বসবার জায়গা থেকে পনের হাত দূরে রাখা হয়েছিল, যাতে সাধারণ বন্দুক দিয়ে এবং চোখ-কান বুজে

গুলী চালানো যায়। L.G. ছর্‌রা হলে তো কথাই নেই। (আমি পারতপক্ষে L.G. ব্যবহার করি না—এবং এদিকে বাঘ মারার জন্য ঐ ছর্‌রার ব্যবহার আইন দ্বারা নিষেধও আছে।) গুলী চালানোর বাড়তি স্থবিধার জন্য চড়া আলোর ব্যবস্থা করেছিলাম। মোটরকারের head light আমার মাথার উপর ছাউনীতে বাঁধা হয়েছিল, ব্যাটারী ছিল আড়ালের মধ্যে। এইসব ছোটখাট বাঁধনের কাজ টাটকা ছেঁড়া গাছের ছাল দিয়ে হয়ে থাকে। গাঁটের মোচড় কড়া হলে বাঁধন ভালই হয়, কিন্তু নরম হলে বাঁধন পিছলে ছালকে ধরে রাখতে পারে না। অন্ধকার হবার আগেই আড়ালের ভিতর বসতে না পারলে সব আয়োজনই পণ্ড হবে, কাজে-কাজেই যেমন-তেমন করে আলো ইত্যাদির ব্যবস্থা সেরে লোক-গুলো চলে গিয়েছিল।

রাত হলে দূরে ফেউএর ডাক শুনলাম, কিন্তু বনের রাজার অগ্রদূত কাছে এলো না। বুঝলাম, কোন সন্দেহের কারণ ঘটেছে। ফেউএর ডাক থেমে যাবার পর কান খাড়া করে রেখে প্রায় ঘণ্টাখানেক নিশ্চল অবস্থায় বসেছিলাম। প্রত্যাশিত আগমনবার্তার সঙ্কেত আবার পাওয়া গেল, একটু দূরে কয়েকটা শুকনো কুটো-ভাঙ্গার শব্দে। অতি সন্তর্পণে বন্দুকের বাঁট বগলে লাগিয়ে gun rest থেকে নল তুলে বাঁ হাতে ধরে রাখলাম। সময় কাটতে লাগল, আমার বুকের ভিতরটা থেকে থেকে ধড়ফড় করে উঠেছে, যে কোন মুহূর্তে একটি চরম ঘটনা ঘটার সম্ভাবনায়। আরও খানিকটা সময় কেটে গেল, তারপর হঠাৎ মরা গরুটাকে হিঁচড়ে টানার শব্দ শুনলাম। ঐ natural kill, স্থবিধার প্রয়োজনে খানিকটা নাড়িয়ে রাখতে আমার মত কয়েকজন জোয়ানকে হিমশিম খেয়ে যেতে হয়েছিল। বন্দুকের নলে ঝোলান তারে বাঁধা স্থইচ লাগান ছিল, টিপে দিলাম। আলো মাটিতে পড়ল, ঠিক আমার মুখের সামনে রঙ্গমঞ্চে foot-lightএর মত। মাটি থেকে ঠিকরে-আসা আলো gun-hole ভেদ করে আমার মুখের উপর এসে পড়াতে চোখ ঝলসিয়ে দিল। বাঘ তখন অন্ধকারে মিলিয়ে আছে, ঠিকরানো আলো যতটা ওদিকে পড়েছিল তাতেই দেখলাম, দুটি জলন্ত চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার দৃষ্টি একটু ধাতস্থ হতে দেখলাম, বাঁ হাতের উপর একটি বড়সড় তেঁতুলবিছে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। বাঘ সামনে আসবার আগে কুটোভাঙ্গার শব্দ যখন শুনেছিলাম তখন বাঁ হাতে শুড়শুড়ি দেবার মত অনুভূতি বোধ করেছিলাম, কিন্তু বাঁচা-মরার সন্ধিক্ষণে শুড়শুড়ির কারণ অনুসন্ধান করবার অবসর ছিল না। এখানে আমার শিকারে

সহকারীর কথা বলে নেওয়া দরকার। রাতের শিকারে পালা করে রাত-জাগার জন্য একজন লোক সঙ্গে রাখি, আমি ঘুমিয়ে গেলে সন্দেহজনক কোন শব্দ শুনলে আমাকে সে জাগিয়ে দেয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে উভয়ে জেগে ছিলাম। তথাপি লোকটি ভয় পেয়ে এমন একটি শব্দ করে বসল যে, বাঘ গেল ঘাবড়ে এবং একটি হুঙ্কার দিয়ে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে গেল। বর্ণিত আবেষ্টনীতে এত কাছ থেকে ত্রাসজড়িত বাঘের বিরক্তিপ্রকাশ স্বকর্ণে না শুনলে প্রতিক্রিয়ার কথা বোঝানো যায় না। যাই হোক, লোকটা অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রইল। সারা রাত দুর্গন্ধের মধ্যে কাটালেম। শব্দভেদী অবার্থ বাণ চালানোর মত রাইফেল থেকে গুলী বার করায় অভ্যস্ত হলেও vital partএ লক্ষ্য করা সেরা ওস্তাদের পক্ষেও অসাধ্য কর্ম। সার্কাসের খেলায় এই ধরনের পারদর্শিতা দেখানো সোজা, কারণ সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়ার কোন শর্ত থাকে না। কিন্তু যেখানে nerveএর সঙ্গে লড়াই করে তাগমারী করতে হয় এবং নিশানার এক ইঞ্চির ভুলে জীবন নিয়ে টানা-পোড়েন চলে, সেখানে আন্দাজে গুলী চালানো ও হিসাব করে আত্মহত্যায় কোন প্রভেদ নেই। আত্মহত্যার প্রয়োজনীয়তা তখন বর্ত্তমান ছিল না, তাই গুলী চালাতে পারিনি। আমার সাফাই গাওয়া শুনেও অনেকে মুচকি হাসির আড়ালে কাপুরুষ বলতে ছাড়েননি।

আত্মাভিমান পিছু নিয়েছিল। ঐ বাঘকে আজও কেউ মারতে পারেনি শুনে আর একবার চেষ্টা করে দেখবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছিল। তখন বাঘের খবর আমার কাছে টেলিগ্রামে আসত। পরিচিত ফরেস্ট অফিসারের কাছ থেকে তার পেয়ে ডিণ্ডিগামেটায় এসে উপস্থিত হলাম। স্টেশনটি মাদ্রাজ থেকে প্রায় চার শ' মাইল হবে।

মালকোণ্ডার কথায় ফিরে আসি। স্থানীয় খবরী যে ঠিকানা দিয়েছিল, তার বর্ণনা অনুসারে ঠিক জায়গাতেই এসেছি বলে মনে হলো, কিন্তু মাচান বাঁধার জন্য আগে যাদের পাঠিয়েছিলাম তাদের মধ্যে কা'কেও দেখতে পেলাম না। ভোর হতেই ওরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েছিল আমরা এখানে পৌঁছবার আগেই মাচান বেঁধে রাখার জন্য। যাদের পাঠিয়েছিলাম, তাদের রাস্তা ভুল হবার কথা নয়, কারণ খবরী নিজে তাদের সঙ্গে ছিল। আমি যাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম, তাদের ভিতর একজন পাচক, একজন শিকারী এবং আর একজন

স্থানীয় কুলি। মাচান বাঁধার কৌশল ওদের মধ্যে কারো জানা নেই। শিকারী নামে লোকটি বন্দুকধারী নয়, রাত-জাগার জন্য সঙ্গে এসেছিল।

গাছের উপর রাত্রিবাসের কোন আশা না থাকায় রাতটা বেকার কাটানোই স্থির হলো।

যে বাঘের সন্ধানে এসেছিলাম, ইতিমধ্যে তার নরখাদক হিসাবে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ মারার খ্যাতি সংগ্রহ করেই সন্তুষ্ট হতে পারেনি, হিংস্র জীবটি নাকি গুণ-তুকও জানে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এ-বিষয়ে দ্বিমত নেই, থাকার কথাও নয়। জনরব, অনেকে নাকি স্বচক্ষে দেখেছে বাঘ নানা রূপে আবির্ভূত হয় এবং দর্শনদানেই শিকারীকে অজ্ঞান করে ফেলে। অজ্ঞান না হলে বিলাতী বন্দুকের কল পর্যন্ত বিগড়ে দেয়, ঘোড়া (trigger) টিপলেও বারুদ ফাটে না। এমন একটি জীবের আস্তানায়, খোলা জায়গায় রাত্রিবাস স্থানীয় লোকদের পক্ষে যে কি ব্যাপার তা সহজেই অনুমেয়।

যেখানে আমাদের রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা হলো তার সামনে অনেকটা জায়গা খোলা এবং অস্বাভাবিক রকমের পরিষ্কার। হঠাৎ দেখলে মনে হয় পাশাপাশি দু'তিনটি টেনিস কোর্ট করবার জন্য জমিকে কেহ রোলার দিয়ে শুধু সমতল করেনি, লন মোয়ার (lawn mower) দিয়ে ঘাস পর্যন্ত ছেঁটে দিয়েছে। খালি জায়গার একদিকে মোটা ঝুরআলা বটগাছ—তার পাশেই ঝরণার জল বয়ে চলেছে। পানীয় জল অত কাছে পাওয়ায় কেহই বটতলায় রাত্রিবাসে আপত্তি তুলল না।

ইতিমধ্যে লোকেরা রান্নার কাজে লেগে গিয়েছে। আমার কোন কাজ না থাকায় জায়গাটা একটু দেখবার ইচ্ছা হলো। আবেষ্টনীটি আমার ভাল লেগেছিল। থেকে থেকে অবর্ণনীয় নিস্তব্ধতা চুরমার করে লক্ষ লক্ষ ঝিল্লীর ডাক উঠেছে এখানে ওখানে সেখানে, আবার থেমে যাচ্ছে জঙ্গলের নিস্তব্ধতাকে রহস্যময় করে তোলার জন্য। স্তব্ধতার মাঝে ঝরণা-বহা জলস্রোতের ক্ষীণ ধ্বনি শুনছি, যেন তানপুরার গম্ভীর বাঁধা সুরে একটানা সা-রে-গা-মা-র যোগ ঘটেছে—রাগ-রাগিণীর যাবতীয় উচ্ছ্বাস একসঙ্গে জড় হয়ে সুরস্রষ্টাকে ডাক দিয়ে চলেছে কেবল ধ্বনির সাহায্যে সুন্দরকে হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য। সুন্দরের সাড়া গাছের পাতায়, অদৃশ্য বনফুলের গন্ধে এমনভাবেই ছড়িয়ে পড়েছে যে নিজের হিংস্র প্রকৃতি ও ভয়ঙ্কর শার্দুলের কথা ভুলে গিয়েছি। মন ব্যাকুল হয়ে উঠল প্রকৃতির রূপের সঙ্গে মিতালীর জন্য।

আমাদের আস্তানার ঠিক বিপরীত দিকে জঙ্গল খুব গভীর। বিশাল গাছের তলায় আগাছার ঝোপও বেজায় ঘন! ঐ দিকটাই আমাকে টানতে লাগল। সুন্দরের ডাকে অন্তরের রসিক সাড়া দিলেও শিকারী সাবধানতার কথা ভাবেনি এমন নয়, কিন্তু অতগুলি লোকের জটলা কাছ থাকায় নিশ্চিন্তভাবে মনকে আশ্বাস দিলাম ভয়ের কিছুই নেই। তা ছাড়া বন্দুকের বাক্সগুলিও ছাউনীর ভিতরে, এখনো ত নামানো হয়নি। ওগুলি নীচে নামিয়ে বন্দুক বাছাই করতে করতে অনেকটা সময় কেটে যাবে—দরকার নেই ভেবে, শুধু-হাতেই এগোতে লাগলাম।

লোকজনদের ছেড়ে অনেকটা আসবার পর খোলা জমির মাঝখানে জঙ্গল-ঘেঁষা বাঁশঝাড় আমার দৃষ্টি আড়াল করল। সন্দেহকে সামনে রেখে জঙ্গলে হাঁটা আমার স্বভাব। সামনের দৃষ্টিতে একেবারে আড়াল পড়ায় পাশের ঝোপ-গুলির দিকে নজর রেখে চলছিলাম। হঠাৎ কোন ঝোপের ভিতর থেকে দাঁতাল বরাহ বেরিয়ে এসে আমাকে দোফালা করে দিলে অভিযোগ করবারও অবসর পাব না। আপন মনে সৌন্দর্যপিপাসুকে ধিক্কার দিলাম। কথায় বলে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। বাঘ-শিকারে এসে আত্মরক্ষার কথা ভুলে সবুজের সাড়া আর সুরের ঝঙ্কার নিয়ে মেতে উঠলে, কুষ্টির দাপট যে বুনো আওতায় ঘায়েল হতে পারে তা ভাবা উচিত ছিল। কেন বলতে পারি না, দোমনা হয়ে ফিরে যাবার ইচ্ছা এলো, সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম কেহ যেন কাছে এসে বলে গেল, 'কাপুরুষ'। পিছানো গেল না, এগোতে লাগলাম। কয়েক পা চলার পর দেখলাম বাঘের পদচিহ্ন, দাগ পুরানো, ধূলির পরত পড়ে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে, চলার গতি কোন্‌দিকে ছিল বোঝবার উপায় নেই। বাঘ কত বড় তাও অনুমান করা চলে না। অন্য পায়ের দাগ একেবারে মিলিয়ে গিয়েছে। যাক, একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, চিহ্নকে বিশ্বাস করতে পারলে ধরে নিতে হবে বাঘের চলা-ফেরা এদিকে আছে। চিহ্ন পুরানো হলেও বাঘ দিন গুণে বিশেষ বিশেষ জায়গায় টহল দেয়। যে বাঘের অস্তিত্ব ধূলার দাগে দেখা গেল তার পুনরাবর্ত্তনের সময় যে সন্নিকট নয় তা কে বলতে পারে? যবেই এদিকে ফিরুক, উপস্থিত এ জঙ্গলে নেই কিংবা খবরার দেওয়া ঠিকানায় ফিরে আসেনি। পরীক্ষা শেষ করে বাঁশঝাড়ের দিকে এগোতে যাব এমনি সময় জঙ্গলে বেশ খানিকটা ভিতরে ঝোপের তলায় পাতার উপর শব্দ শুনলাম। শব্দ দ্রুতগামী, শুকনো পাতার উপর খস্‌খসে আওয়াজ ভারী জন্তুর চলার নয়। সন্দেহ রইল না, নিশ্চয় কোন বৃহৎ সরীসৃপ।

সাপ চলেছে বাঁশঝাড়ের দিকে—হয় অজগর, না হয় রাজগোক্ষুর। হয়ত প্রেয়সীর পিছনে ধাওয়া করেছে, কারণ সহজ চলা বা শিকার ধরবার সময় চলার মধ্যে ছোটাছুটি থাকে না।

রাজগোক্ষুর হলে, এমনিতেই জীবটি বদরাগী, তার উপর প্রেমের উন্মাদনা স্কন্ধে ভর করলে সামনে বা আশেপাশের যে কোন জীবকে যমের বাড়ীর খবর দিয়ে দেয়। আমার চলা বন্ধ করে দিলাম। সাপের রাস্তা কেবল বুক দিয়ে হাঁটে না, শ্রবণের কাজও বুক দিয়ে সারে। সাপ কান দিয়ে শোনে না, মাটির উপর যে আওয়াজ হয় তারই প্রতিধ্বনি উপলব্ধি করে হাড়-পাঁজরার উপর এবং এই প্রথায় শোনায় কিছুমাত্র ভুল হয় না। গতিশীল শব্দ যখন অনেকটা দূরে এগিয়ে গেল তখন আবার চলতে লাগলাম। চলার সময় আমার দৃষ্টি চারপারে ঘুরছিল, মাটির দিকেও নজর ঠিক রেখেছিলাম—শুয়োর বা হরিণের যাতা-য়াতের কোন চিহ্ন পাইনি—এমন একটি জায়গায় বাঘ আসে কেমন করে বুঝলাম না।

চলতে লাগলাম। অনাহারী বাঘের কথা ভাবতে ভাবতে বাঁশঝাড়ের শেষ প্রান্তে এসে পড়লাম। মোড় ফিরতেই দেখি সামনে প্রকাণ্ড বাঘ। দশ-বারো হাত দূরে, পিছনদিকে মুখ ফিরিয়ে কান খাড়া করে কিছু দেখছে—হয়ত সাপ ঐ দিকেই যাচ্ছিল। আমার সমস্ত শরীর যেন অসার হয়ে গেল। পড়ন্ত রোদের আলো পিছন থেকে আসায় আমার চলন্ত ছায়া গিয়ে পড়েছিল বাঘের সামনে। ছায়ার নড়াচড়ায় বাঘ মুখ ঘোরাল আমার দিকে। অপ্রত্যা-শিতভাবে মানুষকে অত কাছে দেখে বাঘও হতবুদ্ধির মত হয়ে গিয়েছিল। বিরক্তিপূর্ণ ও শ্লেষ্মাজড়িত কাশির মত আওয়াজ বেরিয়ে এলো। আমি তখন বাঁচা বা মরা সম্বন্ধে নির্লিপ্ত হয়ে গিয়েছি। বাঘ আমাকে আক্রমণ করবার পরিবর্তে লাফ মেরে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে গেল। মুহূর্তের ঘটনায় আমার হৃৎকম্পন এমন একটি স্তরে উঠেছিল যে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হলো না, মাটিতে বসে পড়লাম। ঠিক পরের ঘটনা মনে নেই।

জঙ্গলীরা যখন আমাকে খুঁজে বার করল তখন আমি অজ্ঞান অবস্থায় মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান ফিরে আসবার পর যে-সব প্রশ্ন শুরু হলো তাতে বোঝা গেল অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বাঘের উপস্থিতি সম্বন্ধে ওরা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। বাঘের গলা-খাকরানির আওয়াজ নিশ্চয় ওদের কানে গিয়ে পৌঁছায়নি। শুনলে, আমার জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার জন্য কেহ ব্যস্ত হতো না।

বটতলায় ফিরে এসে নানা কথা ভাবতে লাগলাম। রাত্রে একটা কিছু বিশ্রী কাণ্ড ঘটবেই। মানুষ হোক, বলদ হোক, যে কোন একটি প্রাণীকে টেনে নিলে আমাকে দুরবস্থায় পড়তে হবে। বলদ গেলে খেসারত দিতে হবে—মোটা টাকার ব্যাপার; মানুষ গেলে কি যে হবে তা অনুমান করা যায় না। শেষেরটির সম্ভাবনাই চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল। দুর্ঘটনার পর সকলে একত্রে চলে গেলে করছি কি? একরাশ বন্দুক আর টোটার সন্ধান পেলে ডাকাতের দল আমাকেই শিকার করে খুন করবার পর সম্পদ নিয়ে চম্পট দেবে। ফাঁপড়ে পডে গেলাম। পিছনে ও দু'পাশেই গা-ঘেঁষা জঙ্গল, যে কোন দিক থেকে ইচ্ছা করলেই যা খুশী তাই যোগাড করে নেওয়ার কোন অসুবিধা নেই। সবই নির্ভর করছে বাঘের খেয়ালের উপর। ভাবলাম, মোষের বাচ্চাটা বাঁ ধারের জঙ্গলে আমাদের কাছ থেকে দূরে বেঁধে দিলে বাঘের দৃষ্টি নিরাপদ স্থানেই আগে পডবে। মোষের বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম, natural kill না পেলে live bait হিসাবে ব্যবহার করব বলে। যে ব্যবস্থাই করি, সারা রাত পালা করে পাহারা দিতে হবে। পাহারার ব্যবস্থা ঠিক হলেও পিছন ও দু'পাশ সামলান দরকার। পিছনটায় দুটি গাড়ী মুখোমুখি রাখলে কতকটা বেড়ার মত হয় এবং দু'পাশে ভাল করে আগুন জ্বালাতে পারলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া চলে—কারণ সামনের জায়গা খোলা। সামনে থেকে কোন বাঘকে শিকার ধরতে শুনিনি। আগুন থাকলেও সম্পূর্ণ নিরাপদ এমন কথা বলি না, তবে মোষের বাচ্চা আগুনের ওপারে থাকায়, শিকারের লোভ মোষের কাছেই আটক পডতে পারে।

মনে মনে যে জল্পনা-কল্পনা করছিলাম তা প্রকাশ করবার আগে, যেখানে বাঘকে দেখেছিলাম সেই জায়গাটা ভাল করে পরীক্ষা করে আসা দরকার। হতেও পারে যা দেখেছি তা আগাগোড়াই কল্পনা।

সারা দুপুর রোদ্দুরে হাঁটার পর ঝরণার ঠাণ্ডা জলে মাথা ধোয়ায় সর্দিগর্মীর মত নিশ্চয় একটা কিছু হয়েছিল! বাঘ দেখাটা নিরবচ্ছিন্ন কল্পনাই।

এইটুকু সময়ের ভিতর মনের অবস্থা তালগোল পাকানোর মত হয়েছে। ঠিকভাবে কিছু চিন্তা করতে পারছি না। এমন কি, বাঘের অলৌকিক শক্তি পর্যন্ত বিশ্বাস করবার জন্য মন প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হলে, কড়া দাওয়াইএর কৃপা একান্ত প্রয়োজন। দাওয়াইকে তরলাগ্নিও বলা চলে। ওষুধের পরিমাণ প্রয়োজন অনুপাতে করা নিয়ম। অব্যর্থ ওষুধ কাছেই ছিল, বেশ খানিকটা গলাধঃকরণ করে ফেললাম। অল্পক্ষণের মধ্যে

ঝিমানো ভাব কেটে গেল। জবরদস্ত ওষুধের গুণে দেখতে দেখতে বে-পরোয়া হয়ে উঠলাম।

বন্দুকের বাক্স ইতিমধ্যে গাড়ী থেকে নামানো হয়েছিল। আটপৌরে দোনলায় টোটা ভরে নিলাম। এক নলে L G. আর একটায় lethal ball থাকায় নির্ভীক হয়ে উঠলাম, হঠাৎ সামনে বিপৎসঙ্কুল কিছু পড়ে গেলে তিন ইঞ্চি এল.জি ছররা সব-কিছু সামলে নিতে পারবে। দূর থেকে নিশানা করে গুলী চালাতে হলে, lethal ball তো আছেই। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন জঙ্গল ঘিরে ফেলেছে। বৈদ্যুতিক টর্চ লাগানো ভরা-বন্দুক নিয়ে, লোকদের মানা সত্ত্বেও যথাস্থানে এসে উপস্থিত হলাম। মাটির উপর বন্দুকে লাগানো আলো ফেলতে প্রমাণ হলো শার্দূলদর্শন ঠিকই হয়েছিল। বাঘ এখানেই শুধু দাঁড়ায়নি, দাঁড়াবার আগে অনেকক্ষণ আমাদের দিকে মুখ করে বসেছিল। লেজ নাড়ার দাগ থেকে অনুমান করা চলে মতলব ভাল ছিল না। অনেকগুলো লোক এক-সঙ্গে থাকায় দিনের আলোয় ওদিকে যেতে সাহস পায়নি।

ওষুধ এর ভিতর কাজ শুরু করে দিয়েছে। ভয়ের কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পেয়েছি। বন্দুক ঠিকভাবে ধরে যেদিকে বাঘ চলে গিয়েছিল সেদিকে নানা ঝোপের তলায় আলো ফেলতে লাগলাম—কোথাও জ্বলন্ত চোখের পাত্তা পাওয়া গেল না। চড়া ওষুধ তখন ভিতরে রুখে উঠেছিল, বাড়ন্ত সাহস আমাকে ঠেলে দিল জঙ্গলের ভিতরে। উন্মাদের মত ঝোপ ভেঙ্গে চলেছি। কাঁটার সঙ্গে সংঘর্ষণে দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে—কাপড় ছিঁড়ে ন্যাকড়া হয়ে গিয়েছে, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, আমি চলেছি সামনের দিকে। গোক্ষুর, শঙ্খচূড় বা কালকেউটে দেখতে পেলে পা দিয়েই থেঁতলে দিতাম। দাঁতাল বরাহ তেড়ে এলে বলতাম—পথ ছাড়, বিরক্ত করিস্ না, কাজ আছে। বাঘ এসে গেলে গুলী চালাতাম না, তাকে বসিয়ে উপদেশ দিতাম হিংস্র প্রবৃত্তি ছেড়ে দেবার জন্য। তার সঙ্গে কত আধ্যাত্মিক কথা এসে পড়ত কে জানে। নিরামিষ আহারের প্রস্তাব করে সজনে ডাঁটা থেকে আরম্ভ করে আলু বা কুমড়ো ও কাঁচ-কলা-সিদ্ধর অপূর্ব আস্বাদের কথা নিশ্চয় বলতাম। এইভাবে চিন্তা করতে করতে কতক্ষণ গভীর জঙ্গলের ভিতর ঘুরেছিলাম বলতে পারি না, শেষ পর্যন্ত চরিত্রশুদ্ধি সম্বন্ধে মাংসভুকের কোনরূপ আসক্তি না দেখে ফিরে এলাম আস্তানায়। চলার পথে চরিত্রশুদ্ধির কথা ভাবছিলাম, মাংসভুককে নিরামিষাশী করার চেষ্টায় আতঙ্ক এসে গেল। অবশেষে ওষুধ আমাকে সাধুবাবা করে ছাড়বে না তো!

বেশীর ভাগ ছাইমাখা সাধুকে আমি বাঘের চেয়েও বেশি ভয় করি। মানুষের কথায় আসতে চিন্তা সহজ হয়ে পুনরায় সাবধানতার কথা মনে এলো। এ-বিষয়ে কিভাবে আয়োজন হবে আগেই ভেবে রেখেছিলাম। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে নিতে খুব বেশী সময় লাগল না। উনান জ্বালাবার জন্য সঙ্গে জ্বালানী কাঠ আনা হয়েছিল -কারণ, যেখানে শিকারের প্রত্যাশা থাকে তার কাছাকাছি কোন গাছ থেকে ডাল কাটলে যে শব্দ হয় তাতে বাঘের নিজের আস্তানা ছেড়ে দূরে চলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। সদ্য-কাটা ভিজে ডাল জ্বলতে চায় না। একটিমাত্র হারিকেন লণ্ঠনে কেরোসিন তেল ছিল, সব নিঃশেষ করে চুলো জ্বালানো হলো। মোষের বাচ্চাকেও যেখানে চেয়েছিলাম সেইখানে বেঁধে দেওয়া গেল। গরুর গাড়ী দুটো পিছনে দেওয়ায় আমার একটু অসুবিধা হলো —কারণ গাড়ীর তলায় খড় বিছিয়ে আমি শুই। কি আর করা যায়, হিম মাথায় নিয়েই রাত কাটাতে হবে।

ব্যবস্থা ভালই হয়েছিল। নিশ্চিন্ত হবার যোগাড় করছি, হঠাৎ বাঁদিকের বলদ দুটো ছটফট করে উঠল। চাঞ্চল্যের কারণ জানবার জন্য জঙ্গলীদের বিদ্যালয়ে যেতে হয় না, ওরাও দেখলাম অস্থির হয়ে উঠেছে।

এরূপ ঘটনার সম্ভাবনাকে মেনে নিয়ে ফিরে আসার পরই rifle, shot gun পিস্তল ও প্রত্যেকটির পৃথক্ উপরি টোটা উপযুক্তভাবে আমার পাশেই সাজিয়ে রেখেছিলাম। সাজানো আমার আবার একটি বাতিক। Rifle ও পিস্তলের টোটা ঠিক যেভাবে চেম্বারে (chamber) সাজিয়ে রাখবার নিয়ম সেইভাবে বন্দুকের বাইরে সাজিয়ে রাখাতেই নিজেকে বীরপুরুষ ভাবতে লাগলাম। সব কয়টি অস্ত্রের মালিকানা সত্ত্ব নিয়ে দম্ভ করা চলে। Colt-এর 40·5 prohibited borer পিস্তল তো বটেই। একসঙ্গে সাতটি আগ্নেয় অস্ত্র (বিভিন্ন রকম অস্ত্র দরকার হয় বিভিন্ন শিকারের জন্য, পুঁটিমাছ ধরার বঁড়শি দিয়ে যেমন কাতলা ধরা যায় না। সেজন্যই রসদ ও শিকারের বিচারে গুলী ও বন্দুকের ব্যবহারও আলাদা হয়ে থাকে। রসদের অভাব হলে, হরিণ, ময়ূর বা ছোট পাখী মারবার জন্য নানা রকমের বন্দুক কাছে রাখতে হয়। এই কারণে হাতী বা গণ্ডার মারার বন্দুককে একঘরে করতে পারিনি, সেগুলিও বন্দুকের বাক্সে এসে গিয়েছিল— আমাকে রক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে ভাবতেও আনন্দ লাগে। তার উপর, সব কয়টি অস্ত্রই বিশ্বাসী প্রয়োজনের সময় কখন বিকল হয়নি, কখন বিপদে ফেলেনি। দূর থেকে বাঘের কলজে ফাটানোর ব্যবস্থা কাছেই ছিল,

হালকা ওজনের 375 bore high velocty রাইফেল তুলে, যেখানে বসে-ছিলাম সেখান থেকেই বাঁদিকে মোষের কাছে আলো ফেললাম। ওদিকে আলো পড়তেই অতি মৃদু শব্দ শোনা গেল—শুকনো পাতা মুচড়ে যাবার আওয়াজ। রাইফেলে-সংযুক্ত আলো এদিকে ফেলতে লাগলাম। অকস্মাৎ একটি ঝোপ বেশী রকম নড়ে উঠল—তার রই দেখলাম দুটি জলন্ত চোখ। আগুন ঠিকরান দৃষ্টি বেশ খানিকক্ষণ আমার উপর নিবদ্ধ হয়েছিল। দুই চোখের মাঝখান নিশানা করে ঘোড়া টিপে দিলাম। খট করে শব্দ হলো, গুলী বার হলো না। ঐটুকু শব্দেই বাঘ মুখ ফিরিয়ে নিল। তখন রাইফেল পরীক্ষা করবার সময় ছিল না। দোনলা সাধারণ বন্দুক (shot gun) তুলে নিয়ে আবার একই জায়গায় আলো ফেললাম, চোখ দেখতে পেলাম না। আরেষ্টনী নিস্তব্ধ, কেবল বিকল trigger-এর খট্ শব্দ যেন আমার কানের পাশে পরিহাস শুরু করে দিল। বিশ্বাসঘাতকতার উপর প্রতিশোধ দেবার জন্য উত্তেজিত হয়ে উঠলাম, ওষুধের প্রতিক্রিয়া সাহস যোগান দেবার জন্য আমাকে প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক সাহসী করে তুলল। ভাবলাম, হয়ত ছোট হরিণের চোখ দেখেছি। ওদের চোখেও আলো পড়লে ঠিক বাঘের মতই জলে। জায়গাটা পরীক্ষা করা দরকার, হরিণের ক্ষুর মাটিতে দাগ ফেলে থাকলে, বুক ফুলিয়ে বলা যাবে বাঘ শিকার করতে হলে নিরীহ জানোয়ারের উপর গুলী চালানো আমার ধাতে সয় না। এক কথায়, ওদের সাজানো টিটকারী জখম হয়ে যাবে। আমার অনুমান যে সত্যি তা প্রমাণ করতে হলে জায়গাটা স্বচক্ষে দেখে আসা দরকার। মোষের দিকে যাবার জন্য বন্দুক হাতে উঠে দাঁড়ালাম। আমার উদ্দেশ্য বুঝে একজন জামা টেনে ধরল। ঐটুকু টানেই বেসামাল অবস্থায় বসে পড়লাম, মাথার ভিতরটা চরকী বাজীর মত ঘুরতে লাগল। বুঝতে বাকি রইল না যে, ওষুধের মাত্রায় হিসাবের গোল বাধিয়েছি। এমনই বেহিসাব যে বসে থাকাও সম্ভব হলো না, সামনেই খড়ের উপর শতরঞ্চি পাতা ছিল, বেহুঁসের মত শুয়ে পড়লাম।

এক ঘুমেই রাত কাবার হয়ে যেতো, কিন্তু মাঝ-রাতে সাংঘাতিক হট্টগোল উঠল। একসঙ্গে সব কয়টা লোকের চিৎকার, জলন্ত চুলোর কাঠ নিয়ে মাথার উপর ঘুরানো এবং তার সঙ্গে বলদের বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টা—সে এক তুমুল কাণ্ড। এরূপ বিশৃঙ্খলা দেখেও আবার শুতে যাচ্ছিলাম, একজন ঠেলা মেরে বললে, বাঘ মোষ মেরেছে। বাঘের কথা শুনে ঘুমের ঘোর কেটে গেল। ভারী রাইফেল নিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, লোকেরা বললে, বাঘ মোষের উপর লাফিয়ে পড়ে এক

ঝটকানিতেই ঘাড় মটকে দেয়, তার পর সকলে চিৎকার করে উঠলে মোষ ছেড়ে পালায়।

সামনের চুলো থেকে প্রত্যেকে একটি করে কাঠ তুলে নেওয়ায় এদিককার আগুন নিবে গিয়েছে। পাশের লোক জ্বলন্ত কাঠ ধরেছিল—কব্জি-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত তিনটে বেজে কুড়ি মিনিট। মানুষগুলো সারা রাত জেগেই ছিল। এই ঘটনার পর আমারও ঘুম চটে গেল। কনকনে ঠাণ্ডায় হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। ভাবলাম, গরম দাওয়াই আর একটু খেয়ে নিই, কিন্তু সাধু হয়ে যাওয়ার ভয় থাকায় বিরত হলাম। ওষুধের প্রভাব এক ঘুমেই ঝিমিয়ে গিয়েছিল, গভীর রাত্রে পলাতক বাঘের পিছনে যাওয়া প্রয়োজন বোধ করলাম না। এই সুযোগে হালকা rifle-এর cartridge chamber পরীক্ষা করে দেখলাম, টোটা সাজাবার সময় গুলী বাইরেতেই থেকে গিয়েছিল, chamberএ পোরা হয়নি। বড় rifle-এর magazine boot টান মেরে দেখি এটির অবস্থাও তদ্রূপ, গুলী ভরিনি।

ওষুধের উপরই বিতৃষ্ণা এসে গেল। না হয় একটু বেশিই খেয়ে ফেলেছিলাম, তাই বলে প্রাণ নিয়ে খেলা! থারমস্ ফ্লাস্কে গরম চা ছিল, এক পেয়ালা খেয়ে সিগারেট ধরালাম এবং পাশের লোকেদের দিতে চাইলাম। ঠাণ্ডায় মুখের কাছে ঐটুকু আগুনই আরাম দেয়। আমার লোকেরা সিগারেট নিল, কিন্তু গাড়োয়ান দুটো বেঁকে বসল। আচরণটি যে নির্বাক্ অভিযোগের নিদর্শন তাতে আর সন্দেহ রইল না।

পরের দিন সকাল হতেই গাড়োয়ানরা বললে—তাদের গ্রামে ফিরতে হবে। মোড়লের মেয়েকে মরণাপন্ন অবস্থায় দেখে এসেছে। সকালেই মারা যাবার কথা; সৎকারে যোগ না দিলে ওদের একঘরে হতে হবে। অতএব পাওনা চুকিয়ে দেওয়া হোক, এখনি ওরা রওনা হতে চায়! নির্দিষ্ট সময় ঘোষণা করে মানুষ মরে এমন কথা পূর্বে শুনিনি। ইচ্ছামৃত্যুর খবর মানতে হলো, অন্যথায় সকলে মিলে ষড়যন্ত্রে বসে যাবে এবং ফিরে যাবার প্রস্তাবে আমার লোকগুলিও যোগ দিতে পারে। আমার লোকগুলিকে আটকাতে হলে এখনি মন খুশী-করা ঘুষ দেওয়া দরকার। কালবিলম্ব না করে মোটা টাকা বকশিস দিয়ে ফেললাম। করকরে উপরি টাকা গাড়োয়ানদের সামনে আমার লোকেরা গ্রহণ করা সত্ত্বেও গ্রামমুখী চালকরা প্রলুব্ধ হলো না। বাঘ মারতে পারলে

আরো বকশিস দেবার লোভ দেখানোয় আমার লোকেরা রয়ে গেল, কিন্তু এক-গুঁয়ে গাড়োয়ানরা বিদায় নিল।

ওরা চলে যেতে, আমার লোকদের বললাম, মোষ যেখানে পড়ে আছে সেখানেই থাকতে দে। তোরা তাড়াতাড়ি যাহোক কিছু খেয়ে নিয়ে একটু দূরে উঁচু গাছের উপর উঠে পড়্। এত লোকের মাঝে যে বাঘ মোষ মারে, তার ক্ষিদে একটু বেশী। মোষের কাছ থেকে আমরা সরে গেলে বাঘ নিশ্চয় ফিরে আসবে। সকালেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যেতে পারে। বাঘ ফিরে আসার কথা জোর দিয়ে বলায় খাওয়ার কথা ভুলে গাছে ওঠার তাড়া পড়ে গেল। কপালগুণে উঁচু গাছ কাছে ছিল না, ওদের দূরে যেতে হলো। যাবার আগে শিখিয়ে দিলাম—দুবার গুলী চলার আগে গাছ থেকে নামবি না এবং বাঘকে মোষের দিকে যেতে দেখলে চেঁচাবি না।

লোকগুলো চলে যেতে, আমিও হালকা রাইফেল নিয়ে মরা মোষটার কাছেই একটি গাছে উঠে পড়লাম। কথায় বলে, 'নেড়া ক'বার বেলতলায় যায়'। গত রাত্রে ওষুধ আমাকে ভাল রকম শিক্ষা দিয়েছিল—cartridge chamber ভাল করে দেখে নিলাম।

বড় ডালে বসেছিলাম, ১২/১৩ ফিট উপরে হবে। গাছের পিছনে ছিল কাঁটা-বন। কতকটা নিরাপদ বলা যায়, কারণ যতই আহারে লোভ থাক, কাঁটাবন ভেঙ্গে বাঘ পিছন থেকে আসবে না। ডানদিক দিয়ে ঘুরে এলে গুলী চালানোর অসুবিধা আছে, কিন্তু ভোজনে বসতে হলে শেষ পর্যন্ত সামনেই আসতে হবে। কতক্ষণ আমাকে বৃক্ষারূঢ় অবস্থায় থাকতে হবে জানা না থাকায় বসাটা একটু আরামপ্রদ করে নিয়েছিলাম। কাঁটার দুর্গ আগলে থাকায় পিছনদিকে ফেরবার প্রয়োজন ছিল না, তাই দোফালা মজবুত ডালে আরাম করে বসেছিলাম। বন্দুকের নল আর একটা ডালের উপর রেখে বাঘের আগমন আশায় অপেক্ষা করতে লাগলাম।

জঙ্গল নিস্তব্ধ, একটি পাখীর ডাকও শোনা যায় না। বসে বসে পায়ে ঝিনঝিনি ধরে গিয়েছিল। একটু নড়ে বসতে হলো। পাতার আড়ালেই ছিলাম, বাইরে থেকে আমাকে দেখতে হলে খানিকক্ষণ খুঁজতে হয়। কিন্তু আমার সামান্য নড়ায় গাছের তলায় কুটো-ভাঙ্গার শব্দ শুনলাম। যেভাবে বসার ভঙ্গীতে আরাম কায়েমি হয়েছিল তাতে পিছন ফেরা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবু ফিরতে হলো। ফিরে যা দেখলাম তাতে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হলো।

সেই প্রকাণ্ড বাঘ ঠিক আমার গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে। কিভাবে কাঁটাবন পাশ কাটিয়ে নিঃশব্দে এখানে উপস্থিত হলো অনুমান করা শক্ত। বন্দুক ঘুরিয়ে বাঘের দিকে নেবার উপায় নেই, আরাদের প্রণালী মস্ত বড় বাধা হয়ে আছে —আমার চারপাশে ডাল আর পাতা। ইতিমধ্যে বাঘ নীচের ডালে সামনের পা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার পা থেকে বাঘের থাবা মাত্র কয়েক ইঞ্চি তলায়। বাঁচার কোনরূপ উপায় না থাকায় সামনের দিকে বন্দুকের নল রেখেই বাঁট বগলে তুলে নিলাম, তারপরে ঘোড়া টিপে দিলাম। বিকট আওয়াজ করে গুলী বেরিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঘ আমার সামনে লাফিয়ে পড়ল। snap shot-এ rifle-এ বহুদিন হাত পাকিয়েছিলাম। বাঘকে সামনে পেয়ে আর একবার গুলী চালালাম। সামনের জমি থেকে একরাশ ধুলো উড়ে গেল, বাঘও আর এক লাফে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে গেল। দ্বিতীয়-বার গুলী বার হবার পর যে হুঙ্কার ছেড়েছিল তা শুনলে গর্ভিণীর গর্ভপাত হয়ে যায়। বুকের কাছাকাছি লক্ষ্য করেই বন্দুকের ঘোড়া টিপেছিলাম। গুলী চলবার পর বাঘ যেভাবে হুঙ্কার দিয়েছিল তাতে অনুমান করা চলে, নিশানা ফাঁকি দেয়নি, কিন্তু মাটিতে ধুলো ওড়া এবং পুনরায় লাফ মেরে জঙ্গলে ঢুকে যাওয়ায় লক্ষ্যভেদ সম্বন্ধে আত্মশ্লাঘা জীইয়ে রাখা গেল না।

এখন কি করা যায়। দু'বার বন্দুকের আওয়াজের পর লোকদের গাছ থেকে নেমে আসার কথা। বাঘ কিভাবে জখম হয়েছে তাও জানি না। মোটের উপর গুলী লাগল কিনা সে-বিষয়েই বা কেমন করে নিশ্চিত হওয়া যায়। বাঘ যেদিকে লাফ মেরে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে গেল সেই দিকেই লোকেরা গাছের উপর বসতে গিয়েছিল। ভড়কে যাওয়া অথবা জখমি বাঘের সামনে পড়ে গেলে, ফিরতি মানুষদের মধ্যে একজনের চলা চিরকালের জন্য বন্ধ হতে পারে। ওরা নিরস্ত্র অবস্থায় জখমি বাঘের আক্রমণে মারা পড়বে, আর আমি বাঘ জখম করে বন্দুক হাতে গাছের উপর বসে থাকব? ঘটনাটি সম্পূর্ণ উপলব্ধি হলে গাছ থেকে নেমে এলাম জঙ্গলের দিকে ঝোপঝাপ ভাল করে দেখে নিয়ে যেখানে গুলী লেগে মাটির চাপড়া উড়ে গিয়েছিল, পরীক্ষা করলাম—এক-ফোঁটাও রক্তের দাগ নেই।

লক্ষ্যভেদের ব্যর্থতাই আমাকে আশ্বস্ত হবার সুযোগ দিল। বাঘের গায়ে যখন লাগেনি, তখন লোকগুলো সশরীরে ফিরে আসতে পারবে। পরক্ষণেই পুরানো অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিল, high velocity rifle-এর মারে রক্ত

অনেক সময় কয়েক সেকেণ্ড পরে বার হয়। পুরাতন ঘটনা মনে পড়বার পর জঙ্গলের ভিতর ঢুকতে হলো। hair trigger প্রস্তুত রেখে এক-পা দু'পা করে ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিলাম—খোলা জমি থেকে বেশী দূর আসতে হয়নি, দেখলাম কাঁটাঝোপের অনেকটা জায়গায় আছাড়ের পর আছাড় খাওয়ায় থেঁতলে গিয়েছে, মরণ-কামড়ে ছোট বড় শক্ত ডালকে ডাঁটা-চিবানোর মত পিষে দিয়েছে—মাটিতে থোকা থোকা টাটকা রক্ত। গুলী লাগার প্রমাণ ভালই পাওয়া গেল, কিন্তু কোথায় লেগেছে না জানতে পারলে কতটা জখম হয়েছে বুঝি কেমন করে। অনেকে রক্তের রং দেখে বলতে পারে হৃদয় ছেঁদা হয়েছে কিনা। আমার এই জ্ঞানটি ছিল না। রক্ত-ঝরা অনুসরণ করে একলা জঙ্গলের ভিতরে ঢোকবার ভরসাও পাচ্ছিলাম না। অপরদিকে চিৎকার করে লোকদের গাছ থেকে নামতে বারণ করলে, জঙ্গলের প্রতিধ্বনি আমার ভাঙ্গা তামিলকে এমন একটি ভাষা তৈরী করে ছাড়বে যার কোন মানে হয় না। তার উপর বাঘ যদি কাছেই পড়ে থাকে, তা হলে আমার চিৎকার শুনে কোন্দিক এবং কত কাছ থেকে আক্রমণ করবে ঠিক নেই। আতান্তরে পড়ে গেলাম। কি করব ভাবছি এমনি সময় সামনের কাঁটাঝোপ থেকে একটু দূরে গোঙ্গানীর আওয়াজ শুনলাম, অথচ ঝোপ নড়ার কোন ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। গোঙ্গানীর আওয়াজে যথেষ্ট শক্তি ছিল, যা থেকে অনুমান করা চলে উত্থানশক্তিরহিত হলেও কাছে পেলে মানুষের উপরও মরণ-কামড় দিতে ছাড়বে না। বাঘ কোন্দিকে এবং কতটা দূরে আছে ঐটুকু জানতে পারাই আমার পক্ষে যথেষ্ট লাভ। জায়গাটা মনে মনে ঠিক করে ঐদিকে এগোবার জন্য পা বাড়িয়েছি, বাধা এসে উপস্থিত হলো।

সশব্দে চলার আওয়াজ করতে করতে বাঘ আমার দিকে আসছে। পায়ের তলায় শুকনো কুটো ভেঙ্গে যাওয়া বা পাতা মোচড়ানোয় কিছু ভ্রূক্ষেপ নেই। যে জানোয়ার নিঃশব্দে চলে তার এরূপ আচরণ অদ্ভুত লাগল। বেশী এগোতে দেওয়া উচিত হবে না ভেবে শব্দ লক্ষ্য করে বন্দুক তুলে ধরলাম। ট্রিগার টিপতে যাব এমনি সময় মানুষের অনুকরণে কাশির আওয়াজ শুনলাম। দিনের আলোতেই গা ছম্ ছম্ করে উঠল। রক্ষা পেলাম মানুষের কথা শুনে। কে একজন বললে 'চুপ'। দু'জন বোধ হয় পাশাপাশি হাঁটছিল, সুতরাং ওদের হাঁটাকে চতুষ্পদীর চলা ভাবায় অন্যায় করিনি। যাক, একটা প্রকাণ্ড ফাঁড়া কেটে গেল। শব্দ অনুসরণ করে লক্ষ্যভেদের চেষ্টায় সফল হলে ওদের মধ্যে একটা

মরত এবং আদালতে আমার প্রাণ নিয়ে টানা-পোড়েন পড়ে যেতো। বিপদ তখনও সম্পূর্ণ কাটেনি, চেঁচিয়ে বলতে হলো এদিকে আসিস্ না, বাঘ এখনও মরেনি। কথাটা শেষ হওয়ামাত্র লোকগুলো উল্টোদিকে ছুট দিল। একজন বোধ হয় আছাড়ও খেলো। থানায় পরে থাকলেও চমৎকার।

দামী রাইফেলের গুলী খেয়েও বাঘ যদি না মরে তা হলে শিকারীকে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়, কারণ তার ইজ্জতের উপর জুলুম চলতে থাকে। এখন আমি করি কি? জখমি বাঘকে শেষ না করতে পারলে মানুষগুলোকে মৃত্যুর মুখে ফেলে দেওয়া হয়, নিজেরও মুখ দেখাবার উপায় থাকে না। পায়ে হেঁটে বাঘ-শিকারে আসা মানেই সাহসী হিসাবে আত্মবিজ্ঞপ্তির প্রচার। হত্যার শৌখীনতায় বন্দুকের শক্তি-পরীক্ষা।

সব দিক ভেবে ঠিক করলাম, বাঘকে মেরে মড়াকে স্বচক্ষে না দেখলে টিটকারীর পীড়ন সহ্য করতে হয়। দম্ভের শাসন নত হতে দিল না, এগোতে লাগলাম। দিগ্‌ভ্রমের সম্ভাবনা ছিল না, বাঘের গোঙ্গানীই জানিয়ে দিয়েছিল কোথায় সে আছে। বেশী দূর যেতে হলো না। একটি ঝোপের তলায় নরখাদকের পিছন-থেকে খানিকটা পায়ের অংশ দেখতে পেলাম। পেট ও বুক ঝোপের তলায় আড়াল পরেছে। নিশ্বাস প্রশ্বাস চলছে কিনা জানতে হলে আর খানিকটা দেহ দেখা দরকার। কিন্তু কাছে যেতে হলে পুরানো উই-এর ঢিপি মাড়িয়ে যেতে হয়। পায়ের চাপ পড়লে ঢিপির ডগা কিভাবে ধসে যাবে কিছুই ঠিক নেই এবং ধসলে যদি টাল সামলাতে না পারি তা হলে আছাড়ের সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের নল আমার মাথার খুলি পর্যন্ত উড়িয়ে দিতে পারে। খুলি না উড়লেও পুরানো উইএর ঢিপি কেউটে বা গোক্ষুরের এক-একটি কেল্লা। ওখানে অনধিকার-প্রবেশের জন্য ছোবল মেরে আপ্যায়িত করলে জীবনের অবসান সুনিশ্চিত।

চিন্তা করে দেখলাম, এখনও যদি বাঘের আক্রমণ করবার শক্তি থাকে তা হলে শূন্যে গুলী চালিয়ে ওটাকে ঝোপ থেকে বার করে আনা দরকার। চেম্বারে পাঁচটা টোটা ছিল। দুটো খরচ হয়েছে, আর একটা শূন্যে ওড়ালেও আত্মরক্ষার জন্য দুটো থাকবে। যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে যতটা পারলাম পিছিয়ে গিয়ে যেটুকু দেহ দেখা যাচ্ছিল তাই লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপলাম। বারুদ ফাটল, সমস্ত পাহাড় তোলপাড় করে গুলী চলার আওয়াজ জানিয়ে দিল আমার দম্ভের কথা। মরা বাঘকে ডবল করে মারলে সাহসের

দাবী বাড়ে না, তবে নিশ্চিন্ত হওয়া চলে। মানুষের হিংস্র প্রকৃতিকে সুস্থ রাখবার জন্য একটি বুভুক্ষু আহারান্বেষী প্রাণীকে বধ করার আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করিনি। বলাই বৃথা, বন্দুকের শক্তির সাহায্যে আমার সাহস দেখানোর প্রমাণ আজও আমার ঘরে সাজানো আছে। বাঘ মরেও নিষ্কৃতি পায়নি, আজও হয়ত চরিত্রশুদ্ধির কথা শুনছে।

অবিশ্বাস্য

কোয়াম্বোটরে যখন এসে পৌঁছলাম, তখন বেলা চারটের কাছাকাছি। বন্ধু তাঁর কারবারের লরী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ঘণ্টাখানেকের ভিতর কারখানায় এসে উপস্থিত হলাম।

জঙ্গলে যাবার জন্য গরুর গাড়ী ঠিক করা ছিল। হাতে কিছু শুকনো খাদ্য দিয়ে বন্ধু বললেন, "মা দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়, এখন তোমার সঙ্গে ঘরোয়া কথা বলতে যাওয়া বিড়ম্বনা। যেতেও হবে অনেকটা পথ, আলো থাকতে সব বন্দোবস্ত হয়ে যাওয়া ভাল। একটু সাবধানে চ'লো বাপু, মানুষখেকো বাঘ কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে আছে। বাঘিনীর চরিত্র তেমন সুবিধার নয়, আব্রু মানে না। দিনের বেলাতেই খোলা জায়গায় লোকজনের সামনে বেরিয়ে আসে। 'Shoot to kill কথাটা মনে রেখো।"

ভদ্রাচার সম্বন্ধে বন্ধুর উদারতায় বাধিত হলাম। বাস্তবিকই সংসারের যাবতীয় জীবের কুশল জিজ্ঞাসা করবার মত আমার মনের অবস্থা ছিল না।

ব্যস্ততার তাড়ায় গাড়ীতে উঠে বসলাম। কোনদিকে না তাকিয়ে গাড়োয়ানকে বললাম, চালাও।

পাকা রাস্তা ছাড়িয়ে গ্রামের আঁকাবাঁকা মেঠো পথ ধরে চলেছি। ঘণ্টাখানেক ধরে চাকা চলেছে, যাবতীয় হেঁচকা সহ্য করে গন্তব্য স্থানের অপেক্ষায় বসে আছি। শেষ পর্যন্ত গাড়ী জঙ্গলের দিকে ফিরল। গাড়োয়ান চারদিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, "এখানেই দুটো মানুষকে নিয়েছিল।" সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত অর্থপূর্ণ মনে হলো। রাইফেলে টোটা ভরে নিলাম। হাই ভেলসিটি (high velocity) ভরা-বন্দুক হাতে আসতে একটু হামবড়া ভাব এসে গিয়েছিল। বাঘমারি সম্বন্ধে আমি একটি নাম-করা ব্যক্তি, সুতরাং মনের এরূপ পরিবর্তন দূষণীয় ভাবা উচিত নয়।

এক কদম, দু' কদম করে গাড়ী খাড়াইয়ের দিকে উঠছে, গতি অতি মন্থর অনেকটা পথ এসে পড়েছি, অথচ মাচান বাঁধার লোকদের দেখা নেই। জঙ্গল এদিকে ক্রমান্বয়ে গভীর হয়ে আসছে। ঝিঁঝিঁপোকার ডাক সেই যে শুরু হয়েছে তার থামবার নামটি নেই। মাইলের পর মাইল একনাগাড়ে ঐ

ডাক স্বকর্ণে না শুনলে বোঝবার উপায় নেই, যেন মনে হয় বিপদ সর্বত্র ওৎ পেতে আছে।

জঙ্গলের রাস্তা Rolls Royce চলাব জন্য প্রস্তুত হয়নি, সুতরাং লেভেল সম্বন্ধে কোন অভিযোগ উঠতে পারে না। মাথা উঁচু করা মুঁড়ির ঠোক্করে চাকার উত্থান ও পতন সমভাবে চলেছে। লোহা এবং পাথরের সংঘর্ষণে পাহাড়ের গায়ে যে শব্দের প্রতিধ্বনি উঠছিল তা আধুনিক ধর্মান্ধ শহুরে লোক বোমা-ফাটা ভাবলে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই। হাওয়া অনুকূল হলে জঙ্গলে ঐ ঠোক্করের আওয়াজ মাইলখানেক দূর থেকে শোনা যায়।

রাস্তার বাঁদিকে চাকাব হাতখানেক পাশেই গভীর খাদ। নীচে খানিকটা সমতল জমি দেখা যায়। সমতল জমির প্রান্তে ঘন ঝোপ। আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো ঝোপের দিকে।

ডগা নড়ছে এবং পিছন থেকে আমাদের গাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছে। গাড়ী ও ঝোপের মাঝখানে যে ব্যবধান তা কতকটা নিরাপদ বলা চলে। ঝোপের তলায় যে জানোয়ারই থাক্, জখম হয়ে তেড়ে এলেও আর একবাব গুলী চালানোর অসুবিধে ছিল না। নিশানার অহমিকা ও দিনের আলোর যোগ ঘটায় একটা নল খালি করবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলাম, আন্দাজেই গুলী চালাব ঠিক করে ফেললাম। উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম, বন্ধুর উপদেশ চাপা পড়ে গেল। বাঘের শিকারে এসে জঙ্গলে ঘাবড়ে দেওয়া যে কতটা বোকামি তা আমি জানতাম; তথাপি ছেলেমানুষী কেন আমাকে পেয়ে বসল বলতে পারি না।

গাড়ীর হেচকার সঙ্গে নিশানা করা চলে না। আদেশ অনুসারে গাড়োয়ান গাড়ী থেকে নেমে বলদ দুটোর সামনে দাঁড়াল। বন্দুক তুলে ট্রিগার টিপতে যাব, হঠাৎ বলদের ঝটকায় নিশানা নড়ে গেল। ফিরে দেখি, বাঁদিকের বলদ রুখে দাঁড়িয়েছে। চাকা একেবারে খাদের কিনারায়, গাড়োয়ান কিনারার বলদটাকে রাস্তার মাঝখানে আনবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে।

গতিক সুবিধার নয়। ভরা রাইফেল নিয়েই রাস্তায় লাফিয়ে পড়লাম। চাকা ডিঙিয়ে আসতে হয়েছিল, টাল সামলাতে না পারায় বন্দুকের ডগাটা মাটিতে গেল ঠুকে। মাছি front sight স্থানভ্রষ্ট হলো কি না কে জানে। পরীক্ষায় দমে যাবার মত কিছু পেলাম না বটে, কিন্তু ready ট্রিগারের উপর আঙুলের চাপ দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম—কি সর্বনাশ, ভরা বন্দুকের নল গাড়োয়ানের দিকে! ট্রিগার পড়লেই মানুষ-খুনের দায়ে জড়িয়ে যেতাম।

আঙুল সরাতে গিয়ে দেখি, কল ঠিক চলেছে, তবে টোটা ফাটেনি। বন্দুক খুলে টোটা বার করে আনলাম। যা সন্দেহ করেছিলাম তাই ঘটেছে, শিকারের গোড়াতেই গলদ বাধিয়ে বসেছি। তাড়াহুড়োয় নতুন কার্তুজ ফেলে পুরাতনগুলি নিয়ে এসেছি।

ইতিমধ্যে আর একটি বিপদ এসে উপস্থিত। নিশানার লক্ষ্যস্থল থেকে দুটি বাঘের বাচ্চা, বেশী বড় নয়, বেরিয়ে এসে খোলা জায়গাটায় হাজির। হাওয়া ঐদিক থেকেই বইছিল, ডানদিকের বলদ সন্দিগ্ধ হয়ে বাঁদিকে ফিরতেই খাদ্য-খাদকের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়ে গেল। পরিচয়ের পালা যে দৃশ্যের সৃষ্টি করলে, তা slow motion cine cameraর ছবি ছাড়া বোঝবার উপায় নেই। ডান দিকের বলদ যোৎ ছিঁড়ে সোজা সামনে ছুট দিল। সঙ্গে সঙ্গে একবগ্গা গাড়ী বলদ-সহ উল্টে বাঁদিকের গভীর খাদে গড়াতে লাগল।

বাঘের বাচ্চা এরূপ শিকারকালীন ঘটনা বোধ হয় কখনও দেখেনি! বলদ-সহ ওলট-পালট খাওয়া গাড়ী তাদেরই দিকে তেড়ে চলেছে দেখে তারা ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ল। এই সময় ঝোপের ভিতর থেকে যে গর্জন শুনলাম তাতে অতিবড় সাহসীকেও একবার ইষ্টদেবতা স্মরণ করে নিতে হয়। আমাদের ভাগ্য ভাল, বড় বাঘ বেরিয়ে এল না।

গাড়ী গড়াতে গড়াতে একটি গাছের গুঁড়িতে আটকে গেল—বলদ চাল-খসা কুমড়োর মত তখন গড়িয়ে চলেছে। মাধ্যাকর্ষণের টান শেষ পর্যন্ত তাকে সমতল জমির উপর নিয়ে এসে ছাড়ল। জন্তুটার হাড়-গোড় ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল, উঠে দাঁড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই পারল না।

গাড়োয়ান এই সময় সামনের গাছ থেকে একটা ডাল ভেঙে নিয়ে নীচে নামতে লাগল। বাঘের মুখে এগোবার সময় আমাকে কাতরভাবে অনুরোধ করল বন্দুক প্রস্তুত রেখে পিছু নিতে। ব্যাপারটা দাঁড়াল অন্ধকে দৃষ্টি রাখার অনুরোধের মত।

টোটাহীন বন্দুক নিয়ে তাড়া-খাওয়া বাঘের সামনে যাবার সাহস আমার ছিল না। আমি উপরেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

ভাঙা ডাল ঘোরাতে ঘোরাতে গাড়োয়ান বলদটার নিকট গিয়ে উপস্থিত হলো। তারপর পিঠ-চাপড়ানি, আদর, তিরস্কার, পদাঘাত সবকিছুই চলল, কিন্তু বলদ আর উঠে দাঁড়াল না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে গাড়োয়ান উপরে উঠে আসতে লাগল। দু'চার পা উপরে উঠে পিছন ফিরে তাকায়, আবার সামনে অগ্রসর হয়—এইভাবে রাস্তায় এসে উপস্থিত হলো।

দৃষ্টি তার করুণাপ্রার্থী নয় বরং ভ্রূকুঞ্চিত। আমার প্রতি কেমন একটা অবজ্ঞার আভাস পাচ্ছিলাম। খুবই স্বাভাবিক প্রথম, কারণ আমার সাহসের পরিচয়; দ্বিতীয়, বলদটার দুরবস্থার জন্য আমিই দায়ী। সামান্য বকশিসের লোভে বেচারাকে বিরাট মূলধন হারাতে হলো।

অত বড় ক্ষতির কারণ হয়ে সান্ত্বনা দেবার সাহস ছিল না। গাড়োয়ান নিকটে আসতে বললাম, আমার টোটা নেই, শিকার হবে না গ্রামে ফিরে চল। গাড়োয়ান আমার বন্দুকের দিকে তাকিয়ে হাসল। হাসির পিছনে শ্লেষ মারমুখী হয়ে উঠেছিল। সে জানালে, গ্রামে ফেরবার আগেই অন্ধকার হয়ে যাবে। আরও কিছু বলবার ছিল, কিন্তু চেপে গেল। অব্যক্ত যা রইল তা অনুমান করে নিতে অসুবিধা হলো না। লোকটা অধিক বাক্যব্যয় না করে সামনে এগোতে লাগল। মহাজনের পন্থা অনুসরণ করা ছাড়া উপায় ছিল না।

মোড়ের পর মোড় ঘুরে চলেছি। কোথায় চলেছি, আর কতটা যেতে হবে, জানবার তাগিদ এলেও মনের কথা প্রকাশ করতে পারছিলাম না। গাড়োয়ানের চলার ভঙ্গী দেখে বুঝেছিলাম এ তল্লাটে ওকে থামিয়ে কথা বলা যাবে না।

গভীর খাদ অনেকক্ষণ পিছনে ফেলে এসেছি। আর খানিকটা এগোতে সামনে খোলা জমি পাওয়া গেল। রাস্তার উপরেই সদ্য কাটা ডালপালা পড়ে রয়েছে।

এতক্ষণে গাড়োয়ানের মুখ ফুটল। সে জানালে, কাছেই মাচান আছে—লোকজনদের ডাকলেই মাচান পাওয়া যাবে। আশ্বাসবাণীতে মারাত্মক হাসি শমা করে ফেললাম। বার তিন-চার সিটি মারতেও কোন উত্তর না পেয়ে আমাকে অনুসরণ করতে বললে। একটু ঘোরাঘুরি করতেই মাচান খুঁজে পাওয়া গেল। লোকটার গা ঘেঁষেই প্রায় অনুসরণ করেছিলাম।

মাচানের কাছে এসে দেখি, গাছের গুঁড়ির চারধারে বিষাক্ত কাঁটাবন। ঐ কাঁটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় একবার সেপ্টিক হয়ে মরতে বসেছিলাম। ঠিক মাচানের নীচেই উই-এর ঢিপি, আশঙ্কাপূর্ণ গহ্বর গায়ে জড়িয়ে আছে। গহ্বরগুলোকে আমি যমের মত ভয় পাই। কতবার যে ঢিপির কাছে বিভীষিকা দেখেছি বলতে পারি না। ঘটনাগুলি চলচ্ছবির মত চোখের সামনে উপস্থিত হওয়ায় গাড়োয়ানকে আগে উঠতে বললাম। কথায় বলে, 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'— তলায় যদি কিছু থাকে তো গাড়োয়ানকেই আগে নেবে।

গাছে ওঠার আদেশ এমন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পালিত হলো যে, কিভাবে উপরে উঠে গেল দেখবার অবকাশ পর্যন্ত পেলাম না। ওদিকটা নজর রাখতে পারলে অন্ততঃ কোন্ কোন্ ডালে পা দিয়ে উপরে গেল হিসাব রাখতে পারতাম, ওঠা সহজ হয়ে যেতো। হিসাব না রাখলেও ওঠবার তাড়া কম ছিল না, চোখ-কান বুজে কোনপ্রকারে মাচানে এসে পৌছলাম। রাইফেলের বোঝা নামাতে নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেলাম। মাচান অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বসবার জায়গায় একটিমাত্র এড়ো ডাল, অত্যন্ত সাবধানে না বসলে হঠাৎ নীচে পড়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। গাড়োয়ানের পাশে এবং আমার পিছনটায় আড়াল দেবার চেষ্টা হয়েছিল মাত্র। সামনে এবং আমার পাশে একেবারে খোলা।

শিকার যখন নেই, তখন কথা বলায় বাধা ছিল না। অসমাপ্ত মাচান, কৌতূহল দমন করা সম্ভব হলো না। জিজ্ঞাসা করলাম, "লোকগুলো গেল কোথায়" – লোকেদের অনুপস্থিতি সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছিলাম।

উত্তরে গাড়োয়ান আচ্ছা করে চিমটি কেটে ইশারায় কথা না বলতে বারণ করল। ছোটলোক সুবিধে পেয়ে মনের সাধে নখ বসিয়ে দিয়েছিল। বিরক্তির উচ্ছ্বাস সরল ও সঙ্গত হলেও আমার দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল, অকস্মাৎ কোন একটা দুর্ঘটনার জন্যই সব পালিয়েছে। অধিকতর অশোভনীয় ব্যবহার সুনিশ্চিত জানতাম, তথাপি মহাজনের আদেশ অমান্য করে জিজ্ঞাসা করতে হলো, "কথা বলতে বারণ করছ কেন বাঘ কাছে থাকলে তো মানুষের গলা শুনে পালাবে।"

গাড়োয়ান কানের কাছে এসে, ত্বক্ ও জিহ্বার শোষণশব্দের সঙ্গে চুপি চুপি জানালে, এ মহল্লার বাঘ পালায় না, আরো কাছে আসে, দুষ্ট মানুষ বাছাই করে শিকার ধরে। প্রশ্নোত্তরে আমার উপর বিশেষ ইঙ্গিত ছিল। নিরুপায় হয়ে কৌতূহল সংযত করলাম।

ঠিক এই সময় ওজন-করা সন্ত্রস্ত পদক্ষেপ শোনা গেল। আগন্তুক পরিচিত, বাঘ কাছে এসে গিয়েছে। একটু পরেই হাড় ভাঙা আর মাংস ছেঁড়ার আওয়াজ আসতে লাগল। যেটুকু আড়াল ছিল, তারই আশ্রয় নিয়ে গাড়োয়ানের গা টিপলাম। সে একই প্রথায় জানাল, নীচে যা ঘটছে তা সে জানে।

নরভুক্ বাঘের নানা চরিত্রের ব্যাখ্যা শুনেছি। যে এসেছে, তার চরিত্র যদি বিগড়িয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে··· বেশী আর ভাবতে হলো না, আশঙ্কা বাস্তব হয়ে উঠল। পরক্ষণেই একাধিক জানোয়ার মাচানের তলায় এসে উপস্থিত।

ঠিক আমাদের তলায় ডাল দারুণভাবে দুলতে লাগল। বাঘ মাচানের উপরে আসবার চেষ্টা চালিয়েছে—বার-দুই ঝাঁকানিতে ডাল ভেঙে গেল, তার সঙ্গে ভারী ওজনের শরীর উই-এর টিপির উপর আছাড় খেলো। পরমুহূর্তে সাপের ছোবল পড়তে লাগল একটার পর একটা।

নখী ও বিষধরের বোঝাপড়ার শেষ নিষ্পত্তি কোথায় দাঁড়াবে জানবার সুবিধা না থাকলেও, তখনকার মত মাচানের মরণদোলা থেকে নিষ্কৃতি পেলাম।

অন্ধকার ইতিমধ্যে ঘনঘটা করে আমাদের ঘিরে ফেলেছে। ঝিঁঝিঁপোকার ডাক বন্ধ, জঙ্গল নিস্তব্ধ। একটু নিশ্চিন্ত ভাব আসছিল, কিন্তু ধাতে সইল না। মাচানের উপরে ঠিক আমার পিছনদিককার পাতা-নড়া শুরু হয়ে গেল। সন্দেহ পিছু নিয়েই ছিল, তবু মনকে স্তোক দিলাম, টিকটিকি বা গিরগিটি হবে।

নড়া ক্রমান্বয়ে আমার জানুর পাশে এসে উপস্থিত। সাংঘাতিক অনুভূতি—সাপ চলেছে গা ঘেঁষে কাঁধের উপর দিয়ে।

কপাল দিয়ে কাল-ঘাম ছুটতে লাগল, কাঠ হয়ে বসে রইলাম। সরীসৃপ এগিয়ে চলল গাড়োয়ানের দিকে। পাতার আড়াল পেতেই থেমে গেল। লোকটার দুর্ভাগ্য, এই সময়টিতে তার নড়ে বসার দরকার হলো। কোথায় হাত রেখেছিল কে জানে, হঠাৎ উঃ করে উঠল, বললে বিছে কামড়েছে। কাতর-ধ্বনিতে আমার রক্ত হিম হয়ে আসতে লাগল। কানের কাছে মৃত্যু ডাক দিয়ে চলেছে। কতকটা হতভম্বের মত হয়ে গিয়েছি।

মিনিট পনের পরেই সাড়ম্বরে বিষের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। যমে আর মানুষে ঘণ্টাখানেক পরে ধ্বস্তাধ্বস্তির পর গাড়োয়ান নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত লোকটা মরল। আমি মড়া আগলে মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে রইলাম।

পাখী মারতে বাঘের দেখা

সেদিন আমরা পাখী শিকারে বার হয়েছিলাম। বাবুদের জলা থেকে ফিরতে দেরী হয়ে গেল, সেজন্য ট্রেন ফেল করলুম। কাণ্ডটা ঘটল চালবাজ জিতেনের জন্যে। বন্দুক চালিয়ে চালিয়ে তার আর আশ মেটে না। খুব কম হলেও নতুন কেনা দো-নলা বন্দুকটা ১৯/২০ বার চালিয়েছে—স্নাইপের (snipes) পিছনে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের প্রায় ক্রোশ তিনেক হাঁটিয়েছিল। পচ্‌পচে কাদার উপর দিয়ে হাঁটা চারটিখানি কথা? যেবারই বন্দুক চালায় সেবারই বলে ঐ যে ঐখানটায় মরেছে। আমরা কোমর পর্যন্ত কাপড় তুলে, জুতো হাতে পাঁকভর্তি জল কেটে সেখানে গিয়ে দেখি, মরেছে না ছাই, কোথাও কিছু নেই। কিছু নেই বললে বলে—স্নাইপ কিনা, জলের ভিতর ঢুকে গেছে, দাঁড়িয়ে থাকো, একটু বাদেই ভেসে উঠবে। দাঁড়িয়ে থাকি, এমন সময় আবার গুড়ুম করে আওয়াজ করে সঙ্গে সঙ্গে বলে এদিকে তাড়াতাড়ি এসো, একসঙ্গে দুটো পড়েছে, আবার কাদা-জল ঘেঁটে দেখিয়ে দেয়। জায়গাটার কাছে যাই—ঠিক আগের মত ব্যাপার, কোথাও কিছু নেই—এইরকম করে বন্দুক দিয়ে মারা স্নাইপ দেখানোর লোভে আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কি ভোগান্তিটাই না ভোগাল, শেষ পর্যন্ত ট্রেন ফেল করিয়ে ছাড়ল।

ট্রেন ফেল করায় আকাশ-পাতাল ভাবছি, এমন সময় চক্কোত্তিমশাইএর গোমস্তা স্টেশনে বেড়াতে এলেন। পাড়াগাঁয়ে কলকাতার মত তো পার্কের ছড়াছড়ি নেই, তাই এখানকার শৌখীন ও সমর্থ ভদ্রলোকরা স্টেশনের প্লাটফরমে হাওয়া খেতে আসেন। কলকাতায় ফেরবার একটিমাত্র গাড়ী, সেই ট্রেন চলে গেছে—আর আমরা দাঁড়িয়ে আছি দেখে গোমস্তাবাবু কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। যা ঘটেছিল বললুম—তিনি শুনেই বললেন, আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি কর্তাবাবুকে গিয়ে বলছি—দেখি রাত্রিতে এখানে থাকার কি ব্যবস্থা হয়। কর্তাবাবু হলেন চক্কোত্তিমশাই, আজ সকালে ওনার ওখানেই মাছ ধরে পিকনিক করা হয়েছিল।

যাক, গোমস্তাবাবু সেই যে গেলেন আর ফেরবার নামটি নেই। এদিকে অন্ধকার হয়ে আসতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ বাদে স্টেশনের ল্যাম্প-পোষ্টে

যে কয়টা আলো জ্বলছিল সেগুলোও দিলে নিবিয়ে। এ স্টেশনের নাকি এই রকমই নিয়ম, গাড়ী না এলে ল্যাম্পপোষ্টে আলো জ্বলে না। আলো নিবোতেই চারধার ঘুরঘুট্টি অন্ধকার হয়ে গেল। জিতেন একটা গুবরে শালিক, একটা ঘুঘু আর একটা স্নাইপ মেরে বন্দুক হাতে এমনই করে দাঁড়িয়েছিল যেন একটা মস্ত শিকারী। স্নাইপ আর ঘুঘু নিয়ে বাড়ি ঢুকলে, আমরা জানি ওর পিসীমা ওর কি অবস্থা করবেন। আলো নিবোনোর পর স্টেশন-মাস্টারবাবুও দরজা বন্ধ করে নিজের বাড়ির দিকে চললেন। প্লাটফরমে রইলাম আমরা আর লাইনস্‌ম্যান।

লাইনস্‌ম্যান গুমটির আলো ঠিক করে আমাদের কাছে এসে একটু কিন্তু হয়েই বলল, বাবু গো, আজ আলো দুটো জ্বালতি ভাবি হয়ে গেছে, একটুকুন যদি আমার সাথে আসেন, ঐখানটায় লাল বাতিটা লাগিয়ে আসি।

চাষার মত লোকের কি স্পর্ধা দেখো না—আমরা হলুম ভদ্রলোকের ছেলে—বলে কি না ওনার সঙ্গে আলো ঠিক করবার জন্যে সঙ্গে যেতে হবে। আব্দার শুনে আমি তো প্রায় চটেই উঠেছিলাম। জিতেন চালবাজ হলেও ওর মনটা ভালো। সে এগিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কেন ভয় করে? লোকটা কাঁচুমাচু হয়ে বললে, হ্যাঁ বাবু, অন্ধকারে ফিরতি হবেক কিনা, পোকা-মাকড় আছে তা'ছাড়া ···

'তা'ছাড়া' বলতে আমারও খটকা লেগে গেল—জিজ্ঞাসা করলুম, তা'ছাড়া কি? সে হ্যাঁ-না কিছু না বলে আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকলে। ঐরকম করে ডাকায় আমাদের বীরপুরুষ জিতেন এসে বলল, চলো হাতে বন্দুক আছে, ভয় কিসের? যেরকম ভাবে জিতেন বুক ফুলিয়ে সামনে এগিয়ে গেল তাতে আমাদেরও যেতে হলো। সিগন্যাল পোস্ট স্টেশন থেকে কাছেই, সেখানে যেতে দেখলাম পোস্টের পাশেই একটা প্রকাণ্ড গরু মরে পড়ে রয়েছে। তার পিছনদিকটা নেই, কিসে খেয়ে ফেলেছে। লাইনস্‌ম্যান কাছে এসে বললে, বাবু গো—ওটাকে বড় বাঘে কাল মেরেছে, গুজব শুনতেছি বাঘটা নাকি মানুষ-খেকো। তারপর মিনতি করে বলল, বাবু গো, আপনারা জোরে কথা বলতি থাকেন, আমি ঝট করে লাল বাতিটি লাগিয়ে আসি।

আমরা সকলেই হতভম্ভ হয়ে গিয়েছিলুম। সঙ্গে বন্দুক থাকলে কি হবে? জিতেনের টিপ তো। কিছু তাড়া করে এলে তাকে মারতে গিয়ে হয়ত আমাদের কাউকে শেষ করে ফেলবে। লাইনস্‌ম্যান সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল,

আর আমরা তার ইচ্ছেমত গলা করে কথা বলতে লাগলুম—আমরা সকলেই ভয় পেয়েছিলুম, না করে উপায় ছিল কি? আমাদের বড় শিকারী বাঘের কথা শুনে একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছে—বন্দুক হাতে থাকলেও ভয় তারই বেশী দেখলুম।

লোকটা নেমে আসতে বললুম, চক্কোত্তিমশাইএর নায়েববাবু না আসা পর্যন্ত আমাদের ছেড়ে যেয়ো না। সে খুশী হয়েই বলল, আমি তো স্টেশন-মাস্টারবাবুর বাড়িতেই থাকি, আপনারা যাবার আগে ঐটুকু পথ এগিয়ে দে যাবেন। মাস্টারবাবুর বাড়ি কাছে হলেও পথটায় সন্ধ্যের পর মনিষ্যি চলে না। তা'ছাড়া গরুটারে আজ সকালে মারছে কিনা--চারধার দেখে লোয়ে যাতি হবে। আমরা তখন প্ল্যাটফরমে এসে উঠেছি। তখনো নায়েববাবুর দেখা নেই, বুঝলাম তিনি আর ফিরছেন না—বাঘের খবর উনিও শুনে থাকবেন বোধ হয়।

এদিকে রাত্তির হয়ে গিয়েছে - গ্রামের রাত্তির কি ভয়ঙ্কর! এরই মধ্যে সব নিঝুম মেরে গেছে। সামনের গাছগুলোর ডগা ছাড়া নীচের দিকে কিছু দেখা যায় না। অন্ধকারের মধ্যে লাখে লাখে জোনাকীর ভিড়, তার সঙ্গে ব্যাঙএর ডাক -হঠাৎ এই সময় অনেক দূরে কি একটা জন্তুর গলা শুনলুম। বিশ্রী আওয়াজ, গা ছম্‌ছম্ করে ওঠে, কতকটা দেশী কুকুরের কান্নার মত, তবে খুব সরু আর টানটাও বেজায় লম্বা। লাইনস্‌ম্যান কান পেতে শুনেই বললে—এই রে—বাবু, ওটা ফেউএর ডাক, বাঘ আসতিছে, আপনারা জোরে কথা বলতি থাকুন আহা বেচারা ডাকহরকরার কপালে কি আছে ভগবান্ জানে।

বাঘ আসছে শুনে আমার রক্ত হিম হয়ে আসছিল। হয়ত আমরা সকলেই খানিকক্ষণ চুপ করে গিয়েছিলাম, এমন সময় দূরে ঝুন্ ঝুন্ করে ঘুঙ্গুর বাজার শব্দ শুনলাম—শব্দটা ক্রমে কাছে আসতে লাগল যেন একটা মানুষ এক পায়ে ঘুঙ্গুর বেঁধে নাচতে নাচতে আসছে।

লাইনস্‌ম্যান বললে, যাক গিয়ে, ডাকহরকরা এ-যাত্রা রক্ষা পাইলো। আমরাও নিশ্চিন্ত হচ্ছিলুম দলে একটা লোক বাড়ল বলে—কিন্তু শব্দটা প্রায় আমাদের প্লাটফরমের কাছে এসে হঠাৎ থেমে গেল। শব্দ থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লাইনস্‌ম্যান চেঁচিয়ে উঠল, বাবু ওকে লিয়েছে—বাঘে লিয়েছে—চেঁচান, চেঁচান। সে তখন অস্থির হয়ে উঠেছে, তাড়াতাড়ি গুম্‌টিঘরের আলোটা নিয়ে এসে আবার বললে, বাবুরা চেঁচান চেঁচান, আর কথা বলবার সময় লেই গো বাবু, চেঁচাও।

লাইনস্‌ম্যানের কথা শুনে আমাদের সকলের গলা শুকিয়ে গিয়েছে—চেঁচাবো কেমন করে? অত কাছে খোলা বাঘ, তায় আবার মানুষ-খেকো। মুখ দিয়ে কথা বেরোয়? আমরা চুপ করে আছি দেখে সে একলাই চিৎকার করে ডাকল—ওরে পাঁচু, কি হলোরে তোর, চোলে আয়, চোলে আয়, ডর নাই, আমরা হেথায় অনেক মনিষ্যি আছি, ভয় নাই, আয় আয়। লাইনস্‌ম্যানের গলায় সাহস পেলুম, সকলেই চেঁচিয়ে উঠলুম—ভয় নেই, আমরা এখানে আছি। নিঝুম রাতে আমাদের গলা বোধ হয় গ্রাম ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিল—কিন্তু পাঁচুর সাড়া পাওয়া গেল না। তখন লাইনস্‌ম্যান জোর দিয়ে বললে, কি সব মনিষ্যি আপনারা, একটা মানুষকে বাঘে ধরেছে আর আপনারা বন্দুক হাতে মজা দেখতিছেন—আসেন আমার সাথে, আর চাঁচাতে থাকেন। এতটা বলে সে আমার জামা ধরে টান মারলে। বন্দুকের কথা উঠতেই জিতেন সেটা তাড়াতাড়ি আমার হাতে দিয়ে দিলে এবং আমাদের সকলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। এক-পা নড়বার সাহস নেই, তবু একটা সামান্য চাষার মত লোকের সামনে ভয় পেয়েছি জানতে দিতে লজ্জা লাগল---আমি তার পিছু নিয়েছি দেখে সকলেই আমার সঙ্গে গিয়ে দল ভারী করল। লাইনস্‌ম্যান সামনে চলেছে আলো নিয়ে। মাঝে মাঝে লণ্ঠনটা তুলে ধরে ঝোপগুলো দেখে নিচ্ছিল। এইভাবে খানিকটা আসবার পর সে আবার লণ্ঠন তুলে ধরতেই দেখলুম ৩০।৪০ হাত দূরে, রাস্তার ওপারে ঝোপের সামনে এক প্রকাণ্ড বাঘ, কান খাড়া করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সে কি ভয়ঙ্কর চেহারা! যেন সাক্ষাৎ যম, চোখ দুটোতে আলো পড়ায় ধক্ ধক্ করে ছোট ইলেকট্রিক টর্চের মত জ্বলছে। ঠিক এই সময় মনে হলো কে ছুটে প্লাটফরমের দিকে পালাল। বাঘ দেখেই লাইনস্‌ম্যান ভয়ানক চিৎকার করে উঠল। প্রথমে কি কথা বলেছিল বুঝতে পারিনি, তারপর সামনের দিকে মুখ রেখেই বলতে লাগল, হেই বাবুরা চেঁচাও গো, বাবুরা চেঁচাও।

আশ্চর্যের বিষয়---লাইনস্‌ম্যানের চিৎকার আর একসঙ্গে অনেকগুলো লোক দেখে বাঘ সত্যি অন্ধকারের দিকে লাফ মারল। যখন সে লাফ মারল তখন মনে হলো নতুন খড়ে ছাওয়া চালাঘরের একটা ছোট ছাউনি শূন্যে উড়ে গেল। লাইনস্‌ম্যান যখন বুঝল বাঘ চলে গেছে তখন বললে---বাবুরা আগোয় আসেন, দেখি পাঁচুর কি দশাটা হলো। আমি নড়ব কি, মনে হচ্ছে পা দুটোকে কে শিকল দিয়ে মাটির সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে। যেদিকে বাঘটা পালাল সেইদিকে মুখ করে যতই সামনে এগোতে চেষ্টা করছি ততই মেটে রাস্তার উঁচু-নীচু ঢিবিতে

ঠোকর খাচ্ছি। তবু কোনগতিকে সকলে ওর পিছনে পিছনে চলতে লাগলুম---যদি না যাই তো দলের লোক একজন কমে যাবে। তা'ছাড়া ওর সাহসটাই তো পাঁচজন লোকের সমান। বেশী দূর যেতে হলো না---খানিকটা আসবার পরই দেখলাম একটা মানুষ উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে—পাশেই ঘুঙুর লাগানো একটা বল্লম, আর মেল-ব্যাগ। মাথার বাঁদিককার চামড়া চুলসুদ্ধ নেমে এসেছে কাঁধের উপর---মুখের কাছে খানিকটা জায়গা রক্তে ভেসে গেছে। লাইনস্‌ম্যান মেল-ব্যাগটা কাঁধে ফেলে আমাদের হুকুম করার মত করে বললে, বাবুরা, আপনারা একটুকু যদি চেঁচাইতেন তা হইলে এমনটি ঘটটি পেতো না। এখন ওকে তোলেন—স্টেশন-মাস্টারবাবুর কাছে দাওয়াই নিয়ে লাগাই।

লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। সকলে মিলে তুলতে গিয়ে দেখি জিতেন নেই। তখন একজন লোকের দৌড়ে পালাবার কথা মনে পড়ল। বুঝলাম জিতেন পালাতে গিয়ে বাঘের মুখে পড়েছে। জিতু জিতু করে সকলেই ডাকলুম, সাড়া নেই। আর কোন সন্দেহ থাকল না। রামু জিতুর ছোট ভাই, সে প্রায় কেঁদে ফেলে বললে—দাদা কোথায় গেল, একটু খোঁজো না। রামুর কান্নার আওয়াজ শুনে লাইনস্‌ম্যান খেঁকিয়ে উঠল, বললে—দাদা আবার যাবেন কোথায়? কোন গাছে উঠি বসেছেন; দ্যাখেন বাঘ ভড়কে পালালে আর ফিরে আসতি শোনা যায় না—এখন বাবুরা কাঁধ লাগান, লোকটা মরলো কি বাঁচলো দেখি।

তিন জনে কোনগতিকে পাচুকে কাঁধে তুলে স্টেশন-মাস্টারের বাড়িতে গিয়ে ফেললুম। স্টেশন-মাস্টারবাবু হন্তদন্ত হয়ে দরমা খুলে দিয়ে পাঁচুকে দেখে বললেন, ইস্ একি কাণ্ড! লাইনস্‌ম্যানের কাছে সব শুনে ফেনাইল আর টিংচার আইডিন কাটা জায়গায় লাগিয়ে দিলেন। তারপর আমাদের রাত্রি কাটাবার জন্যে রোয়াকে মাদুর শতরঞ্চি দিয়ে ব্যবস্থা করলেন।

সারাটা রাত লাইনস্‌ম্যান পাঁচুর সেবা করল—জ্ঞান হারালেও যন্ত্রণায় বেচারা কিভাবেই না ছটফট করছিল। স্টেশন-মাস্টারবাবুও একটা চেয়ার টেনে বসেছিলেন। আমাদেরও কি ঘুম হয়েছিল ছাই! খোলা বারান্দা, সামনেই অন্ধকার আর গাছপালা। সব সময়েই আতঙ্কে ভাবছি, ঐ বুঝি এলো।

রাত কেটে গেল। কাকের ডাকে উঠে বসে দেখি, স্টেশন-মাস্টারবাবু চেয়ারেই ঝিমুচ্ছেন। লাইনস্‌ম্যান মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে, আর ডাক-হরকরা মড়ার মত অসাড় হয়ে পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখি লোকটা এক-

দৃষ্টিতে উপরদিকে তাকিয়ে আছে—চোখের পলক পড়ে না, চোখ দুটো প্রায় কোঠর থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমি স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে লাইন্‌স্‌-ম্যান বললে আর দ্যাখছেন কি বাবু, ভোরের দিকে মারা পড়েছে, দ্যাখছেন না, মাথার ঘিলুটা বেরিয়ে গ্যাছে।

মরা মানুষ আমি কখন দেখিনি, ভোরের আলোতেও কেমন ভয় করতে লাগল। স্টেশন-মাস্টারবাবু এর মধ্যে উঠে বসেছেন, তিনি ডাকহরকরার দিকে তাকিয়ে কাছে গেলেন, হাত-পা ছুঁয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কখন গেল?

ভোরের দিকে, বলে সে চোখ মুছল। স্টেশন-মাস্টারবাবু, সেখানে আর বসলেন না, দারোগাবাবুকে খবর দিতে বলে আমাদের থাকতে অনুরোধ করলেন।

লাইন্‌স্‌ম্যান উঠে যাওয়াতে সাহস পেয়ে স্টেশন-মাস্টারবাবুকে বললুম—এইবার যদি জিতেনের একটু খোঁজ করেন। তার পর গত রাত্রির ঘটনা বললুম। তিনি কি উত্তর দেবেন ভাববার জন্যে মাথা চুলকোচ্ছিলেন। এমন সময় দেখি জিতু গা-ময় কাদা মেখে প্লাটফরমের দিক থেকে আমাদের কাছে আসছে। রামু তাকে দেখে দৌড়ে ছুটে গেল। আমাদের কাছে আসতে জিজ্ঞাসা করলুম, কাল রাত্রে কোথায় ছিলি? সে উত্তর দিল—গাছের উপর, সমস্ত রাত্রি ঘুম না হওয়ায় ভোরের দিকে ঝিমোচ্ছিলুম, হঠাৎ ডাল থেকে হাত সরে যাওয়ায় গাছের তলায় ছোট খানায় পড়ে গিয়েছিলুম, রাস্তায় লোক চলার আগে গর্ত থেকে উঠতে সাহস পাইনি, তাই চুপটি মেরে পাঁকভর্তি খানার ভিতরেই বসে-ছিলুম।

জিতু কথাটা শেষ করেছে এমন সময় দারোগাবাবু এলেন, হাতে লিগ্‌লিগে বেতের ছড়ি, সঙ্গে দু'জন কনস্টেবল্‌। তাঁকে চেয়ার দিয়ে স্টেশন মাস্টার খাতির করে বসালেন। খাতির করলে কি হবে, দারোগাবাবুর চেহারাটাই মার-মার কাট-কাট করছে। স্টেশন-মাস্টারমশাই আর লাইন্‌স্‌ম্যানের কাছে সব কথা শুনেও আমাদের হাতে বন্দুক দেখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কত কথাই না জিজ্ঞাসা করলেন। ভাগ্যে বুদ্ধি করে বন্দুকের পাশটা সঙ্গে করে এনেছিলুম, তা না হলে আর এক ফ্যাঁসাদে পড়তে হতো।

যাক গিয়ে, দারোগাবাবুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েই আমরা বাজারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লুম চিঁড়ে-মুড়ি-মুড়কি খেয়ে সারাটা দিন কাটিয়ে দিলুম। কলকাতায় ফেরবার একটামাত্র ট্রেন, সন্ধ্যাবেলা আসে। অনেক আগে থাকতে টিকিট কিনে প্লাটফরমেই বসে রইলাম।

নায়েববাবু সেই যে চক্কোত্তি মশাইকে খবর দিতে গিয়েছিলেন, আজও ফেরেনি। বাবা,'আচ্ছা জায়গায় শিকার করতে আসা হয়েছিল। গাড়ী আসতে চড়ে বসে নাক-কান মলে প্রতিজ্ঞা করলুম, বন-বাদাড়ে আর শিকার করতে আসছি না।

এই সত্যি ঘটনাটা লিখলুম আমার শিকার-জীবনের একেবারে প্রথম স্মৃতির পাতা থেকে। তখনও শিকারী হিসেবে পাকাপোক্ত হইনি। তবে শিকারের নেশা ছিল মনে-প্রাণে পুরোদস্তুর।

অন্যান্য শ্রেণীর রচনা

ভুতের দেশে চলন্ত মড়ার মাথা

চাটুজ্যেমশাই-এর উপদেশ অগ্রাহ্য করে বল্লভপুরের মাঠ পাড়ি দেবো ঠিক করে ফেললুম।

জমিদারিতে নায়েবি করি, সুদূর পল্লীগ্রামে কাছারী। মাছ ধরা আর দাবা খেলা ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই। সকাল বিকেল আর সন্ধ্যে একই মানুষের সঙ্গে দেখা আর একই কথা, থোড়-বড়ি খাড়া আর খাড়া-বড়ি থোড়। জীবনটা একঘেয়ে হয়ে গিয়েছিল। মনের অবস্থা যখন সঙ্কটাপন্ন সেই সময় খবর এলো টাউনে থিয়েটার হবে।

আজকেই থিয়েটারের দিন। সকাল থেকে তৈরী হয়ে আছি—আর, যাবার বেলায় চাটুজ্যেমশাই ভয় দেখালে কি থামা যায়? লোভ সামলাতে না পেরে বৃহস্পতিবারের বেলাতে মা-দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লাম।

পিছু-ডাকে রাস্তায় নামতেই একটু দোমনা ভাব এসেছিল, হাজার হোক চাটুজ্যেমশাই প্রাচীন মানুষ, অভিজ্ঞ ব্যক্তি—ভাবলুম তাঁর কথাটা শুনলেই ভাল হতো। কিন্তু লাঠি-সোঁটা হাতে দুই বরকন্দাজের দিকে নজর পড়তে ভয় কেটে গেল।

আমরা চলেছি—শীতল আগে, আমি মাঝখানে আর পাঁড়ে পিছনে। শীতলের এক হাতে পাক-দেওয়া লোহা-বাঁধান লাঠি, অপর হাতে লণ্ঠন, কাঁধে হস্তবুদ খাজনার পুঁটলী।

সদর কাছারীতে বিনা তলবে হঠাৎ হাজির হলে ম্যানেজারবাবু হম্বিতম্বি শুরু করে দিতেন। তাই খাজাঞ্চিখানায় টাকা জমা দেবার অছিলায় থিয়েটার দেখার বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল। খাজনা আদায় হয়েছিল ভালই, অত টাকা দূর মহালের ছোট্ট কাছারীতে সামলানও তো সোজা কথা নয়। অছিলা মনঃপুত হওয়ায় ম্যানেজারবাবুর ভয়টা কেটেছিল।

দেখতে দেখতে চলার পথে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা পার হয়ে, পায়ে-চলা মেঠো পথে হাঁটছি, পা চালিয়ে চলেছি, তার সঙ্গে থিয়েটার দেখার কথা, পুটুর (আমার বোন) বিয়ের কথা, আরো কত কি যে ভাবছি তার ঠিকানা নেই। অন্ধকার তখন জমাট বাঁধতে আরম্ভ করেছে, গ্রাম ছাড়িয়ে অনেকটা এসে পড়েছি।

বিশু গোয়ালার বাড়ী আমাদের মহালের দক্ষিণ চৌহদ্দির শেষ সীমানা। তার সেই বাঘা কুকুরটার ডাক বহুদূরে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। পিছনে পাঁড়ের বুট জুতার আওয়াজও শুনতে পাচ্ছি না। নানা বিষয় ভাবতে ভাবতে আবেষ্টনীর কথাই ভুলেছিলাম।

হ্যারিকেন লণ্ঠনের তলায় যেটুকু আলো পড়েছিল তাতে কেবল কয়েক গজ মাত্র দেখা যায়, তার ওপর সব-কিছু অন্ধকার গ্রাস করে ফেলেছে। দু'পাশে সবুজ ঘাস, তারই বুক চিরে পায়ে-হাঁটা আঁকা-বাঁকা পথ, মোটা অজগরের মত পড়ে রয়েছে, হঠাৎ তাকালে মনে হয় এখনি হয়ত নড়ে উঠবে।

ডাকসাইটে বাঘার ডাক নেই, পাঁড়ের জুতার শব্দ নেই। চারদিকে নিঝুম, খটকা লেগে গেল। আস্তে ডাকলাম—'পাঁড়ে'। কোন সাড়া নেই। নায়েববাবুর ডাকে একটা সামান্য বরকন্দাজ উত্তর দেয় না? অদ্ভুত লাগছিল, প্রথমটা ভাবলুম হয়ত সে টাকার হিসাবে অন্যমনস্ক হয়ে আছে, সুদ-খোর কিনা। আবার ডাকলুম, 'পাঁড়ে'। এবারও কোন উত্তর পেলাম না। ভয় লেগে গেল—সন্তর্পণে পিছনে হাত বাড়িয়ে, তাকে ছোঁবার চেষ্টা করলুম; হাত আমার শূন্যে ঘুরতে লাগল, পিছনে কেউ নেই। নিজের ভয়কে চাপা দেবার জন্য শীতলকে জিজ্ঞাসা করলুম, পাঁড়ে কোথায় গেল? প্রশ্ন শুনে শীতল চমকে উঠল, দেখলুম তার অবস্থা আমারই মত হয়ে এসেছে। সে আমার দিকে না ফিরে জড়ান কথায় উত্তর দিল, বোধ হয় কাছেই আছে।

সবে শীতল কথাটা শেষ করেছে, এমনি সময় হাড়ের মত কতকগুলো আঙ্গুল আমার কাঁধের খোলা জায়গাটা চেপে ধরল—ছোঁয়া লাগতেই ছ্যাক করে উঠল, বরফের মত ঠাণ্ডা। আতঙ্কে নিজের অজ্ঞাতেই ঝাঁকুনি দিয়ে ফেলেছিলুম। সঙ্গে সঙ্গে শীতলেরও কি হলো কে জানে, সেও কিসের ঝাঁকুনি খেয়ে লোহা-বাঁধান লাঠি আর টাকার পুঁটীর টাল সামলে থমকে দাঁড়াল। শীতল হতভম্বের মত হয়ে গিয়েছে, আমার দিকে তাকাতে দেখি তার মুখ ফ্যাকাশে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে আমার পিছনে পাঁড়েকে খুঁজতে লাগল। যখন দেখলে কোথাও কেউ নেই তখন প্রায় কাঁপতে কাঁপতে জানালে পাঁড়েকে শেয়ালে নিয়েছে।

বিপদ ঘাড়ে এসে পড়লে তার সঙ্গে যোঝবার শক্তিও কেমন করে এসে যায়। জোর করে মনে বল এনে বললুম, একটা জলজ্যান্ত মানুষ এত বড় খোলা মাঠে উবে যেতে পারে না, চল খুঁজে দেখি।

শীতলের তখন কথা বলবার মত শক্তি নেই, সংক্ষেপে বলল—দেখছ না নায়েববাবু, কোথায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি, পাঁড়েকে খুঁজে আর লাভ নেই, যা হবার তা হয়ে গিয়েছে, এখন গিয়ে চল, এখানে আর থাকা নয়।

কথাটা সত্যি, এখানে আর থাকা না। কিন্তু একটা জীবন্ত মানুষ উবে গিয়েছে বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। লোকটা তেজারতির কারবারে টাকা জমিয়ে ফেলেছে, একথা সকলেই জানে, জমা টাকা ওর সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরে। এমন একটি লোক মাঠের মধ্যে আমাদের মাঝখান থেকে উবে গেলে সন্দেহ এসে পড়বে, আমরা টাকার লোভে মানুষটাকেই গুম্ করে ফেলেছি। তারপর মোকদ্দমায় উল্টো বিচার হয়ে গেলে করছি কি? বিচারের কথা মনে আসতে ফাপড়ে পড়ে গেলাম, পাঁড়েকে খুঁজে বার করা একান্ত দরকার মনে হলো। কিন্তু শীতল এমনই বিগড়ে বসেছে যে তাকে কিছুতেই রাজি করা গেল না।

আদালতে মোকদ্দমা উঠলে তার ফলাফল কি হতে পারে বোঝাবার চেষ্টা করছি, এমনি সময় সামনের বাঁশঝাড় হঠাৎ মড়মড় করে উঠল। ঐখান থেকেই তো শেয়ালটা বেরিয়ে ফতিমা বিবির গোরের দিকে চলে গিয়েছিল। কোন কারণ নেই, বাঁশে বাঁশে ঠোকাঠুকি শুনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। একটু পরে ফতিমা বিবির গোরের পিছনে ডুব দিয়ে স্নান করার আওয়াজ আসতে লাগল।

শীতলের দিকে তাকালাম, দেখি সেও আমাকে দৃষ্টির দ্বারা জিজ্ঞাসা করছে, ব্যাপার কি?

দু'জনাই বুঝলাম ব্যাপার সুবিধার নয়। পাঁড়েকে শেয়ালরূপী অপদেবতা জলে ডুবিয়ে মারছে। এতক্ষণে বোধ হয় লোকটার দম বন্ধ হয়ে এল। পাঁড়ের দফা শেষ হলেই আমাদের পালা শুরু হবে। ভেবে দেখলুম, মানুষ-গুমির মোকদ্দমায় যা হবার তা হোক, সে ভবিষ্যতের কথা। এখন তো প্রাণে বাঁচি, শীতলের উপদেশই মানলুম। এখানে আর থাকা নয়। ইসারায় তাকে এগিয়ে চলতে বললুম। গ্রামে ফেরা অসম্ভব, কারণ সদর কাছারীর দিকেই বেশী এসে পড়েছি, কালীবাড়ী পার হতে পারলেই পাঁচু ময়রার ক্ষেত জমিটার কাছে এসে পড়া যাবে। এদিকে যে রকম বুনো শুয়োরের উৎপাত তাতে নতুন ফসল পাহারা দেবার জন্য মাচানে কেউ না কেউ থাকবেই।

তাড়াতাড়ি চলবার চেষ্টা করছি, কিন্তু মাটি যেন পা দুটোকে আঁকড়ে ধরেছে। কেবলই মনে হচ্ছে কেউ আমার পিছু নিয়েছে—যে কোন মুহূর্তে পাঁড়ের মত টেনে নেবে।

মেঘলা আকাশ তখন অনেকটা ফরশা হয়ে এসেছে। আকাশস্পর্শী কালী-মন্দিরের চূড়া দেখতে পাচ্ছি। কেন বলতে পারি না, দেবীর মন্দির দেখে মনে অনেকটা ভরসা এলো। ভয় কমতেই গলাটা ভিজিয়ে নেবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল।

কালীবাড়ী শ্মশানের উপর দিয়েই প্রাচীন কাটা খাল চলে গিয়েছে। এখন তাতে স্রোত আছে, পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল। ঠাণ্ডা পরিষ্কার জলের কথা মনে আসতে তেষ্টা আরো বেড়ে উঠল। কিন্তু কাছে যেতে হলে কালীবাড়ীর ভিতর দিয়েই যেতে হয়, তা নইলে জঙ্গলের রাস্তায় বুনো শুয়োর তাড়া করে আসতে পারে।

শীতলকে বললুম– জল না খেলে আর হাঁটতে পারছি না। শীতলের দিক থেকে কোন আপত্তি উঠল না।

কালীবাড়ী কি আজকের তৈরী? ইংরেজ সবে তখন বাঙলায় রাজ্য স্থাপন করতে আরম্ভ করেছে, সে দু'শো বছর আগের কথা—মহারানী দুর্গা দেবী তৈরী করেছিলেন। এক পংক্তিতে দু' হাজার লোক মায়ের প্রসাদ খেতো। সেই প্রকাণ্ড অতিথিশালা কালের ধ্বংসলীলায় আজ চুরমার হয়ে গিয়েছে। বটের শিকড় দেয়ালগুলোকে ফাটিয়ে, পড়ন্ত দেয়ালের কতক অংশ কোন কোন জায়-গায় আঁকড়ে ধরে রেখেছে, সব পিষে না যাওয়া পর্যন্ত রেহাই নেই। তোরণদ্বারের কাছে আসতে বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। পথে যত রাজ্যের ভাঙা খিলান আর ইটের স্তূপ—আরো কত কি তার ঠিক নেই। ঠোক্কর সামলাতে সামলাতে এগোতে হচ্ছিল। দেউড়ী পার হয়ে মানমন্দিরের চাতালে এসে যখন পৌঁছলুম তখন আমাদের দম ফুরিয়ে গেছে, একটু জিরিয়ে না নিলে সোজা শ্মশানঘাটে যাওয়া অসম্ভব।

চাতালের উপরটা শ্বেত পাথরে বাঁধান হলে হবে কি, সাদা পাথরে শ্যাওলা শুকিয়ে সবুজ হয়ে গিয়েছে, তার উপর ধুলো। খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে বসলুম। সবে পা মুড়ে একটু আরাম করে নেবার চেষ্টায় আছি, হঠাৎ শুনলুম মরচেপড়া কব্জা খোলার আওয়াজ—তাকিয়ে দেখি আমাদের সামনে অতিথি-শালার একটি জানালা সত্যিই আস্তে আস্তে খুলতে আরম্ভ করেছে, হাওয়া নেই অথচ জানালা আপনা থেকে খুলে যাচ্ছে। ছোট্ট পাল্লা সবটা খুলে যেতেই ভিতরে একটি ঘোমটা-দেওয়া মুখ দেখা গেল। ধবধবে সাদা কাপড় পরে জানালা

থেকে উঁকি মারছে, আমাদের দেখছে। স্ত্রীলোকটির কেবল মাথার দিক দেখতে পাচ্ছি, বাকি দেহের অংশ অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছে।

বিধবা মেয়েটিকে দেখেই হঠাৎ কুলটার আত্মহত্যার কথা মনে পড়ে গেল। দুষ্টু মেয়েটা নাকি এখানেই গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল।

বুকের ভিতরটা দুর্ দুর্ করে উঠছে। শীতলের আরো গা ঘেঁষে বসলুম, কিছু বললুম না। ভাবলুম দৃষ্টিভ্রমও তো হতে পারে।

দৃষ্টিভ্রম হবে কেমন করে। দেখছি জানালাটা খুলেছে আর বন্ধ হচ্ছে, তার সঙ্গে আস্তে আস্তে ক্যাঁচর্ ক্যাঁচ্ আওয়াজ, মাঝে মাঝে নখের আঁচড়ের শব্দ। যখনই জানালা খুলছে তখনই দেখছি মেয়েটা ঠায় আমার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখ দুটো আলো পড়ায় চুনির মত জ্বলছে, ডগ্‌ডগে লালের ছটা যেন চোখ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

একটু পরেই উপর থেকে মাটিতে কিছু লাফিয়ে পড়ার আওয়াজ এলো। তারপরেই দেখি, একটি ঘোমটা-দেওয়া মাথা—হাত নেই, পা নেই, দেহের কোন অংশই নেই, কেবল একটা চলন্ত মাথা লাফিয়ে লাফিয়ে আমার কাছে চলে আসছে খানিকটা করে আসে আবার থমকে দাঁড়ায় ; যতই কাছে আসতে থাকে ততই জ্বলন্ত চোখ আরো জ্বলে ওঠে। আমার রক্ত তখন হিম হয়ে আসতে আরম্ভ করেছে—শেষ পর্যন্ত শীতলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারলাম না।

শীতল একদৃষ্টে চলন্ত মাথার দিকে তাকিয়ে আছে, মুখে তার কথা নেই, কতকটা সম্মোহিতের মত হয়ে গিয়েছে। আমিও তখন ভয়ে আত্মহারা। যা চোখের সামনে ঘটছে তাতে মানুষ জড়ভরতের মতই হয়ে যায়। উঠে ভাল করে দেখবার সাহস নেই, পালাবারও শক্তি নেই—চিৎকার করব কি, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে।

ক্রমান্বয়ে চলন্ত মাথা একেবারে আলোর সামনে এসে পড়ল, দেখলুম মাথা রূপ বদলে ফেলেছে। ঘোমটার তলায় অমন সুন্দর মুখ দেখেছিলাম, এখন তা সাদা খরগোশ হয়ে গিয়েছে। খরগোশের ছদ্মবেশে হয়ত আরো এগিয়ে আসত, কিন্তু এলো না, হঠাৎ মোড় বাঁকলো এবং দু'চার লাফেই একটা ছোট ঝোপের ভিতর গা-ঢাকা দিল।

তারপর সব চুপচাপ। মনকে স্তোক দিলুম আমার দৃষ্টিভ্রমই হয়েছিল। শীতলকেও বোঝাবার চেষ্টা করলুম, ওটা কেবল একটা খরগোশ। শীতল গম্ভীরভাবে চুপি চুপি বললে, ফতিমা বিবি!

শীতল যাই ভাবুক, খরগোশ দেখে অনেকটা আশ্বস্ত হলুম।

একটু নিশ্চিন্ত ভাব আসছিল, কিন্তু বেশীক্ষণ টিকল না। দমকা হাওয়া শুরু হলো। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, চাঁদের আলো বটের ঘন পাতার আড়াল সরিয়ে চাতালে এসে পড়েছে। ঝাপ্‌সা আলো ও ছায়ার ফাঁকে থেকে থেকে ঐ যেন কি চলে গেল মনে হচ্ছে। সংক্ষেপে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেও বোঝবার উপায় নেই, কোন্‌টা কায়া কোন্‌টা ছায়া।

অনেকটা সময় একই ভাবে কেটে গেল। তেষ্টা তখনও রয়েছে। শীতলকে বললুম, চলো একটু জল খেয়ে আসি। সে আমার কথার উত্তর না দিয়ে অতিথি-শালার দেয়ালের দিকে আঙুল বাড়িয়ে আমাকে কি দেখতে বলল। শীতলের আঙুলগুলো ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপছে। ঐখানেই দমে গেলুম, তারপর যথাস্থানে তাকিয়ে দেখি বিধবার বেশে কোন স্ত্রীলোক সেই ঘরের দরজার পাশে দেয়ালে আঁকার মত দাঁড়িয়ে আছে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে আবিষ্কার করলুম, সেই চেনা মুখ। চলন্ত মাথা গোটা দেহের উপর দাঁড়িয়েছে।

খরগোশ আমাকে সাহস দিয়েছিল, ঠিক করে ফেললুম যা থাকে কপালে হবে, এবার এগিয়ে দেখব আসলে ওটা কি।

শীতলকে বললুম, তোমার লাঠিটা বাগিয়ে ধরো, আমি লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে দেখি—ওটা কি! হয়ত কিছুই নয়, আলো আর ছায়ায় কিছু ভুল দেখছি।

বললুম তো জোর দিয়ে ভুল দেখছি, কিন্তু বুকের ভিতরটা তখন ঢিপ ঢিপ করছে, কে জানে খরগোশের বদলে যদি এখনি বাঘের রূপ নিয়ে ফেলে তাহলে তো রসগোল্লার মত গিলেই ফেলবে। পরে একটা কথা মনে এলো, কুলটা যদি নকল হয়। কথাটা মনে আসতেই আবার মনে বল পেলুম। আসলে গলায় দড়ি দেওয়ার গল্প হয়ত একেবারে ফাঁকি। তেপান্তরের মাঠের মাঝখানে এমন একটি জায়গা বদমাইস লোকের আড্ডাও হতে পারে। যদি হয়, তাহলে! চুরি-ডাকাতির জন্যেই যা তা কথা কানাঘুষায় ছড়িয়ে পড়েছে। আসলে মেয়েটা বদমাইস লোকের মাইনে করা দাসী; ওকে ধরতে পারলে সরকার পর্যন্ত বকশিস দিয়ে দেবে। বকশিস একটা ছোটখাট জায়গীরও হয়ে যেতে পারে। ইস্‌, একটা নিষ্কর বড় তৌজী জায়গীর হিসাবে পেলে সারা জীবন পায়ের উপর পা রেখে বাঁচা যাবে। আমাকে তোয়াজ করবার জন্যেই কত লোক থাকবে তার ঠিক নেই। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা মনে আসতে জোর দিয়েই বললুম—খানাতল্লাসী করে আসি। শীতলের নিজের মত বলে কোন জিনিস নেই, আমার

সাহসই বিপদে তার সম্বল হয়ে উঠেছিল; আমি লণ্ঠন হাতে উঠতে সে আমার পিছু নিল। লণ্ঠনের আলোতে আর কতটুকুই বা দেখা যায় মাটির উপর খানিকটা জায়গা মাত্র, উপর দিক আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিশে গেছে।

মান-মন্দিরের চাতাল থেকে নেমে আমরা অতিথিশালার বারান্দার দিকে এগোতে লাগলুম। আশ্চর্যের ব্যাপার, আমরা উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে কুলটাকে আর দেয়ালের কাছে দেখা গেল না। কিভাবে দেয়ালের ভিতর মিশে গেল বোঝবারও অবসর পেলুম না। ঘটনাগুলি ভোজবাজীর মত ঘটে যাচ্ছে। তখন মনে জিদ চেপে ধরেছে, সাহস দেখিয়ে সরকারের কাছ থেকে ইনাম আদায় করব বলে। দুষ্টু মেয়েটাকে ধরতে পারলে, চাই কি, আমার ফোটোও কাগজে বার হয়ে যেতে পারে। ইস, সে একটা কাণ্ডই হয়ে যাবে, এক রাতে হোমরা-চোমরা ব্যক্তি হয়ে যাব।

মাটির দিকে তাকিয়ে নানা বাধা সামলে সবে বারান্দায় এসে পৌছেচি, অমনি চিঁ চিঁ আওয়াজ করে নানা দিক থেকে শূন্যে ওড়া কুলোর মত প্রকাণ্ড কালো হাত আমাদের মুখে নাকে মাথায় ঝটাপট চড় কশিয়ে হাওয়ায় উড়তে লাগল। অনেকগুলো খেলাম বটে, কিন্তু লাগল না।

আর এগোব কিনা ভাবছি এমনি সময় দেখলাম সেই মেয়েটা আবার ফিরে এসেছে। এবার সে দাঁড়িয়েছিল তার ঘরের সামনে চৌকাঠের উপর। হালকা হাওয়ায় সাদা কাপড় দুলছে। তার চেহারা এবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মানুষ যে এত সুন্দর হতে পারে কল্পনাও করা যায় না। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মাল, অমন সুন্দর মুখ নিয়ে কেউ খারাপ কাজ করতে পারে না। এর পিছনে নিশ্চয় কোন রহস্য আছে, আসলে কুলটাই হয়ত মেয়েটিকে বন্দী করে রেখেছে। মেয়েটি নিষ্কৃতি পেতে চায়, তাই হয়ত দেখা দিয়ে দুঃখের কাহিনী জানাবার চেষ্টা করছে। অনুমানে কুলটার ইতিহাস গড়ে উঠতেই সঙ্কল্প হলো, সুন্দরীকে যেমন করে পারি বদমাইস লোকের কবল থেকে উদ্ধার করব। সঙ্গে সঙ্গে সাহস বেড়ে উঠতে লাগল।

উঠলাম, সেই ঘরের রোয়াকের উপর দরজার কাছে এসেই মেয়েটি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেদিকে তাকালাম—কেউ কোথাও নেই। আমি তখন বেপরোয়ার মত হয়ে গিয়েছি, ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লাম। ছোট্ট ঘর, চুনারের লাল পাথরের মেজে, ধুলায় একাকার চার-পাঁচটা বড় সাপের খোলস পড়ে রয়েছে। ধুলার উপর মানুষের পদচিহ্নও নেই, তবে ছোট জানোয়ারের চলাফেরার দাগ আছে।

ঘরের জানালাটা তখনও খোলা—কাছে গিয়ে কার্নিস পরীক্ষা করে সেখানেও ছোট জানোয়ারের পদচিহ্ন খুঁজে পেলুম, কিন্তু মানুষের অস্তিত্বের নিশানা কোথাও খুঁজে পেলুম না। আমি যখন এক মনে ঘর পরীক্ষা করছিলুম সেই সময় শীতল এসে আমার কাপড় ধরে টান মারল। তারপর ঘরের বাইরে ভাঙ্গা থিলাটার পাশেই সিঁড়ির ধাপের দিকে আঙুল দেখিয়ে আমার পায়ের তলায় বসে পড়ল। তার ব্যবহার ছোট ছেলের মত হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে আমি কিছু দেখতে পাইনি; দরজার কাছে আলো আনতে সিঁড়ির ধাপের উপর যা দেখলুম তার বর্ণনা দিতেও মাথা ঘুরে যায়। সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! মানুষের মাথার খুলি একটা জন্তুর উপর চেপে দারুণভাবে মাথা নাড়ছে। এদিক সেদিক পাগলের মত ছটফট করে ঘুরছে, সঙ্গে সঙ্গে শুকনো মাথার খুলি যাতে-তাতে ঠুকে গিয়ে খটাং খট শব্দ উঠছে। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর স্থির হয়ে আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়াল।

এই সময় শীতলের গলা থেকে ঘড়ঘড়ানি আওয়াজ বার হলো। সে কি বলতে চেয়েছিল বলতে পারল না। ধীরে ধীরে মেজের উপর নেতিয়ে পড়ল। বুঝলাম সে জ্ঞান হারাল। ভয়ঙ্কর জায়গায় একা পড়ে গেলুম। ভূতুড়ে জন্তুটা তখন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছে। এই অবসরে আলোটা কাছে এনে আরো উস্কে দিলুম, তারপর সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ভয়ঙ্কর জীব আর সেখানে নেই, কিন্তু তার চলাফেরার সঙ্কেত পাচ্ছি হাড় ঠোকার শব্দে—আমাদের কেন্দ্র করে চারপাশে ঘুরতে আরম্ভ করেছে।

শীতল এই সময় গা-মোড়া দিয়ে খাবার জল চাইল। এমনই কাতর প্রার্থনা যে মনে হয় জল না পেলে তখনি লোকটা মারা যাবে। তখন আমার প্রধান চিন্তা হলো শীতলকে বাঁচাই কেমন করে। জল আনতে হলে ওকে একা অন্ধকারে ফেলে যেতে হয়। উপায়ান্তর না থাকায় তাই যাব ঠিক করলাম।

আমাকে আলো নিয়ে উঠতে দেখে, শীতল হাতছানি দিয়ে বারণ করল। তার বাধা মানতে হলো। সত্যি কথা বলব, আমারও ঐ অদ্ভুত জানোয়ারের কাছ দিয়ে যেতে গা ছম্ ছম্ করছিল।

শীতলের পাশেই বসলুম। তখন ভয় আর সাহস তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। মনের অবস্থা কতকটা শ্মশান-বৈরাগ্যের মত হয়ে গিয়েছে—তখন বাঁচা আর মরা দুইই সমান। এই বেঁচে আছি, পরক্ষণেই মরে গেলেও কোন দুঃখের কারণ নেই। বিপদ গা-সওয়া হয়ে এসেছে, সব রকম ঘটনার জন্য মন প্রস্তুত হয়ে আছে।

মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছিল, একটু বসবার আরাম পেতেই অবসাদ্ আর নিদ্রার ঘোরে জড়িয়ে পড়তে লাগলুম। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা; একটু একটু করে স্বপ্নের দেশে এগিয়ে চলেছি ; পায়ের তলায় মাটি থাকলেও তার অনুভূতি নেই, মাঝে মাঝে শুনছি হাড় ঠোকার শব্দ তখনো আমাদের চারধারে ঘুরছে।

হঠাৎ শব্দ থেমে গেল। তারপর শুনলাম, মেয়েমানুষের গলায় কে একজন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে--আমাকে এখান থেকে বাঁচাও। ভাবলুম মানুষের খুলি পরা সেই জন্তুটা সুন্দরীকে আক্রমণ করেছে। তখন ভয় বলে কোন-কিছুর তোয়াক্কা নেই—শীতলের কথা ভুলেছি, শুধু হাতেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছি, হয় সুন্দরীকে বাঁচাব, না হয় নিজে মরব। কতক্ষণ ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি মনে নেই। কতটা পথ চলে এসেছি তারও হদিশ নেই। মোট কথা, আমার চলা থামেনি। হাড় ঠোকার শব্দ অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছি। আমি যতই অগ্রসর হতে থাকি ততই হাড় ঠোকার আওয়াজ সামনে শুনতে পাই। পথেরও শেষ নেই, আমারও ক্লান্তি আসতে চায় না, অবিশ্রান্ত উদ্যম নিয়ে চলেছি। অকস্মাৎ কঠিন পদার্থে মাথা ঠুকে গেল। দেখলুম, সামনে আর এগোবার উপায় নেই, পথ বন্ধ—আমি দাঁড়িয়ে আছি একটি মজবুত দরজার সামনে। প্রাচীনকালের কপাট, লোহার পাত আর বল্টু দিয়ে মোড়া। আরো লক্ষ্য করবার যে দরজা বন্ধ। কত যুগ আগে যে বন্ধ হয়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। প্রকাণ্ড তালা, অদ্ভুত তার গড়ন। তার উপর হাত রাখতেই দুলে উঠল—দেখলুম তালা খোলা, সমভার ঠিক না থাকায় একটু ছোঁয়াতেই দুলতে আরম্ভ করেছে। এখানে আসবার পর থেকেই শুধু ডাকাতের কথা মনে আসছিল। অদ্ভুত মজবুত দরজা আর খোলা তালা দেখে সন্দেহ হলো, ডাকাতের আড্ডায় এসে পড়েছি। ভিতরে ঢুকবো কিনা ভাবছি, এমনি সময় দরজা আপনা থেকে খুলে যেতে লাগল। ভাবলুম, হয়ত কোন প্রহরী বার হয়ে আসবে। ঘটল বিপরীত, দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঝন্ ঝন্ করে অগুণতি টাকা মোহর গড়িয়ে পড়তে লাগল। বন্ধ দরজার ঠেকায় যেন স্তূপীকৃত ঐশ্বর্যের ওজন আপন সমতায় আটকে ছিল, দরজা খুলতেই বিস্তারের পথ পেয়ে গড়াতে শুরু করেছে। দু'চারটে আমার পায়ের উপরই এসে পড়ল। কৌতূহল দমন করতে পারলুম না—তুলে দেখি টাকা নয় সোনা—বাদশার আমলের মোহর।

অতুল ঐশ্বর্যের কথা ভাবতে গিয়ে মাথাটা আমার প্রায় ঘুরে গেল।

সুন্দরীকে বাঁচানোর কর্তব্য ক্ষণিকের ভিতর লোপ পেল। ধনাগার দেখবার জন্যে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলুম। ভিতরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালিয়ে দিলুম গাঢ় অন্ধকার, তা-ই ভেদ করে সোনার রশ্মি বার হচ্ছে। লোভ আমাকে উন্মাদের মত করে ফেলেছিল, আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না।

একটু এগোতেই চলার পথে বাধা পেতে লাগলুম। মোহরের স্তূপ পায়ের ঠোক্করে বালি ধ্বসে যাবার মত ঝরে পড়ছে। প্রতি পদক্ষেপেই শরীরের টাল সামলান দরকার হয়ে পড়ছিল। অন্ধকারে কত আর সামলান যায়, একটি বড় স্তূপের ধাক্কা খেয়ে পাশের দেয়ালের উপর গিয়ে পড়লুম। মাথা বাঁচাবার জন্য হাত এগিয়ে দিয়েছিলুম, স্যাঁতসেঁতে পাথরের দেয়ালে হাত লাগতেই ক্ষীণ অলৌকিক আলো এসে পড়ল, দেখলুম, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা একটা সুড়ঙ্গ, ক্রমে ধাপের পর ধাপ নীচে নেমে গেছে। প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম, পরে একটু ধাতস্থ হতেই শুনতে পেলুম—পাতালের গভীর স্তর থেকে চাপা কান্নার আওয়াজ—সেই সুন্দরীর গলার আওয়াজ, কিছুমাত্র ভুল করিনি। চলার পথে কোঁচড় ভর্তি মোহর তুলে নিয়েছিলাম, সেগুলো ফেলে দিয়ে কান্নার শব্দ লক্ষ্য করে নীচের দিকে নামতে লাগলুম। অত ভার নিয়ে চলতে পারছিলাম না বলেই তা ফেলে দিতে হলো। আমার তখন স্থির ধারণা জন্মেছে, সুন্দরীকে উদ্ধার করতে পারলেই এই বিরাট সম্পদ আমার হয়ে যাবে। যে সম্পদ অসংখ্য গরুর গাড়ী আর হাতীর পিঠে চালান করতে হবে তা কি কোঁচড়ে নেবার জিনিস! মনে মনে ম্যানেজারবাবুর চেয়ে বড় বাড়ীর কথা তখনই ঠিক হয়ে গেল। কোটি কোটি টাকার খাজাঞ্চিখানা কিভাবে তৈরী করব তার একটা খসড়া করে ফেললুম। সবই নির্ভর করছে সুন্দরীকে উদ্ধার করার উপর।

আমি পাতালের গহ্বরে নেমে যাচ্ছি, সুড়ঙ্গও মোড়ের পর মোড় ঘুরে যাচ্ছে, পথ আর শেষ হতে চায় না। অনেকটা হেঁটেছিলাম, বোধ হয় ক্লান্তি এসে পড়ছিল। দেয়ালের উপর হাতের ভর দিয়ে এগোতে লাগলুম। হঠাৎ আমার হাতে চাপে মোটা বড় বোতামের মত কি একটা জিনিস দেয়ালের ভিতর ঢুকে গেল। তারপরেই শুনলুম দূরে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ করেছে। সেইখানেই দাঁড়িয়ে গেলাম। ঘণ্টা বাজা থেমে গেল, পরক্ষণেই নতুন রকমের আলোর তীব্র রশ্মি আমার ডান হাতটার উপর এসে পড়ল, দেখি একটি হীরের ফলকের উপর আমার আঙ্গুলের চাপ পড়েছে। ফলকের তলায় কতকগুলি

সাঙ্কেতিক চিহ্ন। চিহ্নের পাশে পাশে সংস্কৃত ও অন্য বিদেশী ভাষায় কি-সব লেখা আছে, চীনা অক্ষরও দু'একটা দেখা গেল। কেন বলতে পারি না, আমার আঙুল নিজের গতিতে একটি চিহ্নের উপর এসে পড়ল। সামান্য ছোঁয়া লাগতেই পাশে দেয়াল ফাঁক হতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে একটি এড়োভাবে সুড়ঙ্গ বেরিয়ে পড়ল। নতুন সুড়ঙ্গের একটু ভিতরেই প্রকাণ্ড দরজা দেখতে পেলুম— কান্নার আওয়াজ ঐ দরজার পিছন থেকে আসছিল। নির্ভয়ে এগিয়ে গেলুম দরজার দিকে--কি বিরাট কবাট! কবাটের কাছে আসবার মধ্যে সুড়ঙ্গের চেহারা বদলে গেল, কিন্তু রুদ্ধ কবাট খোলার কোন সন্ধান পেলুম না। কি করব ভাবছি এমনি সময় কালো কবাটে সোনার তীর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নিকটে গিয়ে সেটাকে নাড়ানাড়ি করলুম, কোনই ফল পেলুম না। কিন্তু পিছনে পায়ের কাছে মাটির তলা গুরু গুরু করে কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি ফিরে দেখি ঠিক আমার কয়েক গজ দূরে একটি চতুষ্কোণ গহ্বরের মুখ ক্রমে বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে। আর তারি তলা থেকে বাঘের হুঙ্কার উপরে উঠে আসছে। হুঙ্কার ক্রমান্বয়ে কাছে আসতে লাগল। বুভুক্ষু বন্দী বাঘ কেবল মুক্তির সন্ধানই পায়নি, মানুষের গন্ধে আহারের জন্যে ঠিক পথ ধরে আমারই দিকে এগিয়ে আসছে। মৃত্যু সন্নিকট, প্রতি মুহূর্তে আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে আছি। হঠাৎ ভরসার আভাস পেলাম। বিরাট কবাটের ও-পাশ থেকে গুরুগম্ভীর গলায় কোন পূজারীর মন্ত্রোচ্চারণ শুনতে পাচ্ছিলুম। স্ত্রীলোকটির কান্না থেমে গিয়েছে। অনুমান করলুম পূজারী কাপালিক, নরবলি শেষ করে পূজায় বসেছে। হোক কাপালিক, তবু সে মানুষ—হয়ত আমাকেও বলি দেবে, দিক বলি, কয়েক ঘণ্টা তো বেশী বাঁচতে পাব। বাঘ যে আস্তে আস্তে মাংস ছিঁড়ে খাবে। হুঙ্কার ইতিমধ্যে একেবারে নিকটে এসে পড়েছে—আমি অস্থির হয়ে দরজায় জোর করে ধাক্কা মারতে লাগলুম। মন্ত্রোচ্চারন থেমে গেল, পরক্ষণে দরজাও খুলে গেল—কিন্তু ঘরে কোন মানুষ নেই। ঘরে ঢুকতেই দরজা আপনা থেকে আবার বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে যথেষ্ট আলো ছিল। দেখি, চারধারে নরকঙ্কাল ছড়ান। দেয়ালে পাশাপাশি একটার পর একটা শিকল ঝোলান, কোনটায় তখনো নর-অস্থি আটকে আছে, কোনটায় কেবল খুলি, কোনটায় কোমরের কাছটা, কোনটায় হাত ঝুলছে— দেহের বাকি হাড়গুলি গড়াগড়ি যাচ্ছে। মড়ার দেশে এসে পড়েছি— জীবন্ত মানুষগুলোকে বোধ হয় শিকলে বেঁধে শুকিয়ে মারা হয়েছিল। কতকাল ধরে এই ঘরে হত্যার শৌখিনতা চলেছে কে জানে।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে আছি। শুনলুম—পুনরায় মন্ত্রোচ্চারণ শুরু হলো। বুঝলাম, এবার আমার পালা। পরের ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছি, বিপরীত দিকে নিরেট পাথরের দেয়ালের ভিতর থেকে এক মহাশক্তিমান পুরুষ বার হয়ে এলেন—হাতে নরমুণ্ড; পরণে রক্ত রঙের চেলী। কি ভয়ঙ্কর তাঁর চাহনি, বাঘের দৃষ্টি যেন তাঁর চাহনির কাছে নিষ্প্রভ। তাঁকে এগিয়ে আসতে দেখে আঁতকে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই দেয়ালের দিকে পিছিয়ে এসেছিলুম। হঠাৎ শিকলে মাথা ঠুকে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ঝন্ ঝন্ করে লোহার শিকল বেজে উঠল, তারপর ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলতে লাগল। শিকলে শিকলে কি সাঙ্ঘাতিক ঠোকাঠুকি—ঘরের ভিতর কি ভয়াল প্রতিধ্বনি। দেয়াল ছেড়ে সরে দাঁড়ালুম, দেখি, যেখানে ধাক্কা লেগেছিল সেই শিকলটায় কেমন করে একটি গোটা নরকঙ্কাল আটকে রয়েছে। শিকলের দোলার সঙ্গে, কঙ্কালের হাত, পা, মাথা সব দুলছে। হঠাৎ নরমুণ্ডের মুখ খুলে গেল। তলার চোয়াল নড়তে আরম্ভ করে দিল—কিছু কথা যেন বলতে চায়। তারপরেই মনে হলো নিঃশব্দে হাসছে। সে হাসির রূপ বিকট। নিস্তব্ধ প্রেতপুরীতে আমার অনধিকার প্রবেশ যেন কঙ্কালদের কৌতুকের বিসয় হয়ে উঠেছে। চতুর্দিকে মড়া আব নির্মম পাষাণ, আমার আতঙ্কের কথা প্রাণহীন কেমন করে বুঝবে! পলে পলে সময় কাটতে লাগল। আমার দৃষ্টি ঝিমিয়ে আসছে - ঘরের ভিতরে কি হচ্ছে বুঝতে পারছি না, মৃত্যুর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। শিকলের ঠোকাঠুকি থেমে গেছে। চোখ খুলে তাকালুম, সেই মহাশক্তিমান পুরুষকে আর দেখতে পেলুম না। তার পরিবর্তে তিনি যেখানে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই দেয়ালটি দুলতে দেখলুম—শুধু সেই দেয়াল নয় প্রত্যেকটি দেয়াল চারপাশে দুলতে আরম্ভ করেছে। দেয়ালগুলি আমার কাছে চলে আসছে ক্রমে ঘরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ছোট হয়ে আসছে, তার সঙ্গে নবকঙ্কাল মাটির দোলায় আমার পায়ের তলায় হুড়োমুড়ি লাগিয়েছে। এই সময় সেই সুন্দরীর কথা মনে এলো। যার সন্ধানে সব বিপদ অগ্রাহ্য করে এখানে এলুম, তার সন্ধান তো পেলুম না। পরক্ষণেই বিবেচনা করে দেখলুম আশলে সেই মেয়েটি আমাকে এখানে লোভ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে।

রিক্সাওয়ালা

রমেশের জন্মদিন উপলক্ষে ভূরিভোজনের ডাক পড়ল। এই জাতীয় নিমন্ত্রণ আমি পারতপক্ষে প্রত্যাখ্যান করি না, বিশেষ করে রমেশের বাড়ীতে, কারণ ওখানে জমকালো প্রত্যাশা থাকে।

নিমন্ত্রিতদের ভিতর প্রায় সকলেই এসেছিলেন। কেবল পুরুষের সমাবেশ। বৈঠক গুলজার হয়ে উঠতে সময় লাগল না। বেপরোয়া দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা, তার সঙ্গে বিশুদ্ধ কেচ্ছার সুব্যবস্থা থাকায় তর্ক ও গল্প গড়াতে গড়াতে রীতিমত রাত হয়ে গেল। চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আহারান্তে ঢাক-পেটান ঢেকুর যখন আকণ্ঠ ভবাটের সঙ্কেত দিল তখন ঘড়ির কাঁটা এগারটার ঘর পার হয়ে গিয়েছে।

সর্বান্তঃকরণে ভোজনকে গ্রহণ করায় দেহের ওজন দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। তার উপর শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বলতে হয়, আমার শরীরটিও বেশ পুষ্ট। হেঁটে বাড়ী ফেরবার ক্ষমতা নেই। এদিকে ট্রাম-বাস বন্ধ। বন্ধুর বাড়ীতে রাত্রি কাটানও চলে না। যে অজুহাতই গৃহিণীর সামনে দিই না কেন, তুমুল কাণ্ড বেঁধে যাবে। এই সূত্রে রমেশের উপর অভিযোগ জড় হয়ে উঠতে লাগল। ভাবতে লাগলাম, ভাল করেই যদি খাওয়ালি ত আমার মত নিমন্ত্রিতকে বাড়ী পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলি না কেন? ঘরে গোটা-তিনেক গাড়ী মজুত, আর আজ রবিবার বলে চালকদের ছুটি দেওয়া হলো। মনে মনে বিচার করে দেখলাম, ছুটি না দিয়েই বা করে কি। কলের টাকায় বড়লোক। প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ ঘড়ির ঘণ্টা ধরে। ইচ্ছা করলেই কি এ-যুগে মনিবের মত মনিব হওয়া যায়!

ইতিমধ্যে, স্বল্পাহারী স্লিম-(slim) মার্কা ছিপ্‌ছিপে ছোকরার দল "বেজায় খেলাম, বেজায় খেলাম, বড় ভাল লাগল, many happy returns of the day" ইত্যাদি মামুলি বোল মুখস্থ আওড়ে, যে যার গাড়ী চালিয়ে বাড়ী ফিরল, একজনও বলল না, মশাই আসুন, আমার গাড়ীতে lift দিয়ে দিচ্ছি। আমি একজন প্রফেসর মানুষ; মোটা শরীর, বেশী খেয়ে ফেলে হাইফাঁই করছি

সেদিকে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই, যে যার নিজেরটা নিয়েই ব্যস্ত। নবযুগের কাণ্ডই আলাদা।

আমি তখন 'বেশ লাগল' পালা শেষ করে রাস্তায় নেমে পড়েছি। জিদ চেপে গিয়েছিল, ঠিক করে ফেলেছিলাম নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নেব। চৌমাথার দিকে হাঁটতে লাগলাম, রিক্সা অথবা ট্যাক্সির আশায়। শহর হলেও এ অঞ্চলের বাসিন্দারা রাত্রিটা ঘুমিয়েই কাটায়। ট্যাক্সি বা রিক্সা ষ্ট্যাণ্ড একটু দূরে। যথাস্থানে পৌঁছে দেখি ষ্ট্যাণ্ড খালি। আমার অবস্থাও কাহিল। গুরু আহারের পর ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। পা অচল, টেনে-হিঁচড়ে কোন প্রকারে চলেছি। শেষ পর্যন্ত একটা ল্যাম্প পোষ্ট ধরে দাঁড়ালাম। চোখ একেবারে জুড়ে আসছে। পোষ্টের তলায় বসে পড়ার ইচ্ছা এলো, কিন্তু ধোপ-দুরস্ত পরিচ্ছদ-সহ ভদ্রসন্তানকে রাস্তার মাঝখানে আসীন দেখলে, পাহারাওয়ালার নজর সহজেই আকৃষ্ট হবে, তারপর হাজতবাসের ব্যবস্থা হলেই চমৎকার।

অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল। বোধ হয় গলির দিকে রিক্সার ঘণ্টা শুনলাম। ভুল করিনি, আওয়াজ আমার দিকে চলে আসছিল। ধড়ে প্রাণ এলো, সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু কপাল খারাপ, রিক্সাওয়ালা সওয়ার নিয়ে চলেছে এবং আরোহী অকথ্য জড়ান ভাষায় লোকটাকে গালাগালি দিচ্ছে। এই সময় পাশের বাড়ীর দেয়াল-ঘড়িতে বারটা বাজল। আর তো দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, ঘুম কাটিয়ে ওঠার জন্য একটি নতুন সিগার ধরালাম। শরীরের যে অবস্থা তাতে ধোঁয়াকে মৌতাতের স্তরে নিতে পারছিলাম না। এমনি সময় আবার রিক্সার ঘণ্টা বাজল। শব্দ গলির দিক থেকেই আসছিল। রিক্সার গতি মন্থর। আওয়াজ বড় রাস্তার কাছে আসবার আগেই গলির মোড়ে গাড়ী থেমে গেল। অনুমান করতে হলো খদ্দের যোগাড় হয়ে গিয়েছে, সুতরাং দমে গেলাম। ঐ গলিটায় শুনেছি রাতে বাজার বসে। কারবারীর ভিড় বাড়ে গভীর রাতে। বিড়ি-মুখে রিক্সায় চড়া এখানে একটি বিলাসের অঙ্গ। ভাবলাম রিক্সাওয়ালা কোন সম্ভ্রান্ত খদ্দের বাগিয়ে ফেলেছে। কিন্তু অনেকক্ষণ ঘণ্টার আওয়াজ শুনছি না। এ তো খদ্দের পাওয়ার লক্ষণ নয়। একবার মনে হলো এগিয়ে দেখি। কিন্তু গলিটার দিকে যেতে সাহস পেলাম না। জানাশোনা কোন লোক যদি দেখে ফেলে তা হলে চরিত্রে চিরকালের জন্য দাগী হয়ে যাবে। দুষ্ট লোকদের কথা কিছুই বলা যায় না। ওরা সুবিধা পেলেই কম বয়সের অনিচ্ছাকৃত ঘটনাকেও টান মারে এবং পুরাতনের সঙ্গে নতুনের যোগ দিয়ে

কেলেঙ্কারীকে রসাল করে ছাড়ে। অবস্থার শাসনে পূর্বোক্ত স্থানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। আবার ঘন্টা বেজে উঠল। এবার দেখলাম, রিক্সা বড় রাস্তার দিকে মোড় ঘুরেছে। রিক্সা খালি। আর কথাটি নয়, চিৎকার করে ডাক দিলাম, 'এই রিক্সাওয়ালা'। ক্ষীণস্বরে উত্তরে এলো,'হাঁ বাবু আসি'। লোকটার চলার গতি এমনই অসুস্থ মানুষের মত যে, আমাকেই মান-সম্ভ্রম পরিত্যাগ করে গাড়ীর দিকে এগোতে হলো। লোকটার চেহারা দেখে গাড়ীতে ওঠা সম্বন্ধেও দ্বিধান্বিত হয়ে গেলাম। একেবারে অস্থিসার, তার উপর খক্ খক্ করে কাশছে। মাথাটাও মাঝে মাঝে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। সন্দেহ রইল না, রাতের বাজারে সস্তার মাল বেশী খেয়ে ফেলেছে। এখন কি করা যায়? দোমনা অবস্থায় যখন দাঁড়িয়ে আছি তখন লোকটা বললে, "ভয় পেয়ো না বাবু, তোমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেব"। উৎসাহিত হবার মত কিছু পেলাম না, বরং মনে হলো কোন মতলব আছে। রিক্সায় একবার চড়াতে পারলেই একটা বদ জায়গায় নামিয়ে দেবে, তখন চরিত্র সামলান একটি সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। আমার ইতস্তত: ভাব দেখে রিক্সাওয়ালার ঠোঁটে মুচকি হাসির ঢেউ খেলে গেল। হাসি সোজা নয়, রাতের বাজারে অনেক খদ্দের ঘাঁটিয়ে শিখতে হয়েছে। বললাম, "আমি যেখানে যেতে চাই ঠিক সেখানে পৌঁছে দিতে হবে।"

গম্য স্থলের নাম শুনে লোকটা আঁতকে উঠল, বললে, "সে যে অনেক দূরে"। বুঝলাম, ভাড়া বাড়াবার একটি প্যাঁচ খেলল। যে অবস্থার ফেরে পড়েছিলাম তাতে নত না হয়ে উপায় ছিল না। জানালাম যা পাওনা তার চেয়ে বেশী দেব। কত বেশী দেব, কি দেব, সে কিছুই জানা দরকার বোধ করল না—খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "বসুন বাবু বসুন"।

রিক্সায় উঠলাম—বসেই আছি, গাড়ী আর চলে না। বলাই বৃথা, ধমকের দাবী কাছে ছিল, হুঙ্কার দিয়ে উঠলাম। যেখানে যেমনটি দরকার, ধমক কাজে লেগে গেল, চাকা চলল, ধীর গতি ক্রমে দ্রুত হয়ে উঠল। মনে মনে বললাম, কেন ন্যাকামি করছিলে বাছাধন।

গভীর রাত, নিঝুম রাস্তা, রিক্সা চলেছে ঠুং ঠুং শব্দ করে। ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুম এসে গেল। রিক্সাওয়ালার পরিশ্রমে কতক্ষণ আরাম ভোগ করে-ছিলাম বলতে পারি না। বসা অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বিঘ্ন ঘটল আচমকা গাড়ী থেমে যেতে। হেঁচকায় রিক্সাওয়ালার উপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম। টাল সামলে দেহের সমভার রক্ষা হবার পর, যখন বুঝলাম অপ-

মৃত্যুর ফাঁড়া কেটে গেছে. তখন লোকটাকে এমন একটি সম্বোধন দ্বারা আপ্যায়িত করলাম যা নিরীহ মানুষের রক্তকেও চঞ্চল করে তুলতে পারে। কিন্তু রিক্সাওয়ালা নির্বিকার।

গালাগালি সম্বন্ধে মানুষ নির্লিপ্ত হলে 'বুমারাঙে'র মত আঘাত নিজের দিকে ফিরে আসে। গাড়োয়ান গাল খেয়েও কিছু না বলায় আমার রাগ আরো চড়ে গেল, কিন্তু উপযুক্তভাবে মনবাঞ্ছা প্রকাশ করায় অসুবিধা ছিল। জনমানবহীন স্থানে চেঁচামেচিতে লোক জড় হলে বিপদে পড়ব আমি। এ-সব জায়গায় চাঁদার মারের ব্যবস্থা নির্বিচারে হয়ে থাকে এবং ভদ্রলোককে পেটাতে পারলে ওরা ভাবে কিছু পুণ্যের ব্যবস্থা হয়ে গেল। এদিকে রাগকে আর ধরে রাখা যায় না, দাঁত কামড়ে চাপা-গলায় বললাম, "গাড়ী নীচু কর, এখানেই নেমে যাব। ছোটলোক, যদি বেশী খেয়ে ফেলেছিস্ ত সওয়ার নিলি কেন? তোকে এক পয়সাও দেব না, হেঁটেই বাড়ী যাব।"

'ভাড়া দেব না' কথাটা যেন তীরের মত গিয়ে বিঁধল। পয়সার কি মহিমা, এক কথায় লোকটার মাতলামি ছুটে গেল। বারকয়েক গলা খাকরানি দিয়ে গাড়ীটানা শুরু করলে। চাকা সামনের দিকে খানিকটা চলে তো আবার আপনা থেকে পিছিয়ে আসে। ওঠানামার উৎপাতে আমার ঘুমের ঘোর একেবারে কেটে গিয়েছে। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি আমরা একটা পোলের তলায় এসে পড়েছি। জায়গাটি চেনা, তবে ভুল রাস্তায় নিয়ে এসেছে। খাড়াই আর ঢালু রাস্তার টানাপোড়েনে আমার প্রাণান্ত অবস্থা। এবার দৃঢ়ভাবেই বুঝিয়ে দিলাম, আমাকে নামতে হবে।

সঙ্গত প্রস্তাব শুনে রিক্সাওয়ালা বললে, "পোলের উপর গাড়ীটা নিতে পারলে আর কোন অসুবিধা নেই, যদি একটু নামেন তা হলে ভাল হয়।"

অন্য সময় হলে ভাবতাম, আব্দার মন্দ নয়। বাবুসাহেব খালি গাড়ী টানবেন আর হেঁটে পরিশ্রান্ত হয়ে পয়সা দেব আমি। উপস্থিত ক্ষেত্রে ওর প্রস্তাব ভাববার বিষয়, লোকটার শরীর যে-রকম তাতে সওয়ারসহ খানিকটা ওঠার পর যদি দম ফুরিয়ে যায় তা হলে সামনের দিকে মুখ রেখে পিছনদিকে গড়াতে হবে। বিপদসঙ্কুল পরিণতি থেকে বেঁচে যাবার আশায় খালি গাড়ী নিয়েই উপরে উঠতে দিলাম। গাড়ী থেকে তখন নেমে পড়েছি, কিন্তু টানাপোড়েনে পুরান চাল শুরু হলো। সামনের দিকের চাকা একটু টানলেই, পিছন দিকে বেশী গড়াতে আরম্ভ করে। বেগতিক দেখে আমিও পিছন থেকে ঠেলতে

আরম্ভ করে দিলাম। শেষ পর্যন্ত রিক্সা পোলের উপর এসে পৌছল। আমি তখন হাঁপাচ্ছি, গলদঘর্ম হয়ে উঠেছি।

ভদ্রলোকের ছেলের রিক্সা টানা পোষায়? একটু জিরিয়ে নিয়ে গাড়ীতে উঠতে যাব, এমন সময় লোকটা বলল, "বাবু, আপনার ওজন বেশী, নামবার সময় আরও কষ্ট। নতুন তেল-দেওয়া চাকা নীচের দিকে টান যদি সামলাতে না পারি তা হলে......" ইঙ্গিত বুঝিয়ে দিল, ঢালুর দিকে গাড়ীতে চড়লে হাসপাতালে যেতে হবে। আমিও মনে মনে ঐরকমটি যে ভাবছিলাম না এমনটি নয়। বিপদ সুনিশ্চিত জেনে দয়া দেখানর সুযোগ ছাড়তে পারলাম না। লাম, "তোর যখন অত কষ্ট হচ্ছে তখন পথটা হেঁটেই যাই। কিন্তু ভাড়ার কথা মনে রাখিস্। যতটা হাঁটতে হলো ততটা হিসাব করে ভাড়া বাদ দিতে হবে।"

হিসাবের কড়াকড়ি শুনে লোকটা কেবল আমার দিকে তাকাল, কিছু বলল না। মৌন সম্মতিতে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিছু খরচ কমল।

আমি পোলের উপর দাঁড়িয়ে রইলাম। রিক্সাওয়ালা খালি গাড়ী নিয়ে চলতে গল। খানিকটা যাবার পর দেখি চাকার গতি বেগবান হয়ে উঠেছে। ক্ষণে ণে গাড়ীর গতি বেড়ে চলেছে। চাকার ফাঁকে রিক্সাওয়ালার চলন্ত পা-দুটোকে খলে মনে হয় কিছু যেন ঠেলা মেরে সামনে এগিয়ে দিচ্ছে! গাড়ী তাড়া রেছে লোকটাকে চাপা দেবার জন্য। দেখতে দেখতে যা আশঙ্কা করছিলাম ই ঘটল। গাড়ী পোলের তলায় পৌছতেই হুড়মুড় করে রাস্তার পাশে ডাষ্টনের উপর গিয়ে পড়ল। লোকটার কি হলো কে জানে। দৌড়বার ক্ষমতা মার ছিল না—যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি গাড়ীটা ডাষ্টবিনের ঠেকায় ড়িয়ে গিয়েছে, আর লোকটা মাটিতে পড়ে গোঁঙাচ্ছে। মুখময় রক্ত কিন্তু ম্পূর্ণ জ্ঞান হারায়নি। কথা বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু উচ্চারণ এমনই শ্লেষ্মাড়িত যে কথা যা বার হচ্ছে তা থেকে কোন মানে ঠিক করা যায় না।

ঘটনাটি ঘটেছিল আলোর কাছেই—পরীক্ষা করে দেখলাম মাথা বা বুক কাথাও জখম হয়নি। কাছে যেতে সুরার উৎকট গন্ধও পেলাম না। তবে কি ক্ত মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে? খক্ খক্ করে কাশি, শ্লেষ্মাজড়িত াসা, তার সঙ্গে ঐরূপ রক্তপাত আমাকে ভাবিয়ে তুলল। এই অবস্থায় লোককে ফেলে যেতে মন চাইল না। মনে পড়ল রাস্তার ওপারে আমার চেনা াক্তারের বাড়ী। পরিচয় প্রাচীন হলেও অনেকদিন দেখা-শোনা নেই, হয়ত আমাকে চিনতে পারবে না। তা হলেও কি একটা মরণোন্মুখ মানুষকে দেখবে না?

রিক্সাওয়ালার দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না। উপায়ন্তর না দেখে তাকে তারই গাড়ীতে বসিয়ে ডাক্তারের খোঁজে রাস্তা পার হলাম। ভুল করিনি, ঠিক জায়গায় পুরান ডিসপেন্সারীর সাইনবোর্ড ঝুলছে। দরজার কড়া নাড়লাম, কারও সাড়া পেলাম না। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের নাম ধরে ডাকতে হলো। গলা ছেড়েই ডাক দিয়েছিলাম। একটু বাদে দোতলার জানালার সামনে ডাক্তারবাবু মুখ বার করলেন। কাতরভাবে জানালাম "তাড়াতাড়ি নীচে আসুন। একজন লোক মরে।"

প্রশ্ন শুনলাম, "রোগী কোথায়" ?

বললাম, "রাস্তার ওপাশে আছে—এখনি নিয়ে আসছি"।

রিক্সাওয়ালাকে তারই গাড়ীতে চড়িয়ে ডাক্তারবাবুর দরজার সামনে নিয়ে এলাম। অপ্রত্যাশিত দৃশ্য ডাক্তারকে অবাক্ করে দিয়েছিল। ভদ্রসন্তান রিক্সা টানে এবং রিক্সাওয়ালা আরোহী হলে অনেক কিছুই ভাবা সম্ভব। হঠাৎ রূঢ় হয়ে উঠলেন। চিৎকারকে সংযমিত সুরে আটকে বললেন, "মাতলামি করবার আর জায়গা পেলে না? তোমার সঙ্গে জানাশোনা না থাকলে এখনি পুলিশ ডাকতাম। আর একটি কথা বলো না, ভদ্রপাড়া থেকে চলে যাও।"

কথা শেষ হতেই সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এর পর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না, রিক্সাওয়ালার কাছে ফিরে এলাম। দেখি লোকটা নিঃশ্বাস নেবার জন্য হাঁপাচ্ছে। কথা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু যা শুনলাম তা জড়ান ভাষায় কোন ঠিকানা। শেষ পর্যন্ত বহু কষ্টে জানাল, "ভাড়াটা আমার রোগা মেয়েটাকে দিও, সারাদিন না খেয়ে আছে।"

এর পর কথা বন্ধ হয়ে গেল। বুঝলাম সব শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন ভাড়া দি কা'কে ?

ভেজাল

অনেকদিন পরে মানিকদার সঙ্গে দেখা। ভিড়ের মাঝে প্রথমটা চিনতে পারিনি, পারার কথাও নয়—দূর থেকে দেখেছিলাম, তার ওপর অদ্ভুত দাড়ি গজিয়ে এমনভাবেই ভোল পালটেছিলেন যে আদালতে হলফ খেয়ে সনাক্ত করায় দ্বিধা আসে। সে কি যে-সে দাড়ি! না আছে কোন ধর্মের ঝাঁঝ, না পাওয়া যায় বয়সের পাত্তা। সে দাড়ি ধর্মপ্রাণ মোল্লার নয়, উদারহৃদয় পাদ্রীর নয়, এমন কি নিষ্কাম সাধুসন্ন্যাসীর ধারেও ঘেঁষে না। তথাপি লোমশ মুখটি বৈশিষ্ট্যের গর্বে গরীয়ান। প্রশ্ন ওঠে বৈশিষ্ট্যটা কি? বৈশিষ্ট্যের জটিলতার পাশ কাটিয়ে আন্দাজের শরণাপন্ন হতে পারলে বলা চলে নব্যপন্থী শিল্পীদের ট্রেড মার্ক। অর্থাৎ আঁটসাট ছাঁদে কাটা দাড়ির মালিককে ধরে নিতে হয় ইনটেলেক-চুয়াল গুণ্ডাদের দলভুক্ত অথবা দাগী শিল্পী যার পেশা হলো জুতসইভাবে বেচারা ধরনের মানুষ পেলেই প্রগতিশীল চিন্তাধারায় দীক্ষা দেওয়া। সংক্ষেপে দীক্ষার ব্যাপারটা ধর্মের সঙ্গে জড়ালে coerced conversion to new faith এ দাঁড়ায়।

জবরদস্ত জ্ঞানপ্রচারের প্রকরণে ঊর্ধ্ব স্তরের আদর্শ বুঝি বা না বুঝি, বিপদের আশঙ্কা থাকায় না হয় মেনে নিলাম প্রেম, যুদ্ধ ও রাজনীতির কূট চক্রান্তে অথবা সরল ভাবাধিক্যে যেমন স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে সবই সঙ্গত, সেইরূপ নয়া কৃষ্টির দোহাই পাড়লে সবই শিরোধার্য। তাই বলে দাদার মত একটি অটল বাস্তববাদী এবং পরম নিষ্ঠাবান বেরসিকও যে স্বপ্নবিলাসী শিল্পীদের খপ্পরে পড়তে পারেন তা কল্পনাতেও আনতে পারিনি। তাঁর স্বরূপ ধরা পড়ল বঙ্কিম মুরারীর মত দাঁড়াবার ভঙ্গী দেখে, তার সঙ্গে ছিল তাঁর নিজস্ব মুদ্রাদোষও যাকে বলা চলে কথাকলি প্রথায় কণ্ঠনৃত্য। সোজা ভাষায় বললে দাঁড়ায়, মাংসপেশীর আড়ষ্টতা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আকস্মিক গলার ঝাঁকুনি। এই সময় দাদার লোলচর্মের আবরণ খেলনার বেলুন-ফোলার মত স্ফীত রূপ নিয়ে হঠাৎ চুপসে যায়। কণ্ঠে অন্তর ও বাহিরের এরূপ কসরৎ একমাত্র মানিকদার পক্ষেই সম্ভব।

এগিয়ে যাচ্ছিলাম ভিড়ের দিকে—হাজার হোক চেনা মানুষ, একটু খোঁজ নিতে হয়। লোকে যাই বলুক দাদার কাছ থেকে মাঝে মাঝে রেস খেলার ভাল টিপ

পাই। সপ্তাহের শেষ শনিবার এগিয়ে এলে দাদার বাড়ীতেও অনেকে ও খবরের আশায় ভিড় জমিয়ে দেয়। ভাবলাম এখানেও গুণগ্রাহীরা খবর কাড়া কাড়ির জন্য জড় হয়েছে। কিন্তু উত্তেজনায় কেমন একটা বিপদের সঙ্কেত পেলাম কথায় বলে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। দেখি, দাদ ভিড়ের ব্যূহে শুধু আটকে পড়েননি, তাঁকে ঘিরে কেমন যেন একটা অস্বস্তিক আপ্যায়নের সাড়া উঠেছে। ধুপধাপ কিলচড়ের শব্দ ত আছেই, তার ওপ শালা সম্বোধন সতেজ হয়ে ওঠায় অনুমান করলাম চাঁদার মাবের দাদন শুর হয়েছে, উৎসব ধুম করেই চলবে।

কলকাতার মত শহরে, বড় রাস্তার বুকে ভিড় করে একটি লোকের ওপর বড় কুটুম্বের দাবি জোর গলায় পেশ করলে ধরে নিতে হয় সম্বোধনের মানুষটি অভিজ্ঞ গাঁটকাটা, বেসামাল হওয়ায় বামাল সমেত ধরা পড়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে আত্ম- শুদ্ধির প্রয়োজন থাকায় কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিরা সমাজের কল্যাণার্থে তড়িৎবেগে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়ে থাকেন। অন্যথায় ভিড়ের দিকে চলন্ত পাহারাওয়ালার দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়াও বিচিত্র নয়, ও দৃষ্টি আবার সকলে সইতে পারে না। কার দোষে কাকে নিয়ে টানাপোড়েন চলবে ঠিক নেই; সুতরাং শান্তিরক্ষার আচরণকে অনধিকার চর্চা বলতে হয় যা দানের পুণ্যে ব্যাঘাত ঘটিয়ে থাকে।

বড় কুটুম্বের চরিত্রশুদ্ধির প্রকরণে যে পরিস্থিতি গড়ে উঠেছিল তাতে ভিড় সরিয়ে ঘটনাটির সঠিক খবর জানবার চেষ্টা করলে জনমতের প্রত্যাশা অনুসারে দাদার মাত্রায় অন্তত একটি শাস্ত্রসম্মত চাঁটি কসিয়ে আসতে হয়, অন্যথায় আমাকেই চোরের মাসতুতো ভাই সাব্যস্ত করে চরিত্রবানরা চাঁটিয়ে সারবে। সম্ভাবনা সুবিধাজনক লাগল না, দূর থেকেই ঘটনাটি দেখতে লাগলাম—দেখার পুরোমাত্রায় সুবিধা না থাকায় অনুমানকে যথাসম্ভব কাজে লাগাতে হলো।

ব্যাপারটা খুলে বলি। চাঁদার মাবে, চাঁটির দানে পুণ্যের পুঁজি বাড়বার প্রতি- শ্রুতি থাকায় ভিড় এত বেড়ে গিয়েছিল যে চাঁটি যার পাওনা সে নাগালে না থাকায় অপাত্রে দানের বহরও বাড়তে শুরু করল অর্থাৎ আড়ালের আশ্রয় পেলেই যে যাকে পারল তাকেই কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত চরিত্র- শুদ্ধির নিষ্ঠায় গলদ এসে পড়ল। তার সঙ্গে স্থানটি বিপদসঙ্কুলও হয়ে উঠল। কার দোষে কে চাঁটি খাবে ঠিক না থাকায় যাঁরা ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনকে কাছে পাওয়ায় জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে বলুন ত ! আহা বেচারা ভদ্রসন্তানকে ঐভাবে ..." কথাটা শেষ করতে পারলাম না।

একেই প্রত্যাগত ভদ্রলোক মায়ের উৎসবে যোগ দিতে পারেননি, তার ওপর দুর্বৃত্ত সম্বন্ধে দবদে চোবানো কথা শুনে ঝাঁঝালো ভাষায় উত্তর দিলেন, "ঐ ঘিখোর হলো কিনা বেচারা! আজকের দিনে মানুষ যখন খেতে পায় না, নগদ দাম দিয়ে একমুঠো চাল কেনার উপায় নেই, রেশন কার্ড হাতে নিয়ে রোদ্দুরে ঝলসে গেলেও কেউ ফিরে তাকায় না, তখন কি না ঐ লোকটা বিনামূল্যে এবং পরমানন্দে ঘি খায়। তাও আবার শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত। 'বিনামূল্যে' কথাটা মিছে বলিনি মশায়, ধারে কিনে দাম না দিলে বিনামূল্যেই বলতে হয়।" আমার সমবেদনাকে বিধ্বস্ত করবার জন্য ভদ্রলোক তেজীয়ান হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর উক্তির পিছনে যে অখণ্ডনীয় প্রমাণ ছিল তাই জানাবার জন্য বলে যেতে লাগলেন, "বিশ্বাস করুন, আমি ঘি-ওয়ালার পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম, ঘটনাটির সবকিছুই নিজের কানে শুনেছি এবং স্বচক্ষে দেখেছি। পান-ওয়ালার দোকানের সামনেই ঘটনাটি ঘটে। আমার আধ-খাওয়া বিড়িটা আবার ধরিয়ে নেবার দরকার থাকায় চিরজ্বলন্ত ঝোলানো দড়ির দিকে এগোচ্ছিলাম। দেশলাই কিনে নেশার পিছনে খরচ আমার ধাতে সয় না, বিড়িটাও পেয়েছিলাম নিখরচায়, এক বন্ধু ভদ্রাচারের খাতিরে দান করে ফেলেছিল। পান-ওয়ালা নির্বিচারে মুখাগ্নির সুব্যবস্থা ঝুলিয়ে রাখার সুবিধাটি কাজে লাগানোর জন্য সবে হাত বাড়িয়েছি, এমনি সময় ঐ দাড়িআলা মানুষটি আমাকে প্রায় ঠেলে দিয়ে দড়ির দিকে ঝুঁকে পড়ল।" বুঝলাম লোকটা আমারই মতন একজন সাধক মিতব্যয়ী, বেওয়ারিশ মালের ওপর দাবি চালাতে এসেছে। বর্বরের স্বার্থ যখন প্রবল হয়, তখন সিদ্ধির পিছনে পাশবিক আচরণই স্বাভাবিক। নিজের আত্ম-মর্যাদা ভেবে লোকটার অগ্রিম দাবি মেনে নিলাম। বিজয়ী দাবিদার বিড়িতে আগুন লাগিয়ে সবে একগাল তৃপ্তির ধোঁয়া ছেড়েছে এমনি সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল। দেখি, একটি পরিপুষ্ট গোহারা মানুষ হঠাৎ পিছন থেকে দাড়িআলাবাবুর কর্ণচুম্বী শার্ট ধরে মারল টান। গলার কাছে কড়া ইস্তিরি থাকায় পরিচ্ছদের ঐ অংশ কতকটা বর্মের কাজ করলেও গলা টিপে ধরার মধ্যে একটা হিসেবের অভিসন্ধি ছিল, যার ফলে দেখা গেল দাড়িআলাবাবু বেশ কাবু হয়েছেন। পুষ্ট লোকটি দু' একটি জোর ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, "বাছাধন, এইবার ধরেছি, আর যাবে কোথায়? যতই ভোল বদলাও, আমার চোখে আর ধুলো দেওয়া চলবে না; তোমার ছাগলদাড়ি, সাধুর জটা, কিংবা Non-violent পরিচ্ছদ কোনটাই ঠগীর মুকুট খসাতে পারবে না।" বক্তব্য শেষ হবার

পরেই গলার উপর যে অধিক চাপ পড়ল তাতে কণ্ঠনালী থেকে এমন একটি ক্ষীণ শব্দ বেরিয়ে এল যাতে ঘটনাটিকে হত্যার পূর্বাভাষ বলেই মনে হয়।

দিনের বেলায় শহরের মাঝ-রাস্তায় গলা টিপে মানুষ মারার প্রদর্শনী একটি প্রমোদাত্মক আকর্ষণের বস্তু। মানুষ জন্মালেই মরে, একটি কোন কারণের অছিলা দেখিয়ে, এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। শান্তভাবে চরম শাস্তির দাবি পেশ করলে অনেক সময় আপত্তিও ওঠে না। বরং শোকপ্রকাশে উৎসবের আয়োজন এসে পড়ে। এটা অবশ্য অনেক সময় ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা, কিন্তু অযথা মার খেয়ে সবসমক্ষে মরার প্রদর্শনী অনেকে আরামপ্রদ মনে করে না। দুর্বল আত্মরক্ষার জন্য বাঁচবার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ওঠে। আততায়ীকে দূরে রাখার জন্য যখন দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে, তখন কাণ্ডজ্ঞান-হীনের দু' একটা ছিটকে-আসা ঘুঁষি আমার ওপর পড়লে বেদনাটা আমাকেই ভোগ করতে হবে। ভদ্রসন্তানের পক্ষে দাঁড়িয়ে মার খাওয়টা সঙ্গত মনে করি না। হাজার হোক আত্মমর্যাদা-জ্ঞান আমার থাকা স্বাভাবিক, কারণ ছেলেবেলা থেকেই আমি শান্ত-প্রকৃতির মানুষ। এ বিষয়ে পিসীমার certificate এখনও আমার Moral strength হয়ে আছে। তিনি চিরকাল বলে এসেছেন—পুঁটির ছেলে (অর্থাৎ আমি) চোর হোক, ছ্যাঁচোর হোক, ছোটলোকের মতন মারপিটের দিকে কখনও ঘেঁষে না। একান্তই মার খেলে ছেলেটা কখনও বা পযন্ত করে না, কেবল চোখের জলেই অভিযোগটা সেরে নেয়।'

এবার চাঁদার মারের কথায় ফিরে আসি। নেহাত কর্তব্যের খাতিরেই লোকটার উপকার করতে এসেছিলাম। ইচ্ছা ছিল, ভিড়ের আড়ালে পিছন থেকে দু' এক ঘা চড় কষিয়ে দিতে পারব। পালোয়ানদের আখড়ায় বলে 'শও ডন এক লপ্টন,' সেই রকম এক শ' উপদেশের কথা যে কাজ করে তাই দুই চাঁটিতে বুঝিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু দানের পাত্রাবচার না থাকায় আমাকেও এক ঘা খেতে হয়েছিল। গত্যন্তরে একটু সরে দাঁড়ালাম। কর্তব্যসাধনে আমি নিজে অপারগ হলেও যেখানে অপরে দুর্বৃত্তকে শাস্তি দিচ্ছে সেখানে বেশ একটা আত্মতৃপ্তি বোধ করি। ঐটুকু সান্ত্বনার লোভে ঘটনার খুব কাছে থাকতে হয়েছিল, কারণ সন্দেহ ছিল না যে লোকটা চোর সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে।

প্রবল শক্তিতে গলা টিপে ধরা সত্ত্বেও কোনদিক থেকে প্রতিবাদ না ওঠায় বলপ্রয়োগের উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে উঠল। পুষ্ট মানুষটি পরের কণ্ঠমর্দনের

ব্যায়ামে গলদঘর্ম হয়ে উঠেছে। ঘটনাটি চলতি নিয়মের ব্যতিক্রম বলেই ধরতে হয়, কারণ যাঁর ওপর পীড়ন চলে তাঁরই নালিশের দাবি থাকে আগে। ঐটুকুই দুর্বলের অবলম্বন এবং সহানুভূতি সংগ্রহে সঙ্গত রীতি। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে ঘটল বিপরীত। দেখা গেল ঘিআলার হৃদয়স্পর্শী অভিযোগে অনেকেরই মন টলেছে। দুঃখের কাহিনী শোনার জন্য অনেকেই প্রস্তুত এবং নিরপেক্ষ বিচারের জন্য উৎসুক। পূর্ব বিবৃতির জের টেনে একজন বললে, "আর কত শুনব? সবকিছু যে ঝিমিয়ে আসছে।" ঘিআলা ভাবলে এখনি দরদকে চেপে ধরতে না পারলে বিচারে গলা টেপাটা দোষ বলে ধার্য হতে পারে। গতিক খারাপ অনুমান করে সে সকলকে মিনতির স্বরে জানাল, "আমার দুঃখের কাহিনী পুরোটা শুনলে বুঝবেন কিভাবে এই দাড়িআলা মুখোশ-পরা লোকটি আমায় ঠকিয়েছে। রেস খেলার লোভ দেখিয়ে নাজেহাল করে মেরেছে। ঘিয়ের ব্যবসা নিয়েই আলাপ। লোকটার নিজের কেনার মুরোদ ছিল না, পাড়ায় কয়েকজন খদ্দের জুটিয়ে দিয়ে ফাউয়ের ভাগটা আদায় করে নিত। ফাউয়ের ওজন আসলের চেয়ে বেড়ে গেলে কিছু বলতে পারতাম না, কারণ কথায় কথায় আমার ভবিষ্যৎকে রাঙা করে তুলত। আস্কারা পেয়ে যখন-তখন বাড়া চড়াও হতে লাগল। বস্তাবন্দী উপদেশের বোঝা নিশ্চিন্ত মনে আমার স্কন্ধে চাপাতে শুরু করল।

"সেদিন শনিবার, ভোর না হতেই দরজায় সাঙ্ঘাতিকভাবে ধাক্কা পড়তে লাগল, যেন পলাতক কয়েদীকে ধরবার জন্য গোয়েন্দার হানা। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম—দরজার হুড়কো খুলতেই দেখি সামনে দাঁড়িয়ে এই সর্বনেশে হিতৈষী। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই আমার মুখের কাছে হাত এনে বললে, চুপ, চুপ! কাউকে কিছু বলো না, ঠাকুরের কাছ থেকে স্বপ্ন পেয়ে ছুটে এসেছি। একেবারে আদেশ, বাজে ঘোড়ায় বাজি মারবে। ধরতো একদিনেই রাজা, না ধরলে আদেশ অমান্য করা হবে। বুঝতেই পারছ, ঠাকুরের কু-দৃষ্টি পড়লে কি হতে পারে?" ঠাকুরের নামে মিথ্যা বলবে এমন কথা ভাবতেই পারিনি, ছাপোষা মানুষ, অভাব ঘরে লেগেই থাকে, ছেলেদের মুখ চেয়ে যা পারলাম তাই দিলাম এই লোকটাকে। হবি ত হ—সত্যই বাজিমাৎ। জিতের সব টাকাই আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে, 'কেমন জাগ্রত ঠাকুর দেখলে ত? তবে এই বাজিই ত শেষ বাজি নয়, ভবিষ্যতে আরও বড় দাঁও মারতে হলে স্বপ্নাদেশের আগেই ঠাকুরের পূজোয় কিছু খরচ করতে হয়, নৈবেদ্যকে শাস্ত্রমতে সাজাতে হলে কি-রকম টাকা লাগে জান ত? তারপর নৈবেদ্যর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুরোহিতের

দক্ষিণাও আছে। সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণ ত চারটিখানি কথা নয়, তার পর জাগ্রত দেবতা নিয়ে কারবার। ভেবে দেখলাম পুরোহিতের মারফত ঠাকুরের কৃপা যদি সহজে পাওয়া যায় ত কিছুতেই ছাড়া নয়। কি করি, জিতের টাকা থেকেই বেশ কিছু ভবিষ্যতের জন্যে এই লোকটাকে দিয়ে দিলাম। কিন্তু পরের ঘটনায় জিতের চেয়ে হারের দিকটাই বাড়তে লাগল বেশী। তারপর এমন সময় এল যখন মন্ত্রপড়া ঘোড়ার টিপ একেবারে বেকার হয়ে গেল। এই বাবু মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলে বলত, 'ঘোড়া দৌড়বার বদলে হাঁটতে শুরু করলে ধরে নিতে হবে পুরোহিত পুজোর মন্ত্রে গলদ এনে ফেলেছে, কিংবা কুগ্রহের প্রভাব ঠাকুরের কৃপাকে দাবিয়ে দিয়েছে। ঠাকুর খুশী হলে তবেই ত বরদানের কথা ওঠে। তোমার খাঁটি ঘিই ত যত গোলের গোড়া। একেই গব্ধি গাওয়া ঘি, তাতে পরিমাণটাও বেশী, লোভসামলাতে না পেরে পুরোহিত বোধ হয় ঠাকুরের সামনেই খানিকটা কাঁচা খেয়ে ফেলে থাকবে। জাগ্রত ঠাকুর, তার চোখের সামনে জানিয়ে-শুনিয়ে চুরি শুধু নয়, ঠাকুরকে উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইয়ে দেওয়া, ঠাকুরের জাত মারা। এত বড় বেয়াদপি কি ধর্মে সয়, কাজেকাজেই তোমার ঘোড়া দৌড়বার বদলে যদি হাঁটতে শুরু করে তবে দোষ দেব কাকে।

"ভেবে দেখুন দেখি, আপনারাই বিচার করুন এই লোকটাকে। খাঁটি গাওয়া ঘি খাইয়েছি। বাপ ঠাকুরদার সময় হলে লোকে বলত জাত ব্যবসায়ে ধর্ম খুইয়েছ। জ্ঞাতি-কুটুম্বদের কাছে এত বড় দুর্নাম রটে যাওয়ার পরেও লোকটার তোয়াজ করেছি। তার বিনিময়ে বলে কি না, সামান্য ঘি দিয়েই এত লম্ফঝম্ফ, তাও আবার দান নয়, কেবল পাওনার দাবি পুষিয়ে দিয়েছে, রেস খেলতে গেলে হারজিৎ আছেই। তাই বলে টিপ সংগ্রহের জন্যে যে খাটুনি হয় তার দাম দেবে না? পেটে ছুরি চালানোর পর রোগী মরে গেলেও successful operation-এর জন্য ডাক্তার পুরো ফি আদায় করে ছাড়ে। পেট কেটে মানুষ মারার জন্য কেউ ত তাকে নরঘাতক বলে না। মোকদ্দমা করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হলেও আইনজ্ঞের উপদেশ দাম দিয়ে কিনতে হয় এমন দাম যার জন্য মাথা পর্যন্ত বিকিয়ে যায়। আর রেসে ঘোড়ায় বাজি হারল, তুমি এলে জিতের টাকা আদায় করতে। বাড়ী চড়াও হয়ে ভদ্রসন্তানকে অপমান করতে তোমার বাধে না?

"তোমার ঘি যে ভেজাল তা পেটুক পুরোহিত না জানুক, আমি ত জানি। ভেজাল নিয়ে এত বাড়াবাড়ি! ভেজালের কথায় প্রতিবাদ করতে গেলে তেড়ে উঠে বলে, থাক থাক, হয়েছে। সকলেই জানে ভেজালটাই তোমাদের কারবারে

খাঁটি জিনিস। সোনায় খাদ না মেশালে যেমন মনোমত গয়না গড়ানো যায় না, গুণী কারিগর বলে, খাঁটি সোনা এত নরম যে পূর্ণাঙ্গী সুন্দরীর ছোঁয়া লাগলেই রূপের তাপে গলতে থাকে। তাই খদ্দের বুঝে বানির দাম কমে-বাড়ে। খাদের কম-বেশী হিসাব ত এখানেই, এটা ওস্তাদ ঘরোয়ানা কারিগরের গোপনীয় সম্পদ যা প্রকাশ্যে সকলেই জানে। ঠিক এভাবেই গয়লার পেশায় দুধে জল না মেশালে উপায় নেই। নিজের ছেলেকে দুধ দিতে হলে খাঁটির সঙ্গে খানিকটা ভেজাল মেশাতে হয় ছেলের স্বাস্থ্য বাঁচাবার জন্য। সুতরাং বুঝতে হবে ব্যবসায়ের লাভের দিকটা দেখতে হলে ভেজালকেই খাঁটি না করে উপায় নেই।"

ঘি-আলার লম্বা অভিযোগের বিবরণে আবার বাধা পড়ল—"এ যে কলেজী লেকচার শুরু করলে। সোজা কথা সংক্ষেপে বল না, ঐ দাড়িআলা লোকটা তোমাকে ঠকিয়েছে এবং এখনি শাস্তি না হলে ভবিষ্যতেও ঠকাবে।" ঘি-আলা উত্তর দিল, "ভবিষ্যতের জন্য কিছু থাকলে তবে ত ঠকাবে।" উত্তরটি মনোমত না হওয়ায় আর একজনকে বলতে শোনা গেল, "ঘিআলার মাথা খারাপ হয়েছে, যা-তা বকছে। চুরির প্রমাণ পেতে সময় লাগবে, এই ঘটনায় অত উদার হওয়া চলে না। ধরা যখন পড়েছে তখন লাগাও শালাকে থাপ্পড।" বিচারের নিষ্পত্তি এবং আদেশ কার্যকরী হতে সময় লাগল না। একজন দাড়িআলার কাছে আসতে না পারায় ঘিআলাকেই সম্বোধন করে বলল, "দাও গলায় চাপ ভাল করে, ও শালা শুধু চোর নয়, দাগী খুনে, নিশ্চয়ই অনেকবার ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে, পেহ্লাদ-(প্রহ্লাদ) মাকা জান, দড়ি দিয়ে ঝোলালেও ও প্রাণ মরে না, টেপো, টেপো, ভাল করে গলাটা টেপো।'

ভক্তির পরিবেশে কীর্তনের সুর ভক্তকে ভাবের ঘোরে নাচিয়ে দিলে যেমন ভক্তির চরম প্রকাশে মানুষ আত্মভোলা হয়ে যায়, তাল বেতাল, সুর বেসুর, নামের মহিমা সবকিছু অজানা অসীমে বিলীন হয়ে যায়, সেইরূপ দুশ্চরিত্রকে আদর্শ চরিত্রের পর্যায়ে তুলতে গিয়ে সকলেই আপনভোলা হয়ে গেল। মারের বিধানে কোন নিয়ম রইল না। দাড়িআলা বাবুর আত্মা যে ইতিমধ্যে দেহত্যাগের আয়োজন চালিয়েছে তা কারও নজরে পড়েনি। ধরা পড়ল লোকটার সারা দেহের কাঁপুনি থেকে। ক্রমে হাঁটু মোচড় খেতে লাগল, গলা দিয়ে ঘর্ ঘর্ শব্দ বার হতে লাগল, দৃষ্টিও অর্ধনিমীলিত। লক্ষণগুলি সহজ-বোধ্য হওয়ায় ভোজবাজির খেলার মত ভিড় যেন উবে গেল। যিনি এতক্ষণ

প্রধান সাক্ষী হিসেবে আমার সামনে ঘটনার বিবৃতি দিচ্ছেলেন, তিনিও কি ভাবে অকস্মাৎ অন্তর্ধান করলেন বুঝতে পারলাম না।

ভিড় কেটে যেতে দেখলাম দাদা চিৎ হয়ে রাস্তার উপর পড়ে আছেন; মুখ আকাশের দিকে থাকলে কি হয়, আধখোলা চোখ গিরগিটির মত মুখ না নাড়িয়ে আশেপাশে দৃষ্টি চালিয়ে চলেছে। মারের বহর পানওয়ালা দেখেছিল— লোকটা এই অবস্থায় পড়ে আছে দেখে আড়াই ফুট চওড়া দোকানের মঞ্চ থেকে নেমে এলো লোকটা মরেছে কি না দেখবার জন্যে। দোকানের সামনে এবং অত কাছে একটা লোক মার খেয়ে মারা পড়লে পুলিশ দোকানদারকে জবরদস্ত সাক্ষী করে সারবে। আদালতে টানাপোড়েন ছোটখাটো দোকানীর পক্ষে একটি আতঙ্কের বিষয় তাই পরীক্ষার তাগিদকে সে অবহেলা করতে পারল না। বুকের উপর কান রেখে পানওয়ালা নিশ্চিন্ত হলো হৃদ্‌যন্ত্রটি খাশা চলেছে, আর ভয়ের কারণ নেই।

পানওয়ালার দয়াল হৃদয় দেখে দাড়িআলা বাবু জড়ানো ভাষায় জানালেন তিনি তৃষ্ণার্ত। দাড়িআলা বাবুকে এখন থেকে দাদা বলে সম্বোধন করা যাক। দাদা যে অবস্থায় পড়েছিলেন তাতে তৃষ্ণার্ত বললে মহা পাষণ্ডকেও দয়া প্রকাশ করতে হয়। কিন্তু পানওয়ালা ঝানু ব্যবসাদার। একধার থেকে কোকোকোলা, অরেঞ্জ ক্রাস, পাইন আপেল ইত্যাদি বোতলস্থ বিভিন্ন পানীয়ের দাম জানিয়ে দিল। দাদা বললেন, 'কোকোকোলা'। যথাসময়ে শোষণ-কাঠি সহ কোকোকোলা তার কাছে উপস্থিত হলো। দাদা তখন উঠে বসেছেন। তাঁর পাশেই দেখলাম একটি সুদৃশ্য সাহেবী চালে বাঁধা চতুষ্কোণ পুলিন্দা, মনে হয় দুর্লভ মহামূল্য কিছু ওর ভিতরে আছে। উঠে বসেই দাদা যেভাবে পুলিন্দার উপর হাত রাখলেন এবং সাবধানে নিজের কাছে টেনে নিলেন, তাতে ধারণা করা চলে যে বাহারে পোঁটলার ভিতরে ছবি আছে। দাড়ির সঙ্গে যোগ রাখতে হলে এ ধারণা পাশ কাটাবার উপায় নেই। দাদা ছবি আঁকেন! রহস্য আমাকে কৌতূহলী করে তুলল। এক পা, দু' পা করে দাদার কাছে এসে পৌছলাম এবং কিছুই না জানার ভাণ করে জিজ্ঞাসা করলাম, "রাস্তার মাঝখানে বসে পড়েছেন, আছাড় খেয়েছেন বুঝি, বড্ড লেগেছে?" দাদা ধরে নিলেন আমি কিছুই জানি না। আমার প্রশ্ন শুনে উত্তর দিলেন, "দরদের কথা বাদ দিয়ে কোকোকোলার দামটা চুকিয়ে দাও। ছোট রেজকী যে আমার কাছে থাকে না সে খবর কি রাখো না?" কথাগুলো উঁচু গলায় বলেছিলেন পানওয়ালাকে শোনাবার দরকার ছিল।

কি দুর্ভোগ! কাছে আসতেই গুনাগার। কোকোকোলার দাম আমাকে কেন দিতে হবে বুঝলাম না। আকস্মিক আদেশ এবং অশোভনীয় প্রত্যাশায় অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর প্রতিবাদের জন্য মন দৃঢ় হয়ে উঠল। কয়েকটা কড়া কথাও সংগ্রহ করে ফেলেছিলাম। কিন্তু শাস্ত্র মানতে হলে অপ্রিয় সত্যকে আসল রূপে প্রকাশ করা নিষেধ। ভব্যতাও দেখছি ভেজালের খুঁটি না পেলে সভ্যসমাজে চালানো দায়। অবশেষে, রাগ চাপা দিয়ে পকেট হাতড়াতে লাগলাম। একেই ত দাদার আছাড়-খাওয়া মেজাজ, তার উপর চাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুললে হয়ত তেড়ে উঠে প্রমাণ করে দেবেন, টাকাটা আমার পকেটে আছে বলেই তাতে আমার অধিকার-স্বত্ব জন্মায় না এবং স্বত্ব কোনো প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হলেও অর্থনীতির প্রত্যাশা অনুসারে টাকাটা চালু থাকা দরকার; কোন বিশেষ পকেটে দম বন্ধ হয়ে মরবার জন্য টাকার জন্ম টাঁকশালে হয়নি। পকেট হাতড়াবার দিকে দাদা কড়া দৃষ্টি রেখেছিলেন, খুব সম্ভবতঃ ধরে নিলেন খুঁজে-পেতে আমি নেই বলবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি—সূক্ষ্মানুভূতির সাহায্যে আমার দেউলিয়া পকেটের গোপনীয় খবর পেয়ে গিয়েছিলেন। কুঞ্চিত ভ্রূ ঊর্ধ্বে তুলে বললেন, "মনে হচ্ছে অতগুলো টাকা সব খরচ করে ফেলেছ, পকেট হাতড়ে যেভাবেই আত্মস্তোক যোগাড় কর, আমি জানতাম ওটা দোষস্খালনের পুরাতন চাল, অভ্যাসটি মর্মে গাঁথা, ও কি উপদেশে পোষ মানে!"

দাদার সঙ্গে আমার কালে-ভদ্রে দেখা হয়, পথ চলতে দূর থেকে 'কেমন আছেন' বলাতেই ঘনিষ্ঠতার শেষ। ঐটুকুর সুবিধা নিয়েই মনগড়া সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে এমনভাবেই বিরক্তি প্রকাশ করলেন যে পানওয়ালা ঠিক করে নিল দাদা সব সময় মোটা টাকা আমার জিম্মায় রাখেন; নিশ্চয়ই তিনি কৃপণ স্বভাবের মানুষ, স্বদেশীয়ানার প্রভাবে পড়ে বিড়ি খাওয়া ধরেছেন। স্বদেশী ধোঁয়ায় একবার প্রাণ মজে গেলে গঞ্জিকা ভিন্ন অন্য কিছুতে মন টলে না, রাস্তার-ঘাটে ভদ্রলোকের ছেলেও গাঁজায় দম দিতে পারে না। যাই হোক, কোকোকোলার দাম দেবার কথায় আর পকেট হাতড়ানো দেখে পানওয়ালা ঠিক করে নিল খোঁজার প্রদর্শনী একটা ধাপ্পার প্যাঁচ, অথবা এও হতে পারে সেয়ানায় সেয়ানায় বোঝাপড়া করতে গেলে কোন্ ইসারায় কি চাল চালে তা সহজ বুদ্ধিতে বোঝা শক্ত। কোকোকোলার দামটা শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে ত বিলম্ব দেখে পানওয়ালা কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে

রইল। লোকটার দৃষ্টির ডগায় যেন ধারালো বল্লম লাগানো ছিল। চেহারাটা আরও ভীতিপ্রদ। একেবারে পেশাদার জোয়ান। পালোয়ানের মতন দেখতে, কান দুটো তোবড়ানো, গর্দান ষাঁড়ের মত, বুক কবাটের মত চওড়া, তাও আবার চিতিয়ে আছে যেন এই মারি তো এই মারি ভাব। এই ধরনের লোকের সঙ্গে কোন লেনদেনের কারবার আমি মোটেই পছন্দ করি না। ভিতরটা তখন ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়ছে। ঐ দৃষ্টির তাড়না থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় কায়মনোবাক্যে ভিন্ন পকেট হাতড়াতে লাগলাম। একেই পুরনো কোট, তায় একদিককার পকেটের সেলাই ছেঁড়া, তার উপর জোর তদন্তের তাগিদে ছিদ্রদ্বার আরও উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। উত্তেজিত সন্ধানের চেষ্টায় দুমুখো পকেট থেকে একটি এক টাকার মোচড়ানো নোট গোড়ালির কাছে পড়ে গেল। এই টাকাটি খুঁজে পাওয়ার জন্য কাল নাজেহাল হয়ে গিয়েছিলাম। নিষ্পেষিত সেলাইয়ের খাঁজে কিভাবে নোটটা ঢুকে গিয়েছিল, কাছে ঘেঁষতে পারেনি। পকেটের সুড়ঙ্গপথ দিয়ে নোটের আবির্ভাব ও পতন দাদার নজরে আটক পড়ল। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ধনুষ্টঙ্কারের মত দাদার ঠোঁটে বাঁকা রেখা দেখলাম। বক্র হাসিতে যেন খোলা তলোয়ার ঝলসে উঠল। কালবিলম্ব না করে দাদা কতকগুলো কথা যেন চিবিয়ে আমার দিকে ছুড়ে মারলেন—"টাকা যে দেখছি পকেট থেকে উপচে পড়ছে, নোটগুলো নিজের নয় তাই বুঝি এত দরদ। এ-বিষয়ে পরে কথা বলব, এখন দামটা চুকিয়ে দাও।" গ্রহের ফেরে যে অবস্থায় এসে পড়েছিলাম তাতে টাকা কাকে দেব ভাববার সময় ছিল না। বচসা এসে পড়লে দাদা কি বলতে আরো কি বলবেন তার ঠিক নেই। সত্যকে প্রমাণ করতে গেলে তুমুল কাণ্ড বেধে যাবে। অধিকতর দুর্ঘটনাকে নিমন্ত্রণ পাঠানোর চেয়ে দামটা দিয়ে ফেলাই ভাল। নোটটি পানওয়ালার হাতে দিয়ে ফিরতি রেজকির জন্য অপেক্ষা করছি, এরই ভিতর দাদা পুঁটলি পিঠে ঝুলিয়ে প্রায় সামরিক প্রথায় উল্টোদিকে মুখ ফেরালেন। তারপর বললেন, "অতগুলো টাকা নিশ্চয়ই খরচ করে ফেলেছ। পরের টাকায় হিসেব রাখা রোখা তোমার ধাতে সয় না, নিজে কখনও উপায় করলে না ত, যাই হোক, তোমার দিল দরিয়া খরচের দিকে এবার থেকে নজর রাখতে হবে।" দাদার কথা শুনে একটু রুখেই আরো এগিয়ে গিয়েছিলাম। আমার উদ্দেশ্য বুঝে দাদা বললেন, "থাক্, থাক্, এখন আর খরচের অজুহাত দিতে হবে না, বেজায় তাড়া, আমি চললাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে হবে। ওখানে বিদ্যার আড়তদাররা এতক্ষণে জমা হয়ে গিয়েছে, অচল dead stock নিয়ে

সকলেই কাবু, বুদ্ধিমন্থনে হুল্লোড় চলেছে, আমি না যাওয়া পর্যন্ত হলাহল গিলে ফেলার সাহস কারো আসবে না। বুদ্ধির গভীর তলে যে রত্নসন্ধানে ঘুরতে পারে সে ত এই শর্মা।"

দাদার বোলচালে আমি অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম, ভাবলাম লোকটা শেষ পর্যন্ত পাগল হলো নাকি, বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবেন, বলে কি! আমার মুখ দেখে প্রথমটা দাদা ভড়কে গিয়েছিলেন, পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বললেন, "তোমরা যা ভাব বা যতটা ভাবতে পার তা আমার অজানা নেই, তবে আমি যে-সব কথা বিশ্ববিদ্যালয়ে বলতে যাচ্ছি তা তুমি বুঝবে না—আর্টের কথা, যা আধুনিকদের মতে ইনটেলেক্টের বাইরে, সব বিশ্বাসে ঘেরা উপলব্ধির বস্তু। বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলতেই অবাক্ হয়ে গিয়েছিলে, সেখান থেকেই আবার সন্ধ্যেবেলায় International Art-এর Seminar Academyতে আছে, আমিই সেখানে প্রধান বক্তা, কারণ সকলেই জানে quotation এর আড়াল থেকে আমি নিজের অজ্ঞতাকে বাঁচাবার চেষ্টা করি না। পণ্ডিতের খেতাব নিয়ে পরের বুদ্ধির মোটও বই না, আমি যা বলি ত বুঝেই বলি এবং এই বোঝাটা নিজের মস্তিষ্কের ব্যবহারে হয়, পরের দেওয়া পুনরাবৃত্তি নয়। যাক, এ-সব কথা তোমাকে বলে লাভ নেই, তুমি বুঝবে না, মিছে সময় নষ্ট।" চরম কথা শেষ হবার পর আমাকে বোকা বানিয়ে দাদা দ্রুতগামী পদক্ষেপ সামনে এগিয়ে দিলেন। কৃষ্টির দলন-মলনের জন্য দাদার লম্বা পা দুটো যেন উটপাখীর মত চালে ছুটতে লাগল।

দাদা দেবেন আর্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা, তাই শুনতে আসবে খেতাবপ্রাপ্ত বিদেশী বিদ্বান্‌রা। Seminar-এ প্রগতিশীল নয়া চিন্তাধারার সঙ্গে প্রাচীন আদর্শের মতদ্বৈধতা কোথায় তারই বিচার ও বিশ্লেষণ হবে। শুধু বিশ্লেষণ নয়, নতুন ও পুরাতনের সংঘর্ষণ লাগিয়ে দিয়ে এমন একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ তত্ত্বের আবিষ্কার হবে যাতে যাবতীয় বিস্ফোরণের মধ্যেই শান্তির ধ্বজা উঠবে। কিন্তু বে-এক্তিয়ার বুদ্ধির বোমা ফাটলে যাদের বিচারশক্তি বেকাব হয়ে যাবে তারা শান্তি নিয়ে করবে কি? এ-সব বিষয়ে বেশী ভাবতে গেলে আমাকেই ডাক্তার-বাড়ী ছুটতে হবে মাথার চিকিৎসার জন্য। দাদাকে অনুসরণ করবার ইচ্ছা থাকলেও নিজেকে সংযত করলাম। ইতিমধ্যে, মলিন ও দলিত নোটটি তখনও পানওয়ালার নির্দয় পরীক্ষায় মোচড় খাচ্ছে। উল্টে-পাল্টে আলোর বিপরীত দিক থেকে দেখেও লোকটা সন্তুষ্ট হতে চায় না। পরীক্ষার পীড়নে নোট জর্জরিত হয়ে যাবার পর পানওয়ালা ভাঙা বাঙলায় বললে, "এ নোট ত বাজারে কই লিবে না, মালুম

হইতেছে এ জাল আছে, তবে হামারা জানপয়চান আদমি আছে যে চালু করিয়ে দিতে পারে, মগর উও কাম ভিত মুশকিল কো হ্যায়, পুলিশ দেখিয়ে ফেলে ত আপকো ভি ছোড়বে না। আপ ভদ্র আদমি আছে, আউর হাম ভি রোজ ভগবান্‌কো নাম লিয়ে থাকি, উসি লিয়ে বলছে এদিক-ওদিক কিছু দিয়ে দিলে নোটটা চলিয়ে যাবে। কমসে কম টাকায় চার আনাসে কমতি হবে না, ত আপনি ভাবিয়ে লিন ওটা বাটা।"

ব্যবসা-বুদ্ধির প্রখরতা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। টাকায় চার আনা বাটা! প্রথমটা ভেবেছিলাম দরকার নেই, বলি নোটটা ফেরত দাও, কিন্তু জাল নোটের কারবারে আমাকে জড়িয়ে দেওয়ায় পুলিশের ভয়ে আমি আতঙ্কিত হয়ে গিয়েছিলাম, তার ওপর পানওয়ালা যে-রকম জোয়ান তাতে ওর কাছ থেকে নোটটা কেড়ে নেবারও উপায় নেই। গত্যন্তর বলতে হলো, 'তথাস্তু'। এখন ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি, যা পাওয়া যায়, তাই লাভ। পানওয়ালাকে জানালাম বেজকির ফেরতটা তাড়াতাড়ি দিতে।

বেআইনী ব্যবসায়ে লোকটা কত টাকা জমিয়েছে কে জানে? এইভাবে অর্থসঞ্চয়কে নিশ্চয়ই সদাচার বলা চলে না। মনকে স্তোক দিলাম এই ভেবে যে, পাপী যেভাবেই নিজেকে ভগবানের নাম নিয়ে প্রশ্রয় দিক, আশল ধর্মের ঢাক বাজলেই খানাতল্লাসী আরম্ভ হয়ে যাবে। তখন গণেশ ওল্টালে বাছাধনের আজকের ঘটনা মনে পড়বে। ভবিষ্যতের সুবিচার কামনা ছাড়া প্রকাশ্যে কোন অভিশাপ দেওয়ার সাহস [illegible] ছল না। টাকায় চার আনা বাটা মেনে নেওয়ার পর নোটটি একটি ছিদ্রযুক্ত কাঠের বাক্সে স্থান পেল, তারপর পানওয়ালা সামনের পিতলের বাটি থেকে এক মুঠো নয়া পয়সা তুলে নিয়ে গুণতে লাগল। পানওয়ালার ঘর থেকে যা বার হয় তা একাধিকবার না গুণলে চলে না। কোকা কোলার দাম বাদ দিয়ে শেষ পর্যন্ত হিসাব আট আনাতে দাঁড়াল। পানওয়ালা নিশ্চিন্ত মনে তাম্রখণ্ডগুলি আমার হাতে তুলে দেওয়ার আগে অনেকগুলি বিঘ্ন ঘটে গেল। দেখলাম পান বিড়ি বিক্রয় তার একটা অছিলা, আসলে বড় ব্যবসা থাকে গোপনে কোন্ রাস্তায়, কোন্ বাড়ীতে কখন কোন্ প্রয়োজনীয় মানুষের সঙ্গে দেখা হতে পারে সে খবর পানওয়ালা রাখে এবং উপযুক্ত মানুষের চাহিদা অনুসারে খবর দিলে সঙ্গে সঙ্গে বেশ মোটা কিছু লাভ হয়ে যায়। খবর দেওয়ার দায়িত্ব ছাড়া ছোটখাটো বন্ধকী কারবারেও লোকটার হাতযশ আছে। অগ্রিম সুদ নিয়ে দেনাদারকে অর্ধেক টাকা দিয়ে পুরোর হিসাবে সই করিয়ে নেয়।

স্বোপার্জিত একটি গোটা হারানো টাকা ফিরে পেয়েও তার দুরবস্থা দেখে মন দমে গিয়েছিল। বাড়ী ফেরাও চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল। মাত্র দশ কি বারো আনা পুঁজি, তাই দিয়ে গোটা সংসারের বাজার সামলানো অসম্ভব; সুতরাং বাড়ী ফিরতে হলে হেঁটেই সারাটা পথ শেষ করতে হবে। অফিস বন্ধের লগ্নে ট্রাম বা বাসে স্থান পেতে হলে ভগবানের বরপুত্র হতে হয়। এ দিকটায় বরাবর দেখেছি তাঁর পক্ষপাতিত্ব অন্যদিকে। ট্রাম বা বাসের ভিতরে স্থান না পেলেও ফুটবোর্ডে দাঁড়ানো চলে, এবং লিখিত আইন না থাকলেও সকলেই জানে বিপদসঙ্কুল স্থানটিতে দাঁড়াবার জন্য ভাড়ার দাবি নিষিদ্ধ। মানলাম, ভাড়ার খরচটা না হয় বাঁচল, কিন্তু ফুটবোর্ডে দাঁড়ালে ঝাঁকুনির সঙ্গে মাটিতে গড়াবার ইচ্ছে না থাকলে দেহের সমভার রক্ষার জন্য দুটো হাতই জোড়া রাখতে হয়। সেই সময় নয়া পয়সার ওজনে ভারগ্রস্ত দুমুখো পকেটকে সামলাবে কে? চৌরঙ্গীর কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম, চতুর্দিকেই কেবল চলন্ত গাড়ি আর মানুষ, আমিই কেবল ফুটপাথের প্রান্তে অচলায়তন হয়ে গিয়েছি। কিভাবে বাড়ী পৌঁছব তাই ভাবছি এমনি সময় তীর্থযাত্রিপূর্ণ প্রাচীনকালের একটি থার্ড ক্লাস বন্ধ গাড়ী আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। মোড়ে লাল বাতি জ্বলে ওঠায় সব গাড়ি থেমে গিয়েছিল। সামনের পাল্কি-গাড়ি মানুষে ঠাসা, ছাদ কিংবা ভিতরে মানুষের স্থান নেই, এরূপ প্রত্যাশাও অন্যায়, কারণ মাথা-পিছু ভাড়ার সর্ত না থাকায় একজনের কোলে আর একজন চেপে বসেছে। দূর দেশের গ্রাম থেকে ওরা এসেছে কলকাতার তাজ্জব শহর দেখতে। শহর দেখার সঙ্গে গল্পগুজব ও চানা খাওয়া চলছিল। এই কারণেই বোধ হয় পিছনের সহিসের জায়গায় কেউ বসে নি। জায়গাটি যেন আমার জন্য খালি ছিল। বিচার করে দেখলাম এর চেয়ে আরামপ্রদ ভ্রমণ আশা করা উচিত নয়। এখন কোন প্রকারে গাড়োয়ানের দৃষ্টি এড়িয়ে যথাস্থানে বসে পড়তে পারলেই হয়। এরূপ চোরাই আরাম, বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো ছোট ছেলেরাই নিয়ে থাকে। কিন্তু আমাকেও অবস্থার ফেরে শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকতে হল। গাড়ীটা যাচ্ছিল কালীঘাটের দিকে, অনুমান ভুল নয়—কারণ সকলেই তীর্থযাত্রী। সকলের কপালেই মোটা তিলকের দাগ, কালীঘাট যেতে হলে ভবানীপুর পার হতে হবে। ঐদিকেই আমার মেসের বাসা। উঠে তো বসলাম, কিন্তু আশঙ্কা পিছু নিয়ে রইল। থার্ড ক্লাশের গাড়োয়ানেরা বেজায় ধূর্ত মানুষ, চোখ না থাকলেও দেখে। অনুভূতি অদৃশ্যকে প্রত্যক্ষ করিয়ে ছাড়ে। গাড়ি যেভাবেই বোঝাই

হোক, চালাক গাড়োয়ান বাড়তি মানুষের ওজন ঠিক বুঝতে পারে। আমার মত ভদ্রসন্তান আত্মমর্যাদা খুইয়ে সহিসের আসনে বসলেও পরিত্রাণ নেই! আন্দাজেই সব দেখে চাবুক চালিয়ে দেয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে রক্ষা এই যে, ঘোড়ার বদলি মানুষকে মারতে গেলে কয়েকজন ছাদের যাত্রীর কপালেও চামড়ার চাবুক ছুঁয়ে যাবে। দেউল থেকে পাওয়া সিঁদুরের তিলকে অস্পৃশ্য চামড়ার ছোঁয়া লাগলে একটা হৈ চৈ বেধে যাওয়া সুনিশ্চিত। এতএব গাড়োয়ানের ইচ্ছা থাকলেও চাবুক চলবে না।

আরামেই যাচ্ছিলাম, তবে মাঝে মাঝে দৈত্যের মত বিশালকায় ডবল ডেকার বাসগুলো চাপা দেবার জন্য তেড়ে এলে ভগবান্‌কে স্মরণ করতে হচ্ছিল। পুরোহিত মারফত through proper channel আবেদন পাঠালে খবর পৌঁছবার আগেই red tapism-এর আইন চাপা পড়িয়ে ছাড়ত। কিন্তু direct appeal-এ ফল ভালোই পাওয়া গেল। বেঁচে গেলাম। বাড়ীর মত গাড়িগুলো পাশ কাটিয়ে চলে গেল। রাস্তা আর ফুরোতে চায় না, পিছনের যত গাড়ি আমাদের ফেলে এগিয়ে চলেছে। এই ত হ'ল থার্ড ক্লাস ছ্যাকরা গাড়ির বৈশিষ্ট্য, তবে পিছিয়ে থাকলেও চলে এবং কোন প্রকারে গন্তব্য স্থানে মাটির ঠিকানায় পৌঁছিয়ে দেয়। দ্রুতগামী নয় বলে অভিযোগ করা চলে না। দানা-হীন হাড় বের-করা ছাগলের মত ঘোড়ার ওপর চাবুক চালালে গতির কিছুমাত্র প্রভেদ হয় না। যাই হোক, আমিও ধীরে সুস্থে তাজ্জব শহরের নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেলাম। চৌমাথার মোড়ে আসতেই লালবাতির সাঙ্কেতিক নির্দেশে সব গাড়ির চলৎশক্তি অসাড় হয়ে গেল। সামনে বোধ হয় কোন একটা accident ঘটেছিল। অচিরাৎ নীল বাতি জ্বলার কোন আশা না থাকায় আমার আসন থেকে নেমে পড়লাম। যেটুকু সময় গাড়ি থেমেছিল তাতেই কয়েকটি ডেঁপো ছোকরা আমাকেই সহিসের আসনে বসা দেখে হেসেই লুটোপুটি। ওদের ভ্রূক্ষেপ করিনি, এমনি সময় চাবুকের ডগা গাড়ির পাশ থেকে আমার মুখের কাছে এসে পড়ল। বুঝলাম এটা গাড়োয়ানের অভ্যাস-দোষ, দ্রুত নেমে পড়ে একটু নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছানোর পর মনে হয় আর একবার চাবুক চালালে গাড়োয়ানকে একবার দেখে নিতাম। পুলিশের দৃষ্টি টেনে এনে লোকটাকে জানিয়ে দিতাম লাভের টাকা বাড়ানোর জন্য যত খুশী সোয়ারি নেওয়া চলে না। জানোয়ার হলেও ঘোড়ার বহন-শক্তির একটা সীমা আছে, তার বাইরে ওজন চাপালে আইনের

খপ্পরে পড়তে হয়। গাড়োয়ানকে শাস্তি দেওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে অনেকটা এগিয়ে এসেছিলাম। বিবেচনা করে দেখলাম চাবুক আমার মত সোয়ারিকে লক্ষ্য করে চালালেও আমার মুখে ত লাগেনি, সুতরাং এই নিয়ে কোন ঝামেলা না করাই ভাল।

॥ ২ ॥

পরের দিনের কথা। মশা আর ছারপোকা সারারাত গা ঘেষে থাকায় ওদের ইচ্ছামত কামড়ে ভাল ঘুম হয়নি। শেষরাতে উৎপাত সহ্য করতে না পেরে ঘরের সামনের রোয়াকে মাদুর নিয়ে এসেছিলাম মুক্ত আকাশের তলায় ঘুমের ব্যাঘাতটা পুষিয়ে নেব বলে। আমাদের রোয়াক একটি নিরিবিলি গলির ভিতর, এমন রাস্তা যে কালে-ভদ্রের ময়লা-ফেলা গাড়ি ছাড়া অন্য কোন যান এদিকে চলে না। তবু গলির একধারে ফুটপাথ আছে। ফুটপাথের গায়ে-লাগা আমাদের রোয়াক, লম্বা-চওড়ায় তেমন কিছু নয়, তবে কয়েকজন মিলে বৈঠকি আসর সরগরম করে তোলা যায়। সমস্ত দিন অফিসের খাটুনির পর সন্ধ্যার দিকে ক্লান্তি লাঘবের জন্য ওইটুকু আমাদের সম্বল। মুখরোচক ভাষার সহযোগে পরকীয়ার আলোচনায় আমরা কৃষ্টির সাধনা করে থাকি। নিরীহ উত্তেজনার সময়টা কাটে ভাল।

যথাস্থানে এসে দেখি রোয়াক বেদখল হয়ে গিয়েছে, গৃহহীন ভবঘুরের দল দিব্যি নিজেদের শোবার ব্যবস্থা করে পরমানন্দে ঘুমের ঘোরে বিভোর হয়ে আছে—অতিথি-সেবার জন্য গভীর রাত্রে গৃহস্বামীকে অযথা বিরক্ত করেনি, অনাহূত অতিথিদের কৃপায় সমস্ত রোয়াকটাই প্রায় ভরে গিয়েছে, যেটুকু জায়গা খালি ছিল তাও পাড়ার ঘেয়ো কুকুরটা নিজের ব্যবহারে লাগিয়ে নিয়েছে।

অন্নসন্ধানী জানোয়ারটা পাড়া ঘোরায় ক্লান্ত হয়ে পড়লে আমাদের রোয়াকে এসে শুয়ে পড়ে। মেসের সকলেই তা জানে, কেউ আপত্তি করে না বরং আহারের পর উচ্ছিষ্ট যা থাকে তা কুকুরটাকে ছুড়ে দেওয়া হয়। এই কারণে আমাদের বাসার অনেককেই কুকুরটাকে আশ্রয় দিয়ে আমাদের অনেক উপকার হয়েছিল। বস্তির লোকেরা জানোয়ারটিকে পাগল সাব্যস্ত করেছিল, কারণ স্থানীয় টলায়মান মাতাল রোয়াকের দিকে আসছে দেখলেই কুকুরটা আর্তনাদ করে উঠত। মাতালও বেরসিক ভেবে নিজের টলা পা-কে ভিন্ন দিকে টলিয়ে দিত। কুকুরটা অজ্ঞাতে আমাদের উপকার করলেও আজ ওর উপস্থিতি মোটেই ভাল লাগল না, নিদ্রারত মানুষদের জাগিয়ে তুলে আমার অধিকারের কথা

বসতে সাহস পাইনি। রোয়াকে ওদের বেআইনী দখলের কথা তুললেই বলে বসবে রাস্তার ধারে রেলিংহীন রোয়াক মানেই ক্লান্ত পথিককে বিশ্রামদানের স্থায়ী আমন্ত্রণ। বিশ্রামের আরামে যদি অবসাদগ্রস্থ মন শরীরকে শুইয়ে দেয় তা হলে শয়নকে ক্লান্তের ন্যায্য পাওনা বলে মানতে হয়। মোক্ষম যুক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা চলে না, কারণ ঘুম ভাঙালেই ওরা দলবদ্ধ হয়ে আমাকে বলপ্রয়োগে আমার অনধিকার চর্চার কথা বুঝিয়ে ছাড়বে।

কুকুরটা আমার উপস্থিতি জানতে পেরে চেনা লোকের কাছ থেকে আদরের আশায় লেজ নাড়তে লাগল। ঘায়ে-পচা লেজ পায়ের ওপর দুচারবার আছাড় খেতে অস্পৃশ্যের ছোঁয়ায় গা ঘিন ঘিন করে উঠল। দিলাম কষিয়ে একটি মনোমত লাথি। কুকুরটার আর্তনাদ করবারও শক্তি ছিল না, পিঠের ওপর সজোরে পদাঘাত পড়তেই 'কুঁক' করে উঠে দূরে পালাল।

যাক, শেষ পর্যন্ত শোবার একটু জায়গা পাওয়া গেল। পা ছড়াবার স্থান না থাকলেও মাদুরের ওপর গা এলিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রাবেশে অভিভূত হয়ে পড়তে লাগলাম। সবে বয়েস কমানো স্বপ্নের এলাকায় এসে পৌঁছেছি, এমনি সময় শূন্য থেকে সবেগে একটি হাওয়াই চটি আমার মুখের ওপর এসে পড়ল। ওজনহীন মারে চোখ খোলার আগেই বুঝলাম খবরের কাগজ পৃথিবীর বার্তা বহন করে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

খবরের ডাকে উঠে বসতে হলো। তখন সকাল হয়ে গিয়েছে, প্রত্যহ কাগজ-ওয়ালা চলন্ত বাইসাইকেল থেকে এইভাবে রোয়াকের ওপর দৈনিক পত্রিকাটি ছুড়ে ফেলে দেয়। এটা কি কাগজ-বিক্রেতার সুবিধার কথা, তৃতীয় ব্যক্তির প্রশ্ন করবার অধিকার নেই। বাইসাইকেল থেকে প্রতিবার নেমে প্রত্যেক বাড়ীতে মালিকের হাতে কাগজ তুলে দেওয়ার প্রত্যাশা বাড়াবাড়ি বলতে হয়।

কাগজওয়ালার কথা ভেবে কোন লাভ নেই, পত্রিকাটি আমি নিয়মিতভাবে পড়ে থাকি, নিজেকে well-informed বলে আত্মশ্লাঘা সংগ্রহ করে থাকি। চলন্ত সিনেমা তারকাদের ইভনিং পার্টি থেকে আরম্ভ করে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলোয়াড়দের বহুবিধ কৌশলের কথা পড়ি, তা ছাড়া আদালতের আদিরসাত্মক মামলার খুঁটিনাটি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠান্তে স্মরণীয় করে রাখি। চারিত্রিক নীতির বিরুদ্ধাচরণ সম্বন্ধে লোমহর্ষকর ঘটনার বিবরণ সব সময় কাগজে বিশদভাবে ছাপে না বলেই যা উহ্য থাকে তা কল্পনার সাহায্যে মনোমত গড়ে নিতে হয়। এটা নিরবচ্ছিন্ন মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ, যার জন্য মস্তিষ্ককে ভালভাবেই

খাটাতে হয়—লোকে বলে এই জাতীয় চিন্তাশীলতা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ উপকারী। আমারও এই বিষয়ে দ্বিমত নেই।

প্রথম পাতা ওলটাবার পরেই দেখি বেশ বড়-সড় করে মানিকদার লোমশ মুখটি ছাপানো হয়েছে। দাড়ির বিজ্ঞপ্তি দেখলে যে কোন যশোলোভীর ঈর্ষান্বিত হবার কথা। দাদার চেহারার এপাশে-ওপাশে নানারকমের হিজি বিজি ছাপানো হয়েছে। গোটাপাতা জুড়েই দাদার গুণকীর্তন। কৌতূহলকে সামলে রাখা সম্ভব হল না। দাদার খবরটাই সর্বাগ্রে পড়তে শুরু করে দিলাম। তাঁহার জন্ম-তারিখ, শিক্ষা, বংশ-পরিচয় ইত্যাদি বিবৃতি শেষ করে লেখক ছবির বিশ্লেষণ শুরু করেছেন। এতক্ষণে বুঝলাম খবরের কাগজে হিজি বিজি ছাপা হলেই তাকে ছবি বলে মানতে হয়। ছবিগুলির নামও রহস্য জড়ানো। সমালোচকের তাল-ঠোকা সমঝদারি বুলি আরও বিস্ময়কর। ভাষা যেন দর্শককে বলতে চায়, যা বলি তা শোন এবং তা বোঝো, অন্যথায় গিলিয়ে বোঝাব, ঠাসা বন্দুকে (Muzzle-loader gun) বারুদ ঠাসার মত। বারুদের ওজন ঠিক না থাকলে ঘোড়া (trigger) টেপার পরে যে নলও ফাটতে পারে এ খবর অধিকাংশ আধুনিক সমালোচকরা ভাবেন না, কিংবা ভাবতে চান না। যাই হোক, জন্মতারিখ হিসাব করে দেখলাম বয়স সম্বন্ধে যে বৎসরের হিসাব ছাপা হয়েছে তা দাদার হাঁটু পর্যন্ত এসে পৌঁছায়। বাকি দেহটা কি তা হলে ভৌতিক ব্যাপার।

সত্য কথা লুকাবো না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বলতে হয় দাদার বয়স হয়েছে। তবে কোনকালে যৌবনের সঙ্গে যে রীতিমত দহরম মহরম ছিল তা বর্তমান গোঁফের তোয়াজ দেখলেই বোঝা যায়। সাহেবি চালে চাড়া দেওয়ার মত ডগা একেবারে কড়ি বড়গার মত সোজা। শেষের দিকে ছুঁচলো, পাশ দিয়ে লোক চললে খোঁচা লেগে যায়। কিন্তু সে যুগ পার হয়ে কালের গতি এখন যেখানে এসে পৌঁছেচে এবং ধাবমান সময়ের প্রতিক্রিয়ায় তাঁহার দৈহিক গঠনের ও মুখশ্রীর যে পরিবর্তন হয়েছে তাতে কলপের যুগ দিয়ে আসল যৌবনের সঙ্গে সোহাগ চলে না। কলপ লাগিয়ে নিজের মনকে যেভাবেই চোখ ঠারুন, আমাদের তাতে কোন আপত্তি নেই। দাদা তাজা হয়েই বাঁচুন এইটিই আমরা চাই, তাই বলে বিনা নোটিশে রাতারাতি 'জিনিয়াস' হয়ে যাবেন, সাধারণের গণ্ডি থেকে ঊর্ধ্বলোকে চড়ে বসবেন, আর আমরা ওই মহাশিল্পীর পাড়ায় থাকি বলে নিজেদের পরিচয় হারিয়ে বলতে হবে আমরা অমুক শিল্পীর পাড়াপড়শি, দুবেলা

দেখা হয়, আমাদের সঙ্গে কথাও বলেন। সব সমানের যুগে এতটা অসহ্য।

পটুয়ারাও শিল্পীর মত কারিগর, ওরা বুঝে সুঝে জাঁকের ডঙ্কা বাজায়, জিনিয়াসের ঝাঁঝে তেজে ওঠা মৌলিকতা ওদের মাতাল করে দেয় না। শোনা যায়, আত্মশ্রদ্ধার তাড়নায় জিনিয়াস নিজেকে একঘরে করে ফেলে। তার উপর চালাক সমালোচকের বেপরোয়া বিশেষণের তোয়াজে যদি মাথাটা ধড়ের উপর না থাকে, তা হলে যে মানুষ গুণকীর্তনে অযথা উদার হয় তাকে পরবর্তী ঘটনার জন্য দায়ী করা উচিত। আসল কথা, তৃতীয় ব্যক্তির স্বার্থের চক্রান্তে পড়ে গেলে, আপনভোলা জিনিয়াস প্রশংসার মায়াজালে জড়িয়ে পড়ে খ্যাতির কারাগারে নিজেকে বন্দী করার জন্য। হুঁশিয়ার সমালোচক পাহারায় থাকায় প্রাণপণ চেষ্টা করলেও মুক্তির আশা নেই। ঘটনাটি কতকটা স্বখাত সলিলে ডুবে মরার মত। রাজনৈতিক ব্যাপারে নোটিশ দিয়ে অনশনে আত্মঘাতী হওয়ার প্রথা আছে, শিল্পজগতে এইরূপটি যে ঘটবে কেউ ভাবেনি। যাই হোক, একটা সান্ত্বনা এই যে জিনিয়াস মরেও মরতে চায় না। অতএব যেভাবেই সমালোচকের প্ররোচনায় মহাশিল্পী নিজের পরিণতি সৃষ্টি করুক, একান্ত মরার মত না মরলে নিজেকে নিয়ে সে যা খুশী তাই করতে পারে। ফলে নবাগত জিনিয়াসের তাড়নায় আইন রক্ষা করা পযন্ত বেকুব বনে গিয়েছে।

ভেবে দেখ কাণ্ডটা, কেন রে বাপু—মৌলিকতার নেশায় মাতাল হওয়াই বা কেন, এবং বেহুঁশ অবস্থায় ছবির নকশায় তালগোল পাকিয়ে একটা অবোধ্য কিছু করায় বাহাদুরিই বা আছে কি? আমরা ত বুঝি, ছবিতে আসলে শিল্পী কিছু বলতে চায়, বলার কথা শোনার জন্য কেউ যদি উৎসুক না হয় এবং চেষ্টা করেও যদি বক্তব্যকে বুঝতে না পারে; তা হলে স্বীকার করতে হয় বলার মধ্যে কোন গোল আছে, কিংবা যে বুঝাতে চায় তার ভাষায় দখল নেই—এ ত গেল আমাদের কথা। ওরা বলে, যা বুঝবে না তা নিয়ে মাথা ঘামাও কেন? জিনিয়াসের কাজ জনসাধারণের জন্য নয় এবং সুন্দর হলেই সে কতটা সুন্দর তা বোঝার জন্য মাথা ঘামাতে হবে এমন কোন সর্ত রসগ্রহণের নীতিতে নেই। রসগোল্লা কিংবা সন্দেশ খেয়ে চিনির পরিমাণের ত কেউ খবর নিতে যায় না। কোকিলের ডাক শুনে কোন্ পর্দায় তার কণ্ঠধ্বনি বার হচ্ছে এ-বিষয়ে চিন্তা অবান্তর, কারণ কোকিলের ধ্বনিই রসোচ্ছ্বাসকে নাড়া দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এসব কথা শুনলে মাথা গুলিয়ে যায়। কথা শুনব অথচ তার মানে থাকবে না,

এমনটি ত পাগলের উক্তিতেই মানায় ভাল। এদিক দিয়ে পটুয়াকেই বলব আমাদের আপনজন, ওরা সোজা মানুষ, নিজেদের আঁকা ছবি বার বার নকল করতে পারলেই সন্তুষ্ট এবং নকলের স্বীকারোক্তিতে গর্বের অংশও যথেষ্ট থাকে। ওইটুকুই ওদের জীবিকা উপার্জন, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির সম্বল। বাপ ঠাকুরদার আমল থেকে আজ পর্যন্ত সকলের পেশা চালিয়ে আসছে, হুবহু নকলই হলো ওদের কারিগরির সম্পদে খাঁটি জিনিস। নতুন হাওয়ার ঝটকা টানে ওরা যদি নকলনবিশী ছেড়ে নতুন কিছু করতে যায়, তা হলে অচেনা দেবদেবীর পট দেখে পিসীমা প্রণাম করবে না, ফলে বিকিকিনির কারবারে গণেশকে উলটিয়ে বসাতে হবে। সরস্বতী ঠাকরুণের আড়াল দেওয়া আধুনিকের স্বচ্ছ পরিচ্ছদে চিত্তাকর্ষক নগ্নরূপের আভাস দেখে পুরুতঠাকুর মন্ত্র ভুলবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ ছাড়াও আছে, দুর্গার পূজায় অসুর সংহারে কোন এক মাপে বাঁধা বিশ্বশ্রীকে যদি চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে মা দুর্গা সংহারের বদলে অসুরকে কৃপার পাত্র ভাবতে পারেন, কারণ তার সাজানো মাংসপেশীর তলায় যা থাকে তা শক্তির ভেজাল, সব ফাঁপা। কুস্তির আখড়ায় এই রকম একটি শ্রীমণ্ডিত ব্যক্তিকে একজন ছোটখাটো জোয়ানের কাছে আছাড় খেতে দেখেছি, সে আছাড় কি সোজা আছাড়, একেবারে পিণ্ডি-চটকানো।

এতক্ষণ পটুয়াদের কথা বললাম, কারণ এদের কথায় গল্পের উপর জুলুম এসে পড়লেও তা মানতে হবে, আমি নাজেহাল হয়েই ওদের দিকে হেলেছি।

আসল কথা, ব্যবসার খাতিরে পটুয়াদের ব্যক্তিগতভাবে হামবড়াইয়ের ইচ্ছা থাকলেও দম্ভটা ঘরোয়া চালে আটপৌরে করে রাখতে হয়। সমালোচকের সাহায্যে মৌলিকতার প্রচার কাগজে কাগজে বার করা চলে না। এ বিষয়ে অনেক কিছু বলার আছে। পটুয়াদের কাজ ছাড়ান দিয়ে হিজিবিজি সম্বন্ধে সমালোচক কি লিখেছেন দেখা যাক। কয়েকটা ছবির উপর চোখ বুলিয়ে নিলাম। এই সময় ভাগের খবরে ভাগ বসাবার জন্য মেসের আরও কয়েকজন বাসিন্দা আমার পাশে এসে বসলেন। এক নম্বর ছবির নাম 'অনন্ত', বিরাট দামী ক্যানভাস, শত শত ছোট-বড় ছিদ্রে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এক জায়গায় ত্রিকোণাকারে কাটা অর্ধ উন্মীলিত জানালার মত ঝোলায়মান ক্যানভাসের টুকরা দর্শকের দিকে হেলিয়ে দেওয়া আছে। এটা অনন্তলোকের অজ্ঞাত পর্দানশীন আত্মাকে মর্ত্যের দিকে উঁকি মারার ব্যবস্থা হতে পারে। ক্যানভাসের দোলায় একটি তোবড়ানো বাইসাইকেলের চাকা অদ্ভুত প্রথায় লাগানো হয়েছে, ছোট ছেলেদের

কাগজের মত খেলনার হাওয়া লাগলে আপনা থেকেই মৃদু দোলে। দোলায় কি সঙ্কেত আছে জানি না, সাইকেলের চাকার কাছেই একটি বৃহৎ খাগড়াই পালিশকরা উজ্জ্বল কাঁসার থালা, জ্যোতির্ময় পদার্থটির হয়ত সূর্যের স্থান দখল করেছে। ছিদ্রগুলি সৌরজগৎ ও তার বাইরের তারকামণ্ডলীর প্রতীক।

ভুল হলো, বোঝার দিককে একটু বাস্তবমুখী করে দিলাম। শুনেছি জিনিয়াসরা পাতালের কাছাকাছি হয়, কথায় কথায় রাগে, কথায় কথায় হাসে, কথায় কথায় কাঁদে, ওদের উচ্ছ্বাস ও সৃষ্টির প্রেরণা কখন যে কি করে তার ঠিকানা নেই। বিচার করে দেখলাম মৌলিক সৃষ্টির চিন্তায় ব্যর্থতা রূপস্রষ্টাকে ক্রোধোন্মত্ত করে তুলেছিল, ফলে ক্যানভাসের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা। কিন্তু সমালোচকের ব্যাখ্যায় ব্যর্থতা বা হতাশার কোন উল্লেখ নেই। সুতরাং ধরে নিতে হবে আত্ম-শক্তির উপর অতিবিশ্বাসই ক্যানভাসের এই দুরবস্থার ঘটিয়েছে। ছবির উপকরণ-গুলি জোড়াতাড়া দিয়ে আবার অনন্তকে খোঁজার কাজে লেগে গেলাম। নিশ্চয় হেঁয়ালি টপকাতে পারলেই একটি বিরাট সত্যের মাঝখানে গিয়ে পড়ব। দৃঢ়-সঙ্কল্প সহায় ছিল, ঠিক করেছিলাম যেমন করে পারি অজানা অনন্তের সঙ্গে একলা বোঝাপড়া করে নেব। সত্যজাগ্রত সমালোচকরাও ত নয়াপন্থী, ওরা আবার পটুয়াদের চেয়েও দক্ষ নকলনবীশ, ওদের চিন্তা বাইরে থেকে আমদানি— একেবারে টাটকা প্যাকিং খোলা মাল, নিখরচায় import, সুতরাং হিসাবহীন বিশেষণের ব্যবহারে ওদের পুঁজি খালি হয় না, তারপর প্রশংসার ওজনে ছবির আশল গুণ যদি দমবন্ধ হয়ে মরার পর প্রাণহীন রূপের পচা গন্ধে আমার মত একটি নিরীহ প্রাণীর আত্মাকে খাবি খাওয়াতে থাকে তা হলে নিজের বিচারের উপর নির্ভর করাই যুক্তিসঙ্গত। সূক্ষ্মানুভূতির শরণাপন্ন হয়ে অনন্তকে অন্তরে উপলব্ধির জন্য খোলা চোখ বন্ধ করে দিলাম। তাতেও কি অনন্তর খোঁজ পাওয়া যায়? মনের চোখ দিয়ে যেদিকে তাকাই সেই দিকেই দেখি ভীতিপ্রদ অতল গহ্বর। গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, ওদিকে এগোলেই নয় তলিয়ে যেতে হবে, অথবা দিশাহারা হয়ে নিজেকেই খুঁজতে থাকব। তখন ওই থালার কাল্পনিক জ্যোতির্ময় রূপ থেকে যে তীব্র রশ্মি বার হবে তা আমার চোখ ঝলসিয়ে দেবে, তখন আমার কাছে আলো ও অন্ধকার সব একাকার হয়ে যাবে। আমি যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই থেকে যাবে। চিন্তা আরও গাঢ় হয়ে উঠল। মাথাটা টিপ টিপ করতে আরম্ভ করেছে, আশঙ্কান্বিত হয়ে ভাবতে লাগলাম আধুনিক আর্টের প্রগতিশীলতার প্রকোপে নিরীহ মানুষ যে

এইভাবে নির্যাতিত হয় তা জানা ছিল না। আর বেশীক্ষণ অনন্তের খোঁজে থাকলে অসময়ে ডাক এসে যাবে—হয়ত ওই তোবড়ানো বাইসাইকেলের চাকায় চড়িয়ে আমাকে অনন্তের দিকে ছোটাবে। টাল-খাওয়া বাইসাইকেলে চড়লে বাহন ও বাহক উভয়ই টাল খেতে থাকবে, চাকা কিন্তু চলবে না।

দ্বিতীয় নম্বর ছবির নাম 'মিলন'। ছবিটা আদিরসাত্মক রহস্যের ঘোরপাকে পড়েছে, রূপের অস্পষ্ট ইঙ্গিত কল্পনাকে পুলকমিশ্রিত উত্তেজনায় ভরিয়ে তুলল, ছবিতে যা নেই তা-ই বাসনা-তৃপ্তির প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। সমালোচক যদি কল্পনার কান মুচড়ে খুশীমত রূপ দেখেন এবং ভাষার কেরামতির সাহায্যে কৌতূহলী অবুঝ দর্শককে রসোপলব্ধির ইচ্ছামত দীক্ষা দিতে পারেন, তা হলে আমার নিজের মতকে অবহেলা করব কেন? যুক্তিসঙ্গত মনে হতেই নজর অন্তর্ভেদী হয়ে উঠল। দেখলাম, নিষিদ্ধের বাহ্যিক প্রকাশ, ছবির এলাকায় শালীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়েছে। রেখা ও রূপের জড়ামড়িতে কি একটা ঘটছে, এমন একটা কিছু, যা লোকচক্ষুর সামনে সোজাসুজি দেখার উপায় নেই। সর্বসমক্ষে সাধারণের সামনে চরিত্র-ধ্বংসকারী ছবির বে-আব্রু উদ্দেশ্য দেখে নিজের প্রতি লজ্জা এসে গেল। ভাবলাম, আমার নজরের ওপর কারও দৃষ্টি পড়েনি ত? কাছেই আমাদের শুচিবায়ুগ্রস্ত প্রবীণ মেসের বাসিন্দা বসেছিলেন। তিনি বললেন, 'ছবিটা যখন ক্যানভাসের ওপরই আঁকা তখন একটা কোণ কেটে ওদের লজ্জা নিবারণের কি সুবিধা হয় না? আর একজন পাশেই ছিলেন, তিনি বোধ হয় বড়দরের সমঝদার, একটু বিরক্তির স্বরেই উত্তর দিলেন, 'তোমার মনকে কাপড় পরাও হে। আর কিছু না হোক, ছবির রসকে বেইজ্জত করবার ইচ্ছা থাকলে ভগবানের কাছে কামনা করব তোমার চোখে ছানি পড়ুক।'

বাতিকগ্রস্ত দৃষ্টির ওপর ছানি পড়িয়ে দেওয়ার ঘরোয়া বিবাদের সূত্রপাত হল, যার সঙ্গে গল্পের বিশেষ যোগ নেই। সুতরাং পরের ঘটনার দিকে এগোই।

॥ ৩ ॥

দাড়ির কৃপায় দাদার অভাবনীয় প্রতিষ্ঠালাভ, তার সঙ্গে দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় অহরহ যশকীর্তন আমার অন্তর্দাহকে প্রায় স্থায়ী রোগে পরিণত করে সারল। পরশ্রীকাতরতায় কখনও ভুগিনি এমন কথা বলি না কিন্তু সে জ্বালা ছিল সাময়িক, সিনেমা বা ফুটবল ম্যাচ দেখার জন্য পাসের সুবিধা পেলে পরের ভালোকে ক্ষমা করতে পারতাম। কিন্তু দাদার গুণকীর্তন সব সময়

পিছু লেগে থেকে আমাকে প্রতিনিয়ত নত করিয়ে রাখার দরুন মনে হল রোগটা মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তারকে দেখানো ভাল। কিন্তু যে রোগের কোন বর্ণনা দেওয়া যায় না সে বিষয়ে ডাক্তার খোঁজ নিয়ে যদি কিছু না পায় তা হলে বলে বসবে রোগটা এলার্জিক। তারপর রোগের প্রমোশন ত আছেই। তখন বড় ডাক্তারের দক্ষিণা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে। শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, লুকিয়ে দাদার সঙ্গে দেখা করি। তিনি হাজার হোক এখন উর্ধ্বলোক-বাসী, আমার মতন গরীবকে কিছু মতলব বাতলে দেওয়ায় বাধা আসবে না। দাদা আর্থিক উন্নতি এবং মার্জিত সমাজে যে প্রতিপত্তি পেয়েছেন তাতে নিশ্চয় কোন মন্ত্রশক্তি তাঁকে সৌভাগ্যের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। সেদিনই আমাদের রোয়াকের বৈঠকে শুনলাম, পাড়ার ঝানো খবরী গজেন বললে, 'শুনেছ হে তোমাদের মানিকদার কারবার, এখন তার মাটিতে পা পড়ে না, নিত্য নতুন মোটর চড়ে ঘোরে। কোন কোন দিন দেখি লোকটার গা ঘেঁষে বসেছে যৌবন ঝলসানো মেয়ে। আমাদের পাড়ার খেঁদী, টেপী, পাঁচীর সঙ্গে কেমন সাদৃশ্য আছে বলে মনে হয়, তথাপি মেয়েটি ফ্যাসনে ছাঁচে ফেলা জীব। একবার দেখলে দুবার দেখার ইচ্ছা আসে, গড়নকে যেন ফাঁপিয়ে তুলে চিত্তাক র্ষ করা হয়েছে। যৌবনকে আঁকড়ে ধরার ব্যবস্থায় এমন কৌশল আসে যাতে মনে হয় constant repair চললেও সৌন্দর্য চিরনূতন থেকে যাবে, এ যেন চিরযৌবনা উর্বশী ঠাকরুণের মর্ত্যে আগমন। এ ত গেল সরস কেলেঙ্কারীর কথা, বাসি হয়ে যাবার ভয়ে টাটকা খবরটা দিয়ে দিলাম। এ বিষয়ে বেশী বললে তোমাদের হ্যাংলামি মেটাবার জন্য একটা গল্পই ফাঁদতে হবে। সেদিন দেখি সেই ছোকরা সমালোচক, যে সব সময় টাল খেয়ে চলে এবং যার কাজ হল কেবল জিনিয়াস গড়া, মানিকদার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এক দৃষ্টিতে শ্যাওলা-পড়া বালি-খসা পুরানো দেওয়ালের দিকে ধ্যানমগ্নের মত নতুন রূপের নক্সা খুঁজছে। আমারও মনে হল ওই ছোকরার দেখার মধ্যে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আছে, ওঃ দেওয়ালে প্রাচীন চীনাদের আঁকা ছবির ইতিহাস খুজে পেয়েছে। চীনকে নাগালে না পেলেও আধুনিক আর্টের নক্সা নিশ্চয়ই ওই ফাটা দেওয়ালের মধ্যে রূপ নিয়েছে। ছোকরা যখন সুন্দরের সন্ধানে আত্মহারা সেই সময় প্রকাণ্ড এক ঘরোয়া মোটর এসে মানিকদার দরজায় সামনে দাঁড়াল। খোলা গাড়ি, খাঁটি সাহেব পিছনের সিটে বসে। গাড়ির ভেঁপু শুনে ছোকরা সাহেবের দিকে মুখ ফেরাল। মোটরগাড়ির চালক সেও সাহেব, পিছনের সিটের দরজা খুলে কাঠের

পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। সমালোচক ও সাহেবের মধ্যে জানার স্বীকৃতি আদান-প্রদানের পর সওয়ার সাহেব গাড়ী থেকে নেমে এলেন। ইতিমধ্যে সাহেব ও সালোচকের আগমনবার্তা কেমন করে যথাস্থানে পৌছিয়ে গিয়েছিল।

অল্প সময়ের ভিতর মানিকাদার বাড়ীর দরজা খুলল এবং পূর্ববর্ণিত ছবির ক্যানভাসের টুকরার মত রাস্তার দিকে একটু হেলে গেল। বোধ হয় দরজার দু'একটা কব্জা বিকল হয়ে থাকবে। দেখলাম, মানিকদা সাজ্যাতিক মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে মুখ বার করলেন। আশে-পাশে সন্দিগ্ধ reconnoitrer-এর দৃষ্টি ঘুরে আসবার পর গোটা দেহটা বেরিয়ে এল। একেই কণ্ঠনূর্তের মুদ্রাদোষ, সব সময়ে গলা জড়িয়ে থাকে, তার উপর অনভ্যস্ত সাহেবি গলার ফাঁসের (নেকটাই) অস্বস্তিকর বাহার তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। মাথার ঝাঁকুনিটা আরাম খোঁজার ব্যর্থতায় বিরক্তিকর অভিযোগ—এ কথা আগেই বলেছি। কিন্তু বিরক্তিপূর্ণ মুখে কণ্ঠের ভেড়ে ওঠা ঝাঁকুনিতে সহজে অনুমান করা চলে ইহা বিশিষ্ট অভ্যাগতকে গলা-ধাক্কা দেবার ইঙ্গিত। অতটা না হলেও ধরে নেওয়া চলে 'সামনে থেকে দূর হও'।

এইরূপ অশোভনীয় অভ্যর্থনার পর সাহেব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন তিনি ধরে নিলেন প্রত্যাশিত অতিথির প্রতি ভারতীয় ভদ্রাচার এভাবেই প্রকাশ করা হয়ে থাকে। তিনি খুশীই হলেন এবং ঠিক করে নিলেন বর্বরতাই কৃচ্ছ্র-সাধনে ভারতীয়দের একটি বিশেষ সম্পদ। দ্রুতচক্ষে তিনি ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নোটবুকে তাড়াতাড়ি লিখে নিলেন। সমালোচক সবই লক্ষ্য করছিল, তার বুঝতে বাকি রইল না একটা অপ্রীতিকর কিছু নথিবদ্ধ হয়েছে, কারণ সাহেবকে শহরের জ্ঞানী ও গুণীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ভার পড়েছিল সমালোচকের উপর। এটা সরকার-প্রদত্ত সম্মান কি না এখনও জানা যায়নি। গুণী ও জ্ঞানীদের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে ও পরে এইভাবে অনেক তত্ত্ব সাহেব ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং অনেক ভুল বা মনগড়া সংবাদও ইতিমধ্যে পরদেশে চলে গিয়েছে। যাইহোক সমালোচকের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও দেশপ্রীতি সজাগ থাকায় নতুন গলদকে প্রশ্রয় দেবার ইচ্ছা ছিল না। তাই সাহেবের সহিত দৃষ্টিবিনিময় হতেই ঘটনাটি সহজ করার জন্য মাত্র একটি কথা উচ্চারণ করলেন 'জিনিয়াস', অর্থাৎ আপনভোলা চিন্তাশীল রূপস্রষ্টার পক্ষে কিছুই অশোভনীয় নয়। তার ব্যবহার সত্যই ভদ্র রীতির বাইরে গেলে ধরে নিতে হবে ঐরূপটিই প্রয়োজন ছিল।

জিনিয়াস যে চলতি নিয়মে চলে না তা সাহেব জানতেন। সুতরাং বিচারে ভুল হওয়ায় নোট বুক বার করে যা লিখেছিলেন তা কেটে দিলেন। তারপর অবনত মস্তকে অভিজাত সুলভ সাহেবি-কেতায় নমস্কার করলেন। বিনম্র আচরণের দৃশ্যটি দাঁড়ালো বেতো রোগী কোমর ভাঙা অবস্থায় পিছন দিকে বেদনার স্থলে হাত রেখে যন্ত্রণার অনুভূতি আর এক হাতে টুপি নেড়ে জানাচ্ছে। সাহেবি চালে কোমর-ভাঙ্গা নমস্কারের পর তিনি শিল্পীকে গাড়িতে ওঠার অনুরোধ জানালেন। খাস সাহেবের পাশে বসার সাহস দাদার ছিল না, তাঁর ইতস্ততঃ অবস্থা দেখে সমালোচকও বিব্রত হয়ে পড়েছিল। মানিকদাকে ইঙ্গিতে জানালো গাড়িতে উঠে বসুন। মানিকদা সাহেব সাজলে কি হয়, সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত নয়। খ্যাতির বিড়ম্বনা ও কিছু অর্থসংস্থানের সম্ভাবনায় তিনি নিজেকে হারিয়েছিলেন। সাহেবের আচরণে তাঁর মনে হল কাঠের পুতুলের মত দাঁড়ান চালককে অভিবাদন জানানো হয়েছে। খুবই স্বাভাবিক, কারণ গাড়িতে ঐ চালকের কল টেপায় যাত্রীর মরণ-বাঁচন সম্বন্ধ জড়িয়ে থাকে। মানিকদাও চালককে সাহেবের অনুকরণে দু'চারবার নমস্কার জানিয়ে দিচ্ছিলেন। নমস্কারের পায়তাড়া আর থামতে চায় না, প্রতিবারই তাঁর মনে হয়েছে নমস্কারের চালটা কায়দা দুরস্ত হয়নি। শেষ পর্যন্ত নমস্কারের প্রদর্শনী কতকটা সার্কাসের ক্লাউনের খেলার মত দাঁড়াল। গতিক খারাপ দেখে সমালোচক প্রায় জোর করেই মানিকদাকে গাড়ির ভিতর চালান করে দিল। তার পর নিজে যুগল-মূর্তির সামনে আসন ঠিক করে নিলে গাড়ি ছেড়ে দিল।

সাহেব সাধু উদ্দেশ্য নিয়েই ভারতবর্ষে পদার্পণ করেছেন। আমাদের দেশের যাবতীয় কৃষ্টির সম্পদ ও তার মূলসূত্র আবিষ্কার করে বিখ্যাত ব্যক্তিদের সহিত পরিচয় এবং বহু বিষয় আলোচনা ইত্যাদির পর একটি সারগর্ভ গ্রন্থ প্রকাশ করে ভারতকে বাইরে পরিচিত করানোর জন্য তিনি উৎসুক। সংক্ষেপে, পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের সহায়তায় আমরা কতটা আদিম বুনো রুচি পরিত্যাগ করতে পেরেছি এবং কতটা বর্বরতা আমাদের কাছে অবর্জনীয় হয়ে আছে তারই নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে উপস্থিত লেগে আছেন। ভারতে যে ক'টা দিন থাকবেন তারই ভিতর শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য, ধর্ম, সামাজিক ও সাংস্কারিক রীতি-নীতি ইত্যাদি সব বিষয়ের মালমশলা সংগ্রহ করে ফেলতে হবে। যে দেশে কোটি কোটি মানুষের বাস, বিভিন্ন ভাষা ও ধর্ম যে দেশের একটি বৈশিষ্ট্য, হাজার হাজার বৎসর ধরে বিভিন্ন দিকে যে দেশের ঐতিহ্যে ক্রম-বিবর্তন ও সংস্কার ঘটেছে তারই বিশদ

বিবরণ কয়েক দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। এটা সাহেবি প্রোগ্রামের নীতি, ঝটপট কাজ না সারলে অযথা আয়ুক্ষয়ের জন্য নিজের কাছেই জবাবদিহি করতে হবে। অতএব সবকিছু আগে থাকতে প্রস্তুত থাকে, নড়চড় নেই।

এই জাতীয় পণ্ডিত পরিব্রাজকের লিখিত সারগর্ভ গ্রন্থের সহিত আগেও আমাদের পরিচয় হয়েছে। আংশিক বিবরণ এখানেই বলতে চাই, যথা, বিশ্ব-বিখ্যাত শান্তিনিকেতনের বিদ্যাপীঠ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রসংসা করতে গিয়ে ভদ্র-লোক লিখেছিলেন, গায়ক-কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত শান্তিনিকেতন সত্যই একটি অপূর্ব কুঞ্জবনে ঘেরা বিদ্যাপীঠ। হিমালয়ের পাদমূলে, হিংস্র জন্তু ও বিষ ধর সরীসৃপ পরিবেষ্টিত পীঠস্থানটি যেন মায়ার সৃষ্টি, ভয়ঙ্করের গা ঘেঁষে সুন্দরের বসবাস এমনটি কুত্রাপি নেই। সুন্দরের আকর্ষণে বাঘ, ভালুক পর্যন্ত পোষা কুকুর বেড়ালের মত কুঞ্জবনের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। কত হাজার বৎসর আগে এই মোহিনী শক্তির আবিষ্কার হয়েছিল তা আজও ঐতিহাসিকরা ঠিক বলতে পারেন না। এই বর্ণনার প্রারম্ভেই কাঞ্চনজঙ্ঘার একটি কবো আলোক-চিত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মানতেই হবে শান্তিনিকেতন হিমালয় পাদমূলে প্রতিষ্ঠিত। ইতিবৃত্তটি কোন এক জৌলুসযুক্ত সুদৃশ্য বাঁধান পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছিল।

শান্তিনিকেতনের উক্ত বিবরণ যিনি লিখেছিলেন তিনি আজও হয়ত সুস্থ দেহে বেঁচে আছেন এবং আরও অনেক খবর তাঁর কৃপায় বিদেশে প্রচার লাভ করছে। উপস্থিত আমরা যে সাহেবের সহিত পরিচিত হয়েছি তাঁরই কথা বলি। ভদ্রলোক সম্ভবতঃ মার্কিন দেশের মানুষ এবং অন্যায়ভাবে ধনী। ভারত থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় সুভেনীর (Souvenir) হিসেবে স্থানীয় কারু ও চারু শিল্পের নিদর্শন নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি নিশ্চয় মার্কা কর্তব্য কম তালিকার পাতায় লেখা ছিল। ইতিমধ্যে সংগ্রহের তালিকায় পিতলের গাড়ু, পিলসুজ ও পিকদানি, রঙবেরঙের বাহারি শিকা, বিচিত্রিত পোড়া মালসা থেকে আরম্ভ করে তালপাতায় তৈরী চাষীর মাথার টুপি, দরজায় লাগাবার বেজায় বড় তালা আর কত কি উদ্ভট জিনিস যোগাড় হয়ে গিয়েছিল বলা যায় না। যে কয়টি সংগ্রহ হয়েছিল সেগুলিকে functional করার জন্য তাঁর হোটেলের বৃহৎ ঘরে নানা-ভাবে সাজানো হয়েছে। পিতলের পিলসুজে তৈলাক্ত পলতের বদলে একটি ইলেকট্রিক বাল্‌ব দেওয়া হয়েছে এবং বাল্‌বের ঢাকনার জন্য চাষীর টুপি পিল সুজের উপর বিরাজ করছে। পিকদানি হয়ে গিয়েছে পুষ্পাধার, বাহারি শিকায়

ঝোলানো বিচিত্রিত পোড়া মালসার ভিতর আশ্রয় পেয়েছে সবুজ money plant. এই ভাবে সাজিয়ে দেওয়ার ভার ছিল আমাদের রুচিসম্পন্ন সমালোচকের উপর। শিল্পকলার নিদর্শন সংগ্রহ ছাড়া সাহেব শিল্পীদের সঙ্গে মেলামেশাও করেছেন তাদের চিন্তাধারা ও অঙ্কন পদ্ধতির সহিত পরিচিত হবার জন্য। এই সূত্রে প্রদর্শনীতে দাদার আঁকা অনেকগুলি হিজিবিজির নক্সা ভদ্রলোক মোটা টাকা দিয়ে কিনে ফেলার পর দাদাকেও চিনে নেওয়া দরকার ছিল, তাই সমালোচকের দ্বারা সাহেবি নিয়ম অনুসারে সময় নির্দিষ্ট করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন; গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেলে দাদাকে প্রধান অতিথি করে cocktail partyতে নিমন্ত্রণ করার জন্য। অতবড় খ্যাতিবান শিল্পীর সম্মানে cocktail দিতে হলে Elites of the cityকেও ডাক দিতে হয়—এ ব্যবস্থা নাকি দস্তুরমত কায়দা মেনেই হয়েছে।

দাদা গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেলের আশেপাশে ঘুরলেও জীবনে কখনও দামী গলিচা পদদলিত করে চলেননি। সাহেবি জুতো পরাও তাঁর অভ্যাস ছিল না। দু'চারদিন ব্যবহার করায় আবরণ থাকা সত্ত্বেও নতুন পাদুকার ঘর্ষণে দুপায়ের গোড়ালিতে মস্ত বড় ফোস্কা হয়ে গিয়েছে। এখন ঘর্ষণ মেনে চলতে হলে গোটা পায়ের উপর দেহভার দেবার উপায় নেই, দেহের ওজন পায়ের ডগায় চাপিয়ে চলতে হয়। ঘটনাচক্রের ফলে চলাটাও অসাধারণ হয়ে দাঁড়াল। নতুন প্রথায় কেবল হাঁটা নয়, তার সঙ্গে কণ্ঠ-নৃত্যের যোগ হওয়ায়, আশেপাশের লোক দাদাকে অবাক্ হয়ে দেখতে লাগল। এরূপ অবস্থায় নিজেকে মান্যবর জীব ভাবলেই হিসাবটা চলনসই হ'ত কিন্তু সকলের দৃষ্টি তাঁরই উপর পড়ায়, দাদা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। দৃষ্টির দ্বারা তাঁকে পরীক্ষার পিছনে কার কি উদ্দেশ্য ছিল জানা না থাকায় দাদা পদক্ষেপ একটু অত করে দিলেন। দাদার কারবার ত একজনকে নিয়ে নয়, তার কীর্তির নজিরও বহুমুখী সুতরাং ভয় পেলে দাদাকে অভদ্র বলা চলে না। শেষ পর্যন্ত দাদা নিমন্ত্রণের আসরে উপস্থিত হলেন বটে, কিন্তু পায়ের জ্বালায় জুতোর ভিতর পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। সমালোচককে কানে কানে তাঁর দুরবস্থার কথা জানালেন, উত্তর পেলেন, পরিচয়ের পালা শেষ হলে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

ঘরের ভিতর নিমন্ত্রিতদের ভিড় জমকালো হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকের হাতে খর্বাকার পান-পাত্র। ভিড়ের মধ্যে সাহেব-মেমদের সংখ্যাও কম নয়। পানরত অবস্থায় অতিথিরা একের পর এক জিনিয়াস খেতাব-গ্রস্ত দাদার সহিত পরিচিত

হতে আরম্ভ করেছেন, সকলেই তাঁর ছবির প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। তবে অনেকেই ছবি দেখেননি। তাতে কিছু আসে যায় না, অপরের ছবির প্রশংসা কাগজে বার হয়েছিল, তাই যথাসম্ভব স্মরণ করে দাদার উপর বর্ষিত হতে লাগল। দাদাও গুরুপাক বিশেষণগুলি নিশ্চিন্ত মনে গিলতে লাগলেন। বদহজম সুনিশ্চিত জানলে হয়ত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাববার অবসর পেতেন।

ছোকরা সমালোচক দাদার পাশেই দাঁড়িয়েছিল, দোভাষীর কর্তব্য সামলাবার জন্যে। ইচ্ছামত অনুবাদ চলছিল, ভুল অর্থকরণের জন্য কারও কাছ থেকে আপত্তি শোনা গেল না। নিমন্ত্রণ-পত্রে To meet-এর অনুরোধ থাকলেও অভ্যাগতদের আশল দায়িত্ব ছিল cocktail-এর পাত্রগুলি উদারভাবে খালি করা।

কর্তব্যসাধন পরম নিষ্ঠার সহিত চালিত হওয়ায় পাঁচমিশালি উগ্র পানীয় তৃষ্ণার্তদের অন্তরকে রঙীন করে তুলেছে। যাঁরা পৌরুষের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত, তাঁরা চঞ্চল চিত্তকে উৎকোচদানে শান্ত করার জন্য রঙ মাখানো অসাড় ক্যানভাসের প্রসঙ্গ ছেড়ে সচল রংদার স্বচ্ছ শাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন। পরিবেশ তখন রোমান্সের সাড়ায় ভরপূর হয়ে উঠেছে। সাড়ার ডাকে সায় দিতে হলে পরকীয়ার প্রতি রস নিবেদন শাড়ির তারিফ থেকেই শুরু হয়। পরিচ্ছদের বর্ণনা কতটাই বা বলতে পারি, কারণ কতটুকুই বা থাকে ঢাকা। শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করা আছে-কিন্তু-নেই গোড়ালিযুক্ত পাদুকার উল্লেখ না করলেও চলে না, কারণ চলার বেসামাল ভঙ্গিতে waltz step-এর আভাস পাওয়া যায়। হাতে গহনার পরিবর্তে বাহারি চ্যাপ্টা ঝুড়ি ভ্যানিটি কেসের স্থান নিয়েছে। মুখশ্রীর স্থায়ী যৌবন মেরামতের জন্য ঐ ঝুড়ির ভিতর নাকি বহুবিধ মালমশলা থাকে। আকর্ষণের কারণ কি কেবল এইখানেই শেষ? রুক্ষ কেশের কবরী-বন্ধনও চিত্ত-দোলার সহায়ক হয়ে উঠেছে। অপূর্ব রুচির সমাবেশ, কারও মাথার উপর জটার সেবায় সৌখীন বৈরাগ্য যেন কামদেব রতি ঠাকুরের মন্দির গড়ে তুলেছে। স্থাপত্যে দেশী মাটির কলসীর প্রভাব সুস্পষ্ট। কেহ বা আধুনিক রীতির বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের স্বামীকেই বগলদাবা রেখে কর্তিত কেশে বৈধব্যের বিলাসে আত্মহারা। গ্রামবাসী প্রাচীনপন্থীরা এরূপ চুলের বাহার দেখলে বলতেন, "কার বাগানের গাছে চড়ে ফল চুরি করতে গিয়েছিলে বাছা যে চুলের ঝুঁটি ধরে বঁটিকাটা করে ছেড়েছে!" দোলায়মান দীর্ঘ কেশেরও অভাব নেই। এই চালের চুলের প্রদর্শনীকে মার্জিত মতে বলা হয়

পনিস টেল। আগের দিনে জানোয়ার, মাছ, পাখী এমন কি ভক্ষণীয় ফলের সহিত তুলনায় মানুষের দৈহিক সৌন্দর্যের সাদৃশ্য খোঁজা হত—যেমন সিংহকটি, বৃষস্কন্ধ, মরালগ্রীবা, মীন বা খঞ্জনাক্ষি। পটলচেরা চোখ ত আছেই। সেইরূপ অধুনা ঘোটকপুচ্ছ সৌন্দর্যের আদর্শ হলে নতুনকে না মেনে চলে না।

পরিস্থিতির প্রভাব দাদার স্কন্ধেও ভর করেছিল। হয়ত বা কিঞ্চিৎ মাত্রাধিক্যও ঘটেছিল। পরের খরচে এইরূপ ঘটা দাদার পক্ষে নতুন কথা নয়। বিশেষ করে অর্কেষ্ট্রাবাদ্যের সহিত যখন বলনৃত্য দাদার অন্তরকেও নাচিয়ে তুলছিল। দাদা তখন বেপরোয়া দেখে-শুনে বেশ একটি পুষ্ট ধরনের মেমসাহেবের কাছে উপস্থিত হয়ে নাচের প্রস্তাব করলেন। ছোকরা সমালোচক এতক্ষণ দাদার দেহরক্ষী হয়ে কাছেই ছিল, কিন্তু তরলাগ্নি তাতিয়ে তোলায় দেখা গেল কোন একটা কারণ খুঁজে দাদাকে স্বাবলম্বী হতে দিয়ে অন্তর্ধান করেছে। স্বাবলম্বী দাদা কিভাবে নৃত্যের আশায় অগ্রসর হলেন ইতিপূর্বেই বলেছি।

এখানেও সত্য কথা লুকাব না। দাদা অপরকে নাচালেও নিজে কখনও নাচ শেখেননি। এই সময় দাদার দুপায়ের যমজ ফোস্কা বিশেষভাবে কাজে লেগে গেল। যে মহিলার কাছে নাচের প্রস্তাব করলেন, তাঁর পক্ষে তা প্রত্যাখ্যান সম্ভব নয়। কারণ দাদা হলেন প্রধান অতিথি। নাচ শুরু হল, এবং অর্কেষ্ট্রার সহিত বলনৃত্যের তালে গোড়ালির বেদনা অপূর্ব প্রথায় দাদাকে নাচাতে শুরু করল। দুচারজন অতি আধুনিক ফ্যাশনপন্থী বোধ হয় ঠিক করে নিলেন—এইরূপ রিদমিক (rhythmic) পদক্ষেপ একটি নতুন নাচের ভঙ্গি, সুতরাং অনুকরণীয়। শেষ পর্যন্ত খুঁড়িয়ে চলাও বল-নৃত্যের অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। এর পর দাদাকে নিয়ে আরও অনেক কিছুই ঘটেছে যার বিবৃতি দিতে হলে আমাকে নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হয়, তেমন শক্তি বা সাহস আমার নেই, সুতরাং......

আবার দাদাকে নিয়ে হুলুস্থুল কাণ্ড—কাগজে কাগজে হৈ হৈ পড়ে গিয়েছে। খবরে প্রথমেই বড় বড় অক্ষরে লেখা—বাঁদর শিল্পী গ্রেপ্তার, তার পরেই দাদার ছবি। তলায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়ে অবাক্ হয়ে গেলাম। সমালোচক বেশ কিছু দিন ধরে বিদেশ থেকে বিনামাশুলে অতি আধুনিক ছবি আনাচ্ছিল বাজারে চালু করবার জন্য। নতুন ফ্যাসানের ছোঁয়াচে রোগ তখন এপিডেমিকের স্তরে এসে গিয়েছে। সমালোচক এই সময় মহৌষধের ব্যবস্থা করছিল। দাদার

মত দুচারজনকে শিল্পী বানিয়ে ব্যবসা বেশ ফাঁপিয়ে তুলেছিল, তারসঙ্গে সেঁদী, টেঁপী ইত্যাদির টোপ থাকায় তাজা উগ্র সাবের গন্ধে অনেকেই টোপ না গিলে পারেনি। দাদাও এদিক দিয়ে বাদ পড়লেন না, সেইটাই আশ্চর্যের বিষয়। তিনি শুধু টোপ গিললেন না, তেফলা বঁড়শীর মধ্যে আটকে পড়লেন। মোটর গাড়িতে দাদার পাশে যিনি চড়তেন তিনিও ছিলেন ভেজাল। দাদার মত ওস্তাদও ভেজালের প্রেমে পড়ে এমনই নাকানি চোবানি খেলেন যে শেষ পর্যন্ত দাদের original ছবির নকল আপন বলে চালানোর জন্য শ্রীঘরবাসের ব্যবস্থা হল। আমার বক্তব্য এই, যাঁরা originalityর নকল করেন তাঁরাও যেন দাদার কথা একবার ভাবেন।

রুদ্ধ কবাট

অনেকদিন বাদে বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে দেখা। কাছারির রোয়াকে ঘরোয়া কথায় রসাব আমদানি হতে জমে গিয়েছিলাম। কেচ্ছার গল্পে কখন যে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারিনি। শীতকাল, দেখতে দেখতে চারধারে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল। এই সময় নীলকুঠির দিক থেকে করুণ আর্তনাদ শুনতে পেলাম নারীর কণ্ঠস্বর। ওদিকটার বদনাম আছে। লোকে অনেক কথা বলে। ঘোর সন্ধ্যায় এমন একটি জায়গা থেকে ত্রাসের ডাক শুনলে রহস্যের প্রশ্ন ওঠে বৈকি। জিজ্ঞাসা করতে হ'ল, ব্যাপার কি বল ত? বাঁড়ুজ্জে আমার কথায় কান না দিয়ে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকাল, তারপর আপন মনে বলে চলল এরই মধ্যে ছটা বেজে গেল! সস্তার তিন অবস্থা। ঘড়িটা ঠিক পিছিয়ে পড়েছে। আদ্দিকালের পুরানো জিনিষ, ওজনদরে কেনা। জোড়াতাড়া দেওয়া কলকব্জা কত আর সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলবে। তবু ঘড়ির ঘণ্টাকে মানতে হয়। যাই ঠিক ক'রে আসি। কাল আবার ট্রেন ধরতে হবে। আদালতে হাজিরা না দিলেই নয়। সাক্ষীটা শেখান নাম মনে রাখতে পারলেই রক্ষা। ভাগনেকে খুড়ো সাজিয়ে জেরার সামনে ঠিক রাখা চাট্টিখানি কথা? মামলার ব্যাপারে নাজেহাল হয়ে গেলাম। শেষ পর্য্যন্ত নায়েবগিরি না ছাড়তে হয়।

ঘড়ি মেলানোর পরে শুনলাম, মন্ত্রপাঠের মত বিড় বিড় ক'রে কি সব বলছে ছেলেবেলা থেকে চেঁচিয়ে চিন্তা করা ওর স্বভাব। ভাবলাম, মকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে শত্রুপক্ষকে অভিশাপ দিচ্ছে। কাছে আসতে বুঝতে পারলাম, দুর্গানাম জপছিল। একপ্রকার ধার্মিক থাকে যারা পুণ্যের খাতাতেও হিসাব রাখে। বাঁড়ুজ্জে উক্ত প্রকৃতির ধার্মিক। ছটার আগে ঠাকুরের নাম মুখে আনতে চায়নি পাছে ভক্তির উচ্ছ্বাসে অপব্যয় এসে পড়ে। হিসাবের কড়াকড়িতে আমার আমার স্বার্থ ছিল না। ওদিকে মাথা না ঘামিয়ে, ঘড়ি মেলান কিসের সঙ্গে আনার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলাম। জিজ্ঞাসা করতে হ'ল, সময় ঠিক করলে কেমন করে?

উত্তর যা শুনলাম তা অবান্তর কথা। বললে, ঐ পথেই যখন যাবে তখন সব কথা না শুনলেই নয়? আজ অমাবস্যা, তায় শনিবার, এর উপর সোম

ঘটেছে ঐ মেয়েটার ডাক। একেবারে ত্র্যহস্পর্শ। সব কয়টিই অমঙ্গলের সঙ্কেত। রাত্রে একটা কিছু না ঘটলে বাঁচি। ভয়কে হেঁয়ালির সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়ায় কৌতূহল রুখে উঠেছিল। আবার ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলাম, এখন যে ডাক তা জানলে কেমন করে?

বাঁড়ুজ্যে উত্তর দিল, একান্তই যখন নাছোড়বান্দা হয়ে বলছি, কিন্তু কিছু ঘটে গেলে আমাকে দোষ দিও না। তোমার সামনেই অপরাধকে জানিয়ে দেওয়া ভাল যে, স্বেচ্ছায় কাহিনী বলছি না। অজ্ঞাত শক্তির সামনে সাক্ষী রেখে জবাবদিহি শেষ হবার পর বাঁড়ুজ্যে আমার গা ঘেঁষে বসল, তারপর শুরু করল—ঐ যে ডাক শুনলে ওর সঙ্গে যুগযুগান্তর আগের ঘটনা জড়িয়ে আছে। [illegible] অমাবস্থায়, সন্ধ্যা ছটার সময় মেয়েটা ঐভাবে তার স্বরে ডেকে ওঠে। কেন ডাকে তা জানলেও বলা নিষেধ, বিশেষ করে রাতের বেলায়। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন নীলকুঠির ম্যানেজারবাবু ছিলেন দুর্দান্ত প্রতাপশালী মানুষ, বাঘ আর গরুকে এক ঘাটে জল খাওয়াতেন। তাঁর দাপটে আশপাশের গ্রামের লোক তটস্থ হয়ে থাকত। সমস্ত ঝি-বৌদের একলা ঘাটে যাবার জো-টি ছিল না। মনোমত কোন চেহারা নজরে পড়লেই [illegible] ম্যানেজারবাবুর চরেরা ধরপাকড় করে কুঠির দিকে নিয়ে যেত। সে-সব কথা শুনলে আজও রক্ত গরম হয়ে ওঠে। ধরে আনা জ্যান্ত মানুষকে ওরা বলত, মাল। এই যে আমাদের কাছারি বাড়ী, এটা ছিল মাল আমদানির আড়ত। এখান থেকে বাছাই করা জিনিস রপ্তানি হ'ত বড়কর্তার কাছে। কাটা খাল দিয়ে ছোট্ট নৌকোয় মানুস চালান দেওয়া ছিল নিয়ম। পাল্কীর ব্যবহার যে একেবারে হ'ত না এমন নয়। মাল বাছাই-এর ভার ছিল ম্যানেজারবাবুর উপর। খাঁটি ও খেলোয়াড় জিনিস নিজে না। পরখ করে মনিবের কাছে পাঠাতেন না। গররাজী মানুষ দেখলে কর্তারা, ম্যানেজারের দক্ষতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়তেন, এমন কি ফেরত পাঠাতেও বাধত না। তোয়াজকে জিইয়ে রাখার ধৈর্য কর্তাদের ছিল না। এই কারণে কড়া মানুষকে তৈরী করতে সময় লাগত। তৈরী করবার প্রথায় কতরকম চাল যে চলত তার বিশদ বর্ণনা দিতে হলে রাত কাবার হয়ে যাবে।

মেয়েটির কথায় ফিরে আসি। রূপের তার হাঁক-ডাক ছিল। তবে লোকে বলত তার চলা-ফেরা একটু কেমনতর, অর্থাৎ হঠাৎ দেখলে কি বলে, কেমনতরই মনে হ'ত। সমস্ত বয়সের এমন একটি সাজোয়ান মেয়ে, বিশেষ করে সে যখন

সুন্দরতর, তখন এক কথায় নজরে লেগে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। রপ্তানির দুর্লভ সম্পদ যখন পরীক্ষার জন্য ম্যানেজারবাবুর সামনে ধরা হ'ল তখন তিনি কারণে ছিলেন। প্রথম দর্শনেই চোখ ঝল্‌সিয়ে গেল। মজা-মনে রূপের তাত লাগায় হুকুম দিয়ে দিলেন, "ওকে তৈরী করে নিয়ে আয়।" সব মানুষকে যে হুকুমত তৈরী করা যায় না। এ-কথা যদি সেবকের দল জানত তা হলে আজকে কাহিনী বলার দরকারই হ'ত না। তৈরী করবার চেষ্টাতেই লোকেরা বুঝল কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছে। এমন একটি প্রাণীকে খেলিয়ে তৈরী করতে হলে ম্যানেজারের মত ওস্তাদের কাছেই ছেড়ে দেওয়া ভাল।

ম্যানেজারবাবু কালক্ষণ দেখে শুভকাজে নামতেন। এর জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন হ'ত। সোজা কথা, উগ্র-তরলের সাহায্যে মনকে তাতিয়ে নিতেন, নিজেকেও তৈরী করে নেবার জন্য। তৈরী হবার জন্য নির্দিষ্ট সময় ছিল সন্ধ্যা ছটা। দিনের পর দিন, সন্ধ্যা এল, ছটা বাজল, নিজে তৈরী হলেন, কিন্তু যাকে তৈরী করবার জন্য এত আয়োজন তাকে কিছুতেই বশে আনতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত লোক লাগিয়ে দিলেন পীড়নের জন্য। পীড়নের সময়ও নির্ধারিত হ'ল সন্ধ্যা ছটায়। ঐ সময় নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য ম্যানেজার বাবু পীড়নের আসর গুলজার করে বসতেন। মেয়েটির কাতর ধ্বনি শুনে বীভৎস সৌখিনতায় আত্মতৃপ্তি খুঁজতেন। এভাবে কিছুদিন মেয়েটির চিৎকার শোনা গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কি হ'ল কেউ জানে না। হঠাৎ বাঁড়ুজ্যে চুপ করে গেল। কে যেন ওর মুখ চাপা দিয়ে কথা বন্ধ করে দিল। পরক্ষণে চেতনা ফিরে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, কিছু দেখলে ?

বাঁড়ুজ্যের কথা ভয়ে জড়িয়ে গিয়েছিল, আর বেশী কিছু বলতে পারল না।

অন্ধকারের ভিতর বাঁড়ুজ্যে কি দেখল জানি না, আমার নজরে কিছু পড়েনি। উত্তর দিলাম, না।

বাঁড়ুজ্যে আলোটা ঘেঁষে বসলেন, তারপর কানের কাছে এসে চুপি চুপি বললেন, লণ্ঠনের আলোয় উঠানেই দেখলাম যে। এমন একটি সত্যকে অস্বীকার করায় বাঁড়ুজ্যে আমার মুখের দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল। বুঝলাম, আমার কথা বিশ্বাস করেনি। খুব সম্ভবতঃ ভ্রান্ত স্পর্শের প্রভাব বাঁড়ুজ্যের উপর ভর করেছিল। বাতিকগ্রস্ত লোককে বোঝাতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আস্তানায় ফেরবার জন্য প্রস্তুত হলাম। সঙ্গে লণ্ঠন আনিনি, আর দেরী করা উচিত হবে না। অন্ধকারে পথ চলতে সাপের গায়ে পা পড়ে যাওয়া কিছুই আশ্চর্যের নয়।

বাঁড়ুজ্যের কাছে বিদায় নিতে যাব, এমনি সময়ে দেখলাম, সদর রাস্তা ধরে, ধপ্‌ধপে সাদা কাপড়পরা একটি মেয়ে নীলকুঠির দিকে চলেছে। ও রাস্তায় সন্ধ্যায় সময় একলা হাঁটার মত সাহস কোন মেয়ের থাকতে পারে ধারণা করা শক্ত। সন্দেহ এসে গেল, বাঁড়ুজ্যের দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম না ত? আমার পক্ষে ঐরূপ সম্ভব নয়, কারণ অশরীরীর ভয়ে কখনো কাবু হইনি। এই ত কয়দিন হ'ল বাজি রেখে কালী দীঘির শ্মশানে সারারাত একলা কাটিয়ে এলাম। কোথায় কাপালিক সন্ন্যাসী আর কোথায় তার শবসাধন। আমি যে ভয় পাবার পাত্র নই তা প্রমাণ করবার জন্যই লণ্ঠন নিয়ে উঠানে নামতে যাব এমনি সময় বাঁড়ুজ্যে খপ ক'রে আমার কাপড় টেনে ধরল। ছেলেমানুষি ভাল লাগল না, কাপড় ছিনিয়ে উঠানে নেমে পড়লাম। সদর রাস্তায় পৌঁছুতেই মেয়েটি যেদিকে যাচ্ছিল সেই দিকে হন্‌ হন্‌ করে চলতে লাগলাম। হাঁটার গতি প্রায় দৌড়ের সমান হয়ে গিয়েছিল, তথাপি মেয়েটিকে দেখতে পেলাম না। সোজা রাস্তা, কোনদিকে মাইলখানেকের মধ্যে বাঁক নেই, দু'পাশে বেতের কাঁটা-বন ও নীলকর সাহেবদের কাটা খাল। খাল পাঁকে ভরা, পা পড়লে চোরাবালির মত তলিয়ে যেতে হয়। এমন একটি জায়গায় মেয়েটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না।

খটকা নিয়ে ফিরতে হ'ল। বাঁড়ুজ্যে বললে, খুঁজতে গিয়েছিলে বুঝি? যা করেছ তা করেছ, অমন কাজটি আর করতে যেও না। তোমাকে জড়ালে প্রাণে মরে যাবে। প্রাণের মায়া থাকলে এইটুকু জেনে রাখা ভাল যে, ওর নজর লাগায় ইতিমধ্যে তিন জন গত হয়েছে। আমি বলি, আজকের রাতটা আমার এখানেই থেকে যাও। সত্যি কথা বলতে কি, যা দেখলাম তার পর আর একলা থাকার সাহস নেই। অনুরোধের পিছনে এমন একটা ভয়ের আভাস পেলাম যে বেচারাকে একলা ফেলে যেতে মন চাইল না। আমার আশ্বাসবাণী শুনে বন্ধুর ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল।

পরের দিন মহাল-ফেরত বরকন্দাজ এল ছাউনিওয়ালা গরুর গাড়ী নিয়ে। দলিল-ভর্তি তিন-চারটে প্যাঁটরা গাড়ীতে বোঝাই করে বাঁড়ুজ্যে বরকন্দাজ সহ স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে গেল। যাবার সময় বিশেষভাবে বলে গিয়েছিল, আমি যেন তার অনুপস্থিতিতে কয়েকদিন কাছারিবাড়ীতে থাকি। তাড়াতাড়িতে অনেক দরকারী দলিল লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে, শত্রুর দল খোঁজ পেলে কাজ গুছিয়ে নেবে।

আমার ঘরটান বলতে কিছু ছিল না। একা মানুষ, কোথায় থাকি তার

জন্য জবাবদিহির আশঙ্কা না থাকায় বন্ধুর অনুরোধ মানলাম। আমার সখের মধ্যে ছিল মাছ ধরা এবং সুযোগ পেলে বল্লম দিয়ে শুয়োর মারা। বল্লমের কৃপায় চামার মহলে আমার প্রতিপত্তি ছিল। সাংস ও শক্তির জন্যে না হলেও মাংস হওয়ায় ওদের ভোজের যোগাড় ভালই হ'ত। কিছুদিন থেকে এ দিক্‌টায় দাঁতাল বরাহের উৎপাত খুবই বেড়ে উঠেছে। শিকারীর কাছে এ-সব খবর পৌঁছতে সময় লাগে না। আমি নিজেই ঠিক করেছিলাম, বাঁড়ুজ্যের কাছারি বাড়ীতে আড্ডা গেড়ে কয়েকদিন সখ মিটিয়ে যাব। কপাল-গুণে মেয়েটির উদ্ধারে যাচিত সুযোগ পেয়ে গেলাম।

বাঁড়ুজ্যে চলে যাবার পরই চামারদের সর্দারকে ডাকিয়ে পাঠালাম। সর্দারের সঙ্গে কথা হ'ল, বললে, দু'জন লোক পাঠিয়ে দেবে। লোকটা প্রতিশ্রুতি রেখেছিল, বিকেলের দিকে দু'জন লোক এসে হাজির। তাদের মধ্যে একজন চেনা, নাম রঘু: বেজায় জোয়ান দেহে মেদের বাহুল্য মাত্র নেই। মাথাটা অস্বাভাবিকভাবে চ্যাপ্‌টা, দেখলেই মনে হয় ভিতরে সার পদার্থের অভাব। আমি যে জন্যে ওদের সাহায্য চেয়েছিলাম তাতে মাথার কাজ বিশেষ নেই। নিরাপদ স্থান থেকে শুয়োর হাঁকিয়ে আমার দিকে চালাতে পারলেই ওদের কর্তব্য শেষ।

গত রাত্রের কথা মাথায় ঘুরছিল। নীলকুঠির দিকে ঘুরে না আসতে পারলে স্থির হতে পারছিলাম না। দিনের বেলা জায়গাটা দেখে আসতে পারলে, ওখানে পাহারাদের ব্যবস্থা ভেবেচিন্তে করা যায়। সংক্ষেপে, ডবল মতলব নিয়ে নীলকুঠির চৌহদ্দি পরীক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল। রঘুর হাতে ধারাল টাঙ্গি দিয়ে বললাম, চল্, নীলকুঠির আওতায় ঘুরে আসি, ভাল ক'রে ঝোপ পেটাতে পারলে তোদের মনের মত কিছু পাওয়া যেতে পারে। ওদিকে মানুষ চলে না, নিরিবিলিতে শুয়োরের আড্ডা ঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে। নীলকুঠির নাম উঠতেই, তাড়াতাড়ি ধারাল অস্ত্রটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে, শুয়োরের সঙ্গে যদি আর কিছু বেরিয়ে আসে? প্রশ্নের সঙ্গে আতঙ্ক জড়িয়ে ছিল। বুঝলাম, আর কিছুর উল্লেখে কি জানতে চেয়েছে। ভয় কাটিয়ে দেবার দরকার থাকায় জোর দিয়েই বলতে হ'ল, ওখানে আবার কি থাকবে? যা শুনেছিস্ তা বাজে কথা। চামারের ছেলে, টাঙ্গি চালাতে জানিস্ না! লোকে শুনলে তোকে বলবে কি? এ অঞ্চলের চামাররা বাস্তবিকই বেজায় সাহসী। ওদের মধ্যে সাহস দেখান সেরা গুণ। এই কারণে পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকে ডাকাতি করতে

গিয়ে জেল খেটেছে, খুন হয়েছে, আর কত কি ঘটেছে তার ঠিক নেই। রঘুর সাহসের প্রতি কটাক্ষ করেও ফল পেলাম না। লোকটা মাথা চুলকে বললে, নীলকুঠির কথা ত সর্দার বলেনি। ঝোপ ভাঙ্গতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। সাঁঝের বেলায় ও তল্লাটে থাকছি না। বাবু, এক বৎসরের ভিতর ওখানে তিন জনে সাবাড় হয়ে গেল। যারা ম'লো তারা কিছুই করেনি বাবু, কেবল বিলাতী মদ খুঁজতে গিয়েছিল। নীলকর সাহেবদের নাকি পিপে ভর্তি মাল ওখানে মজুত আছে। মহুয়া আর ধেনো খাওয়া অভ্যেস, সাহেবী চালের পিছনে ধাওয়া কেন? সাঁঝের বেলাতেই গা ঢাকা দিয়ে কাজ সারতে গিয়েছিল। ওদিকে যাওয়া আর কি সব দেখা, তার পরই কি হ'ল কে জানে। জ্বর নিয়ে বাসায় ফিরল, সঙ্গে সঙ্গে দু'জনারই তড়কা। কচিমুদ্দিন ওঝা এসে কত ঝাড় ফুঁক করল, কিছুই হ'ল না, দু'জনাই জোড়ে মরল। ওদের আগে যে গিয়েছিল সে ত উবেই গেল। আজও তার পাত্তা নেই। অনেকে বলে, পুলটি গ্রামের পাঁ-রা ওকে গুমি করে দিয়েছে। পুরানো রেষারেষি থাকলে আমাদের মধ্যে অমনটি হয় বটে, কিন্তু আসল কথা তা নয়। লোকটাকে ঐ—নাম করতে নেই, সে-ই নিয়েছে। দোহাই বাবু, ওদিকটা ঘাঁটিও না। রঘুর কথা শুনে আর একটা লোকও বিগড়ে বসল।

অবস্থা যে রকম দাঁড়াল তাতে একলা যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকল না। এরই ভিতর আকাশ ঘোর ঘটা করে কালো হয়ে এসেছে। মাঘের শেষে দু'চার পশলা বৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু আকাশের এইরূপ সাজগোজ সচরাচর দেখা যায় না। সন্ধ্যা হবার আগে ফিরতে হলে এখনই বেরিয়ে পড়তে হয়।

কাছারিবাড়ী থেকে নীলকুঠি খুব বেশী দূর নয়, মাইলখানেকের কিছু বেশী হবে। পা চালিয়ে চলেছিলাম, অল্প সময়ের ভিতর গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছালাম। সদর রাস্তার ধারেই পাঁচিল-ঘেরা বাড়ী। পাঁচিলের বেশীর ভাগই ধ্বসে গিয়েছে। কতক অংশ হেলে পড়েছে। মোটা গাছের শিকড় বেঁধে না রাখলে ধূলিসাৎ হয়ে যেত। প্রবেশপথের রাস্তা বেশ চওড়া, দেউড়ি দিয়ে স্বচ্ছন্দে দুটো গাড়ী পাশাপাশি যেতে পারে। দেউড়িতে দরজা না থাকলেও ভিতরে আসায় বাধার অভাব নেই। ঘন বাবলা গাছের ঝোপ থেকে আরম্ভ করে যত রকমের আগাছা ও কাঁটাবন নির্বিবাদে বেড়ে উঠেছে।

বল্লমের ডগা দিয়ে পায়ের তলায় আগাছা ও মাথার উপর ডালপালা সরিয়ে

এক-পা দু-পা করে এগোচ্ছিলাম। হাত দিয়ে ডাল সরাতে গিয়ে সাপ ধ'রে ফেলা কিছুই আশ্চর্য্যের নয়। অভিজ্ঞতা কাছে থাকায় সাবধানতাকে অগ্রাহ্য করতে পারিনি। রাস্তা অতীত যুগে খোয়া দিয়ে বাঁধান হয়েছিল, এখনও তার প্রমাণ দুই-এক জায়গায় পাওয়া যায়, কিন্তু বেশীর ভাগই ধুলোয় চাপা পড়েছে। ধুলোর উপর যে-সব জানোয়ারের পায়ের দাগ পড়েছে তাতে বোঝা যায়, শুয়োরেরই আনাগোনা বেশী। সাপ ও শেয়ালের যাতায়াতও আসছে। চলতে চলতে বাড়ীর কাছে এসে পৌছলাম। একতলা হলে কি হয়, আকার তার ছোটখাট প্রাসাদের মত। সামনেই বেজায় চওড়া ও তেমনই লম্বা বারান্দা, মেঝে শ্লেট জাতীয় কালো পাথরে বাঁধান। খুব সম্ভবতঃ সাহেব-মেমদের জোড়ে নাচের ব্যবস্থা এখানেই হ'ত। দরজা-জানালা নেই বললেই চলে। যে কয়টি এখন চৌকাঠের সঙ্গে লেগে আছে সেগুলিও অকেজো। মরচের কৃপায় খোলা জানালা বন্ধ হয় না এবং বন্ধকেও খোলা সম্ভব নয়। বারান্দাতেও ইচ্ছামত চলাফেরায় বিঘ্ন অনেক। মেজেতে বাঁধান পাথর এমনভাবেই স্থানচ্যুত হয়েছে যে, নজর ঠিক না রাখলে কথায় কথায় ঠোকর খেতে হয়। তা ছাড়া ফাটলের ফাঁকে ফাঁকে ভয়াল গর্তের সমাবেশ, কোথা থেকে কি যে উঁকি মারবে ঠিক নেই। ফাটলবাসীদের এড়ালেও ছাদ ফুটো ক'রে নেমে-আসা গাছের শিকড় সারা বারান্দায় পল্টনের মত 'অ্যাটেনশনে' দাঁড়িয়ে আছে. প্রায় একটির গায়ে আর একটি লাগা। যেগুলি বটের বংশজাত সেগুলির সংখ্যাই বেশী।

বারান্দার পাশেই সারবন্দী ঘর। একটি ঘর থেকে আর একটিতে যেতে হলে বারান্দা ঘুরে যেতে হয়, দ্বিতীয় পথ নেই। দেয়ালে শ্যাওলার আবরণ যেখানে নেই সেখানে পঙ্কের পালিশ এখনও জৌলুস বজায় রেখেছে। দেয়ালে এক জায়গায় দেখলাম, পেরেকের আঁচড় দিয়ে তাড়াতাড়ি বাংলায় কিছু লেখার চেষ্টা হয়েছিল। কাছে এসে পড়বার চেষ্টা করলাম, কিন্তু উপযুক্ত আলোর অভাবে সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হ'ল না। তবু যেটুকু পড়তে পারলাম তাতে বুঝলাম, লেখক বা লেখিকাকে কেহ বাধা দিয়েছিল, শেষের দিকে পেরেকের আঁচড় লম্বা হয়ে গিয়েছে। যতটুকু পড়তে পেরেছিলাম তা এইরূপ—"আমাকে বাঁচাও, ওরা আমাকে"—অসমাপ্ত সঙ্কেত রহস্যপূর্ণ হয়ে উঠল। এ ঘর ছেড়ে একটার পর একটা ঘর পরীক্ষা করতে লাগলাম। কোথাও আর কোন লেখার হদিশ পেলাম না। শেষ পর্যন্ত বারান্দার অন্তিম কোণায় এসে উপস্থিত হলাম।

এখানেই শেষ ঘরের কবাট টিকে গিয়েছে এবং ভিতর থেকে বন্ধ। উই-পোকার অত্যাচারেও শিশু-কাঠকে জখম করতে পারেনি। জোর দিয়ে খোলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোন ফল পেলাম না। কবে যে এই দরজা বন্ধ হয়েছিল তা অনুমান করা শক্ত। পাল্লা ও চৌকাঠের মাঝে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ছোট ও বড় মাকড়সার জালে ভরা। কোনটিতেই কীটের অস্তিত্ব নেই, ওরাও বহু দিন আগে মরেছে। চিন্তার বিষয় হ'ল, কি করে ঘরের ভিতর ঢোকা যায়। পিছন থেকে রাস্তা বার করাও অসম্ভব, কাঁটাযুক্ত বেতের ঝাড় নিজেরাই জড়ামুড়ি ক'রে ঠাস বুনন তৈরী করে নিয়েছে। শরীরের প্রতি মায়া থাকলে ওদিকে যাওয়া চলে না। পথ বার করবার চিন্তায় অনেকক্ষণ কেটে গেল। খোঁজার তাগিদে এমনই বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম যে, সময় কখন সন্ধ্যার দিকে হেলেছিল বুঝতে পারিনি। ঘোলাটে আকাশ ঝাপ্সা আলো মাথায় নিয়ে বার হওয়াই রকমারি হয়েছিল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যার কোন প্রভেদ খুঁজে পাওয়া যায় না। কি করব ভাবছি, এমন সময় মুষলধারায় বৃষ্টি নামল, তার সঙ্গে ঝড় ও বজ্রপাত। দেখতে দেখতে অন্ধকারে ডুবতে লাগলাম। একে শীতের রাত, তার উপর ভিজে বাসায় ফিরলে নিউমোনিয়ার আক্রোশ থেকে নিষ্কৃতি নেই, তার উপর চিকিৎসার জন্য ওঝা ডাকতে হলে রঘুর ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। মৃত্যুকে ডেকে চতুর্থের অভাব পূরণ করে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। রাতটা নীলকুঠিতেই কাটিয়ে দেব কি না ভাবছি, এমন সময় সেই পরিচিত আর্তনাদ শুনলাম। কে যেন মেয়েটির গলা টিপে ধরেছে, কথা যা বার হচ্ছে তা বোঝা যায় না। আওয়াজ আসছিল কোণের ঘর থেকে। হঠাৎ আওয়াজ থেমে গেল এবং পরক্ষণেই দেখলাম, কালকের সেই মেয়েটি আবার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, স্থির দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দেখছে, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, ও দৃষ্টি কথা বলে। চাহনির ভাষায় আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে, খুঁজো না, ফিরে যাও, ফিরে যাও। যে দৃশ্যের সামনে পড়েছিলাম তাতে সাহস হাতছাড়া হবার যোগাড় হয়েছিল। ভয়কে এড়াবার কোন উপায় না থাকায় কি করব ভাবছি, এমন সময় অনুভব করলাম, গোড়ালিতে কি একটা জড়াচ্ছে। সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। ক্ষণিকের জন্য কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম, সঙ্কট অবস্থায় কিভাবে মনে বল পেয়েছিলাম বলতে পারি না, হঠাৎ সমস্ত শক্তি দিয়ে পা ঝাড়া দিলাম। ঝাঁকুনিতে পায়ে জড়ান জীবটি ছিট্‌কে দূরে গিয়ে পড়ল। দূরে পড়লেও ওদের চরিত্র বিশ্বাস

করা চলে না, আড়ষ্ট অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। সামান্য নড়াচড়া দেখলেই তেড়ে আসবে। বেশ খানিকক্ষণ অটলভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। কান খাড়া করে থাকতে হ'ল কোন নড়াচড়া শব্দের দিকে। সমস্ত চিন্তা এদিকে দেওয়ায় নারীর মর্মভেদী দৃষ্টিকে ভুলেছিলাম। নিজের অজ্ঞাতেই একটু পরে ঐদিকে মুখ ফেরালাম, মেয়েটিকে দেখতে পেলাম না। গোড়ালিতে বুকে হাঁটা জীবটি জড়িয়ে না ধরলে হয়ত অন্ধকারেই খোঁজার চেষ্টা করতাম, সাহসকে হাতছাড়া হতে দিতাম না।

এই সময়ের ভিতর ছাদের ফুটো থেকে যে জল ঝরছিল তা বুঝতে পারিনি। জায়গা বদল করে একটু সরে দাঁড়ালাম। সেখানেও নিস্তার পেলাম না। বাধ্য হয়ে এখান থেকে ওখানে যেতে দেখি, ঘুরে ফিরে আবার সেই কোণের ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

কিছুক্ষণ বাদে বৃষ্টি কমল বটে, কিন্তু বদ্ধ ঘরের ভিতরে যে-সব শব্দ শুরু হ'ল তা শুনলে রোম খাড়া হয়ে ওঠে। ভিতরে অনেকগুলি মানুষ একসঙ্গে কথা বলছিল, ওদের উচ্চারণ তালগোল-পাকানো: অর্থকরণ সম্ভব হ'ল না।

এই ভাবে যখন ভয়ের আনাগোনা চলছিল তখন বুঝলাম বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না। মন বেশ কাবু হয়েছে, শরীরও অবসাদগ্রস্ত। কোথাও বসবার ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু স্থির হয়ে বসি কোথায়? ছাদ বয়ে জল পড়ার বিরাম নেই। সমস্ত বারান্দা ভিজে চপ্‌চপে হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ হানার অপেক্ষায় রইলাম, যদি একটা থান ইট কোথাও পাওয়া যায়। ভাগ্যক্রমে আলো পেতে কাছেই প্রার্থিত বস্তুটি দেখতে পেলাম। উচ্চাসনের ব্যবস্থা হলে কবাটের গায়েই ঠেসান দিয়ে বসলাম।

কিছুক্ষণ বাদে ঝড় ও বৃষ্টির কতকটা বিরাম হ'ল। সামনে অভেদ্য অন্ধকার, যেন কালো নীরেট পাথরের দেয়াল তুলে দিয়েছে। চোখ থাকতে অন্ধ হয়ে বসে রইলাম। কত রাত হ'ল কিছুই জানি না। কাঠে হেলান দেওয়ায় যেটুকু আরাম পেয়েছিলাম, তাতেই তন্দ্রার ঘোর এসে গেল। অর্ধঘুমন্ত অবস্থায় যেসব ঘটনার মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম তাদের বর্ণনা দেওয়া বৃথা, কারণ, সব-কিছুর যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন। শেষ পর্যন্ত সত্যই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

পরের দিন ঘুম ভাঙল বেশ বেলায়। প্রথমেই মনে পড়ল সেই মেয়েটির কথা। যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল, অনুমানের উপর নির্ভর করে সেই জায়গাটি পরীক্ষা করলাম, কোন পদচিহ্ন নেই। শূন্যচারিণী না হলে, ভেজা নরম মাটিতে

কোন দেহীর গতায়াত লুকানো সম্ভব নয়। নারী অন্তর্ধান করবার পর ঐ জায়গায় একটি শুয়োরকে দেখেছিলাম। চতুষ্পদীয়ের খবর নিতে গিয়ে একটি গোটা পালের সন্ধান পাওয়া গেল! যেটি পালের গোদা সেটিই আমাকে মানুষ ভেবে সন্দিগ্ধ হয়েছিল। চার পায়ের উপর সমস্ত দেহের সমভার রাখা মানেই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। নেহাত কপালজোর, তাই যা ঘটা উচিত ছিল তা ঘটেনি। রাত্রের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে দেখলাম, দুষ্ট প্রতারণা করলেও এখানে অনেক কিছু আছে যাদের সঠিক খবর পেলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অযথা ভয় থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া যেতে পারে। স্থির করে ফেললাম, আবার আসতে হবে এবং পরীক্ষার জন্য যতটা সময় পারি এখানেই কাটাব।

তিন দিন হয়ে গেল, বাঁড়ুজ্যের দেখা নেই। এই কারণে আমার কোন অভিযোগ ছিল না। বরং অনুপস্থিতি আমার কাজেই লাগছিল। রোজই নীল-কুঠিতে যাই, আঁচড়-কাটা লেখা পড়ি—প্রতিটি ঘরে পরীক্ষা চলে, বিশেষ কিছু ফল পাই না। যে ঘরে মেয়েটির চোখ বলেছিল, 'ফিরে যাও' সেই ঘরে ঢুকলেই, ফেরার চেয়ে খোঁজার টান বেড়ে উঠতে লাগল। দেয়ালে আঁচড়কাটা কয়েকটি কথা প'ড়ে নানারকম মানে করতে লাগলাম। রুদ্ধ কবাটকে নিয়েই চিন্তা জড়িয়ে ছিল। কবাট খুলতে না পারি, ঐ ঘরে ঢোকার নিশ্চয় অন্য কোন পথ আছে! হয়ত লেখক বা লেখিকা এ খবর জানত এবং নিশ্চয় এই ঘরেই পথ-নির্দেশের কোন সঙ্কেত রেখে গিয়েছে!

ঘরে একটিমাত্র জানালা। জানালার ঠিক পিছনেই বাবলা গাছের ভিড়। একটি ডাল ঘরের ভিতর এসে পড়েছিল। সরু ডাল অস্বাভাবিকভাবে নড়তে দেখে অদ্ভুত লাগল। শুধু ডাল নড়ছিল না, তার সঙ্গে জড়ান একটি মোটা লতাকে দেখলাম সচল হয়ে উঠেছে। দৃষ্টিভ্রমের দরুন ঝাপসা আলোয় এখানে অনেক কিছু দেখেছি, কিন্তু দিনের বেলায় অচল ডাল নড়ে-চড়ে লম্বা হতে পারে, এমনটি স্বচক্ষে দেখে দৃষ্টিকে অবিশ্বাস করতে পারছিলাম না। অল্পক্ষণের মধ্যে চলন্ত লতা ঘরের ভিতর এসে পড়ল। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই, একটি পূর্ণকায় সাপ, একেবারে জাত গোক্ষুর। খানিকটা আমার দিকে আসতেই হঠাৎ ফণা তুলে স্থিরভাবে আমাকে দেখতে লাগল। হাতেই বল্লম ছিল, কালবিলম্ব না করে মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলাম। লক্ষ্যভেদ ভালই হয়েছিল। বল্লম সাপের মাথা ভেদ করে কাঠের মত কিছুর উপর বিঁধে গেল এবং যে-ভাবে পড়ল সেই ভাবেই বাঁকা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। এর পরেই বল্লম-বিদ্ধ

সাপের বাকি দেহটার দারুণভাবে উত্থান-পতন শুরু হ'ল। যতবার মাথার কাছে দেহাংশ আছাড় খেয়ে পড়ছিল ততবারই বল্লমের তলায় ফাঁপা জায়গার সঙ্কেত পাচ্ছিলাম।

পাথরে বাঁধান মেজের তলায় ফাঁপা আওয়াজ আমার অনুসন্ধিৎসু মনকে উত্তেজিত করে তুলল। সন্দেহকে শান্ত করতে হলে সাপের মাথা যেখানে আটক পড়েছে সেই জায়গাটি ভাল করে দেখতে হয়। জায়গাটা শুধু ফাঁপা নয়, কাঠের আড়াল দিয়ে ঢাকা। নিশ্চয় ওখানে কাঠের সিন্দুক জাতীয় কিছু পোঁতা আছে। যদি সিন্দুক হয় তা হলে ওর ভিতর অনেক কিছুর খবর পাওয়া যেতে পারে। ওখানে যেতে হলে সাপের নড়াচড়া আগে বন্ধ করতে হয়। বিষধরের মাথাকে একেবারে থেঁতলে না দিলে বুকে হাঁটা জীবটি তার দাঁতকে কাজে লাগাতে পারে। মনে পড়ল, গত রাত্রে খুঁজে পাওয়া থান ইঁটের কথা। বারান্দা থেকে সেটি তুলে এনে মাথাটা একেবারে পিষে দিলাম। সাপ এমন জীব যে মাথা না থাকলেও সময়মত মরতে চায় না। দেহের ওলটপালট সমানভাবেই চলছিল। কামড়ের ভয় না থাকলেও দৃশ্যটি ভীতিপ্রদ। পকেটে শিকারীর ছুরি ছিল, তাই দিয়ে গলার কাছ থেকে মাথাটা কেটে ফেললাম। এর পর কাঠের কামড় থেকে উদ্ধার করবার জন্য বল্লমকে টান মারলাম। কাঠ,মরণ কামড় কামড়ে ছিল, সিন্দুকের ডালা পর্যন্ত খানিকটা উঠে এল। সবটা খুলল না, বল্লমের পিছনটা দেয়ালে ঠেকে যাওয়ায়। যেটুকু খুলেছিল তাতেই এক ঝলক আলো আমার মুখের উপর এসে পড়ল। মাটির তলায় সূর্যালোক আমাকে স্তম্ভিত করে দিল। পুনরায় সিন্দুকের ডালা বন্ধ করে তার উপর দাঁড়ালাম, তারপর বল্লম টেনে-হিঁচড়ে বহু কষ্টে উদ্ধার করলাম। বল্লম উদ্ধার করতে গিয়ে সিন্দুকের ডালার উপর যে নাড়াচাড়া হয়েছিল তাতে পুরু ধূলো অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। পায়ের তলায় দেখলাম, একটি বড়সড় পিতলের আংটা। ওখান থেকে সরে এসে আংটা ধরে টান দিতে সমস্ত ডালা খুলে গেল। নীচে দেখি ধাপের পর ধাপ পাথরের সিঁড়ি রয়েছে। বেজায় উঁচু ধাপ এবং সিঁড়ি খাড়াইভাবে নীচের ঘরে নেমে গিয়েছে—মেজে থেকে ঘরের ছাদ হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায় কিন্তু সিঁড়িটি ব্যবহার করতে হলে বাঁশের মইয়ের মত ব্যবহার না করে উপায় নেই, অর্থাৎ মইয়ের দিকে মুখ রেখেই নামা-ওঠা করতে হয়, নামবার সময় সামনে তাকানো চলে না। নীচে পরীক্ষার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল, কিন্তু প্রবেশপথের ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ কবাট নিয়ে ফাঁপরে পড়ে গেলাম। ডালাটি খুললে

কভার গঠনের জন্যে খাড়াই থাকে উল্টো দিকে, মেঝের উপর পড়ে যায় না।

ভিতরে যাওয়ার পর হাওয়া বা অন্য কোন কারণে কবাট বন্ধ হয়ে গেলেই ত চমৎকার। কবাটের ওজন অনুমানের সাহায্যে কতকটা ঠিক হতে সাহস পেলাম, পড়ে গেলেও মাটির তলায় জীবন্ত গোর হয়ে যাবে না। নীচে নামা সম্বন্ধে তখন সামান্য দ্বিধা ছিল, কারণ কবাট খুলতেই কেমন একটা উগ্র গন্ধ পেয়েছিলাম। বদ্ধ বায়ু বিষাক্ত হয়ে থাকলে মারাত্মক বিপদকে সঙ্গে নিয়েই ওদিকে যেতে হবে। কিছুক্ষণ প্রবেশদ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকায় বুঝলাম, গন্ধ সুরার। আগেকার গল্পের সঙ্গে সত্যের যোগ খুঁজে পাওয়ায়, নির্ভয়ে নীচে নেমে গেলাম। ঘরে ঢুকতেই উগ্র গন্ধের সূত্র ধরা পড়ল, দেখলাম সার সার কাঠের পিপে সাজান রয়েছে। একটি দেয়ালে খুব বড় দরজা, নিশ্চয় এই দিক দিয়ে সুরাধারগুলি ঘরে আনা হ'ত। একটি পিপে কোন কারণে ফুটো হয়ে গিয়েছিল, তারই তলায় অনেকটা জায়গার রং মেজের অন্য অংশের তুলনায় আলাদা। রং কতকটা রক্ত শুকিয়ে যাবার মত।

ঘরটি যে কোন সময় সাহেবদের রস-ভাণ্ডার হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত সে বিষয়ে সন্দেহ রইল না। ঘরের ভিতর আলো আসার ব্যবস্থাও বিস্ময়কর। দেয়ালের উপর অনেকগুলি আয়না এমন বিচিত্রভাবে সাজান যে, সমস্ত দিন রোদের ছটা কোন না কোনটা থেকে প্রতিফলিত হয়ে ঘরের মাঝখানে এসে পড়ে। হয়ত ঘরের মাঝখানে এসে পড়ে। হয়ত ঘরের বাইরেও সূর্যালোক গ্রহণের জন্য ঐরূপ আয়োজন আছে। আসবাবপত্রের মধ্যে একটি কাঠের টেবিল ও চেয়ার ছাড়া আর কিছু নেই। একটি দেয়ালের গায়ে তিনটি কাঁচের আলমারী। সব কয়টিই দেয়ালের ভিতরে ঢোকানো এবং বন্ধ। আলমারীর ভিতরে নানা রকম সুরাপাত্র সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, আজও সেগুলি যথাস্থানে বিরাজ করছে। স্থাপত্যের সঙ্গে আলমারীর যোগ থাকায় তিনটিতে কেমন খাপছাড়া লাগছিল। গরমিলের স্থানটি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে মাটির গাঁথুনি খানিকটা ধ্বসে যাওয়ায়। গরমিলের জায়গা মাত্র এক ইঁটের দেয়াল, যেখান থেকে ইঁট ধ্বসে গিয়েছে সেখানে ভিতর দিকে গাঢ় অন্ধকারের সৃষ্টি হওয়ায় দূর থেকেই অনুমান করা চলে ভিতরটি ফাঁপা। নিশ্চয় কোন আকস্মিক ঘটনাকে আড়াল দেবার জন্যে ঐরূপটি ঘটেছিল। ধ্বসে-যাওয়া গর্তের কাছে বল্লমের উল্টো দিক দিয়ে ঠেলা মারতে অনেকগুলি ইঁট একসঙ্গে তলায় পড়ে গেল। খানিকটা

জায়গা ফাঁপা হয়ে যেতে একটি ঘরের প্রবেশপথ বেরিয়ে পড়ল। ভিতরে মসী কালো অন্ধকার, তার উপর বিটকেল গন্ধ। ভিন্ন উপদ্রবেরও কমতি ছিল না। উপর থেকে নেমে-আসা গাছের শিকড় দেয়ালের বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে স্প্রিংয়ের মত ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগল। তার সঙ্গে দু' একটা ভাঙা ইঁটের টুকরাও গায়ে এসে পড়ল। দম দেওয়া চাবুকের মত শিকড়ের কশাঘাতে প্রায় দাগী হবার যোগাড় হয়েছিলাম। একটু পিছিয়ে এসে ভাবতে লাগলাম, এদের উৎপাত এড়িয়ে ঘরের ভিতর ঢোকা যায় কেমন করে। চিন্তা বেশী দূর এগোবার আগেই আকৃষ্ট হলাম একটি নরমুণ্ডের প্রতি। ইঁটের স্তূপের ভিতরে দেখলাম, মানুষের মাথার খুলি। কতকগুলি ইঁট সরাতে দেহাংশের অনেক হাড় বেরিয়ে পড়ল, তার সঙ্গে চুড়ি পরা একটি হাতের হাড়ও ছিল। গহনার নক্সা পুরাতন—কোন একদিন কার নিটোল মাংসকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিল। হত্যার রহস্যে জড়িয়ে পড়লাম।

কল্পনা যখন অতীতের সম্ভব অসম্ভব কাহিনী গড়ে তুলছিল, সেই সময় ঘর অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল। উপরে আলো-বাতাস আসার ফাটল থেকে সোঁ সোঁ শব্দ শুরু হ'ল। যেন প্রেতলোকবাসী প্রহরীদের ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস একযোগে একই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসছে। মড়ার নিঃশ্বাসে বায়ু বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডার সঙ্গে শুনছি মেঘ গর্জনের মত হুঙ্কার। মহানিদ্রার কোলে জেগে উঠেছে পুঞ্জীভূত নরকঙ্কাল, চোখের সামনে দেখছি ওদের নড়াচড়া। হঠাৎ একটি হাড় ঠিকরে এসে পড়ল আমার পায়ের তলায়। হাড়ের চলাফেরা দেখে আমার রক্ত হিম হয়ে আসতে লাগল। জায়গাটি পরিত্যাগ করবার জন্য দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না, সর্বাঙ্গ পঙ্গুর মত হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ মড়ার খুলি শূন্যে উঠে পড়ল, তার পরই সুরু হ'ল চোয়ালের উত্থান-পতন। দাঁতে দাঁতে কি সংঘাতিক সংঘর্ষণ। মুণ্ড এতক্ষণ আমার মুখের সামনেই দুলছিল কতকটা বড় ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত। ঘড়ি দোলন যন্ত্র-চালিত সময় ধরে নির্দিষ্ট পথে চলে, কিন্তু কঙ্কালের অস্থিরতা আসছিল অন্তরের আবেগ থেকে, বোধ হয় অতীতের কাহিনী বলতে চায়। একবার আমার কানের অতি নিকটে এসে নীচের চোয়াল খানিকটা খুলে গেল, কিন্তু যা বলতে চাইল তা বলা হ'ল না। এরই মধ্যে দেখি, চোখের শূন্য কোটরে দৃষ্টির সঞ্চার হয়েছে। মড়ার চোখ জ্বলছে। তার আবেষ্টনীর নিস্তব্ধতায় দম বন্ধ হবার উপক্রম। মনে

হ'ল, ভূগর্ভের তলায় সমাধির মধ্যে আটকে পড়েছি। ঝড় ওঠার আগে গুমট যেভাবে আকস্মিক আলোড়নের নির্দেশ দেয় সেইভাবে শব্দহীন আবেষ্টনী কোন সাংঘাতিক ঘটনার সঙ্কেত দিতে লাগল। অস্বস্তিকর আশঙ্কা চাক্ষুষ হতে সময় নিল না। হঠাৎ দোলায়মান নরমুণ্ড ঝড়ের বেগে আমার মুখের উপর এসে পড়ল; কঙ্কাল প্রাণবান্ হয়ে উঠেছিল। প্রচণ্ড চুম্বনে আমার ঠোঁট ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। পৈশাচিক রস-নিবেদনে চতুর্দ্দিকে জয়োল্লাসের প্রতিধ্বনি শুনতে লাগলাম। কখন ভয়াল অট্টহাসি, কখন কর্কশ সঙ্গীতালাপ, কখন উন্মাদের করতালি। আর কত রকম শব্দ শুনছিলাম তার বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বুভুক্ষু কঙ্কাল, জীবন্ত মাংসের আস্বাদ পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, বাসনার সম্পূর্ণ তৃপ্তি না হওয়া পর্যন্ত শান্ত হতে পারছিল না। মুণ্ড পুনরায় আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। বাধা দেবার অধিকার না থাকায় যে কোন নির্লজ্জ আচরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, কঙ্কাল অদৃশ্য হয়ে গেল। পর মুহূর্ত্তে দেখলাম একটি পূর্ণাঙ্গী নারী অগ্ন্যুত্তপ্ত যৌবনশ্রী নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে। তার কোমলে কঠিনে মেশা নিটোল অঙ্গে আগুনের উত্তাপ থাকলেও সান্নিধ্য জ্বালাময় নয়। গড়নের মাধুর্যে প্রতিটি অঙ্গ প্রতিটির সহিত এমনভাবেই সামঞ্জস্যের যোগ ঘটিয়েছে যে মনে হয় লাবণ্যময়ী. অতীতের ক্ষণস্থায়ী সাময়িক সম্পদ দেখাবার জন্যই বস্তু নয়. সুন্দর যে কালজয়ী হতে পারে তাই প্রমাণ করবার জন্য রূপ ও রেখার অন্তর্নিহিত সত্যকে আমার সামনে ধরেছে। আমি বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম। কোন বাঞ্ছা ছিল না। কেবল দেখার মধ্যেই আনন্দ পাচ্ছিলাম। আপনহারা অবস্থায় কতক্ষণ এইভাবে মোহনরূপ দেখছিলাম বলতে পারি না। নারীর যৌবনদীপ্তি ক্রমে আমার দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত মোহাচ্ছন্নের মত হয়ে পড়লাম। এই অবস্থায় দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন ঘটল, দেখলাম সুন্দরীর রূপের পরিবর্ত্তন ঘটেছে। এখন সে আবরণের আড়াল টানলেও অবগুণ্ঠিতার শ্লথ বেশে যে স্বচ্ছতার আভাস ছিল তা তার উদ্ধত যৌবনকে শাসনাধীন করতে পারেনি। বসনের বাধা অগ্রাহ্য করে তা আত্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। উত্তেজনার ইঙ্গিত পাচ্ছি সর্বাঙ্গের মৃদু কম্পনে। যে নারীর অনাবৃত রূপকে অল্পক্ষণ আগে ভোগাতীত ভেবেছিলাম, যে সৌন্দর্যের সান্নিধ্যে মন শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, সেই অবর্ণনীয় রূপকেই বসনের আচ্ছাদনে ভিন্নভাবে দেখছি।

সতর্কিত লজ্জার সঙ্কেতে স্নিগ্ধ কান্তি বাসনার প্রতীক হয়ে উঠেছে। বেশ বুঝতে পারছি তার অলঙ্ঘনীয় প্রভাব ধীরে ধীরে আমার উপর শক্তি বিস্তার করেছে। সারাটা জীবন একটা আদর্শ অনুসরণ করে নিজেকে কঠোর সংযমের প্রাচীরের মধ্যে আটকে রেখেছিলাম, সেই বিশ্বস্ত আশ্রয় ভেঙে চুরমার হতে বসেছে।

নারীর ক্ষুধার্ত দৃষ্টি আমাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করার জন্য প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিম চাহনির দ্বারা আমাকে অনুসরণের ইঙ্গিত দিয়ে ঘরের দিকে চলে যেতে লাগল। প্রবেশপথে যেসব বাধা ইতিপূর্বে অলঙ্ঘনীয় ছিল এখন সেগুলি অন্তর্ধান করেছে। তার পিছনে চলতে লাগলাম।

অন্ধকারের ভিতর কি ভাবে অগ্রসর হচ্ছিলাম বলতে পারি না। একটার পর একটা ঘর পার হয়ে শেষ পর্য্যন্ত একটি বাঁধান সিঁড়ির সামনে উপস্থিত হলাম। বেশ চওড়া সিঁড়ি, ধাপগুলিও সহজ ব্যবহারযোগ্য। ভূগর্ভের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা দেখলে অনুমান করা চলে এখানেও লোকসমাগমের ব্যবস্থা হ'ত।

নারী শেষ ধাপ অতিক্রম করে চাতালের উপর দাঁড়াল। চাতালের সামনেই বড় দরজা। দরজায় বিশেষ প্রথায় টোকা মারতে কবাট ধীরে ধীরে খুলে যেতে লাগল। ভিতরে মস্ত বড় ঘর। এখানেও অন্ধকারের অভাব নেই, কিন্তু কেন বলতে পারি না, দেখার কোন অসুবিধা ছিল না। মন্ত্রমুগ্ধের মত নারীকে অনুসরণ করছিলাম। অনেকটা চলার পর একটি দেয়ালের সামনে মেয়েটি দাঁড়াল তার পর চোখের ইসারায় আমাকে ডাকল। আমি কাছেই ছিলাম, আরও কাছে আসতে বলায় ভীতিজড়িত পুলকে ভিতরটা দুরু দুরু করে উঠল। রক্ত শোষক চুম্বনের কথা ভুলিনি, ভাবতে লাগলাম, সত্যই কি এই অসামান্যা সুন্দরীর দৃঢ় অধর-পেষণে আমার ওষ্ঠ রক্তহীন হয়ে উঠেছিল? কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, অমন মাংস-পরিপুষ্ট গঠন, মড়ার হাড়ের উপর গড়ে উঠেছে। বিদেহিনীকে তাই এখন আর ভয় নেই। ধীরে নারীর দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। প্রতিটি পদবিক্ষেপে আমাদের মাঝে ব্যবধান কমে যাচ্ছে, হৃদয়ে ভূমিকম্পের মত আলোড়নের অনুভূতি পাচ্ছি। আর এক পা অগ্রসর হলেই ছোঁয়ার নাগালে এসে পড়ি, কিন্তু তার আগে বাধা পেলাম। নারী ঊর্দ্ধে হাত তুলে জানিয়ে দিল "আর না।"

এর পর যা শুনলাম তা নীরস উপদেশ, ছদ্মবেশী নীতির শাসন। শাসনের

বাণী আমাকে জানিয়ে গেল, "সবই ভুল, রূপের আকর্ষণ—কেবল মায়ার ডাক। এতেও কি বুঝতে পারনি? যে ভোগের বিনিময়ে দীর্ঘকালের ব্রতকে ধ্বংস করতে চলেছ, সংযমের প্রতি হতশ্রদ্ধ হয়েছ তা বুদ্বুদের মত ক্ষণস্থায়ী। যে রূপের আকর্ষণে তুমি নিজেকে হারিয়েছ, তা প্রাণহীন ও অসাড়। দেহী ও বিদেহী উভয়েরই রূপ এই জায়গায় প্রাণহীন ও অসাড়। অসাড়ের কাছ থেকে যেটুকু সাড়া পাও তা তোমারই ভাষার প্রতিধ্বনি, যে সৌন্দর্যের আকর্ষণে তুমি আত্মহারা তাকে তুমিই রূপ দিয়েছ।" উপদেশবাণী হঠাৎ থেমে গেল! আবেষ্টনী পুনরায় নিস্তব্ধতার চাপে ভারগ্রস্ত হয়ে উঠল। মন বিদ্রোহী হয়েছিল, স্থির চিত্তে ভাবলাম, হোক ক্ষণস্থায়ী, হোক প্রাণহীন অসাড়, হোক আমারই প্রতিধ্বনি, এই নারীকে আমার প্রয়োজন আছে। এ নারী কল্পনায় জন্মালেও তার অস্তিত্ব আমার কাছে অবাস্তব নয়। চাহনির ইসারায় বলে গেছে সে আছে এবং আমার জন্যই আছে। সে যেখানেই থাক তাকে খুঁজে বার করতে হবে।

সঙ্কল্প স্থির হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু দিশাহারাকে পথ দেখাবে কে, আমার গন্তব্য স্থানই বা কোথায়, কাকেই বা খুঁজতে চলেছি? বশীকরণ শক্তির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় সুন্দরীকে অনুসরণ করেছিলাম, তখন কোন্ দিক্ দক্ষিণ, কোন্ দিক্ উত্তর খোঁজ নেবার অবসর ছিল না। ঘুরে ফিরে একই প্রশ্ন মাথায় ঘুরতে লাগল, কিন্তু কোন সদুত্তর পাওয়ার আগেই অন্ধকার ভয়াল রূপ নিয়ে আমাকে ঘিরে ধরল। এমন রূপ কখনও দেখিনি। বর্ণনা দিতে হলে বলতে হয়, দেহ নেই, কান নেই, চোখ নেই, সংক্ষেপে কিছুই নেই, কেবল একটি আকৃতিহীন বিশাল মুখগহ্বর, আমি সেই গহ্বরের ভিতর অবর্ণনায় শোষণের টানে ঢুকে যাচ্ছি। আমার মুখ সামনের দিকেই রয়েছে অথচ গতি পিছন দিকে। আমার অবস্থা কতকটা সরীসৃপের গলাধঃকরণকালীন ভেকের মত। বায়ুহীন পথে পিছু হেঁটে চলেছি। সবই বুঝছি অথচ কিছু করবার নেই। অন্ধকারের গ্রাস থেকেও আমার মুক্তি নেই, কারণ, যাবতীয় দৃশ্যবস্তুকে আত্মসাৎ করাই অন্ধকারের ধর্ম।

এক জায়গায় দেখলাম, ক্ষীণ আলোকরশ্মি একটি শব্দের রূপ নিয়েছে। অনুমানের সাহায্যে যেটুকু পড়তে পারলাম তা "দক্ষিণ", একটি তীরফলকের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বিশেষ দিকের নির্দেশ দিচ্ছে; নারী ঐদিকেই যেতে বলেছিল। নির্দেশের পিছনে রূঢ় রসিকতা আত্মগোপন করে ছিল, কারণ তীরের ফলক যে দিক্‌কেই দক্ষিণ ব'লে স্থির করুক তা অনির্ভরযোগ্য। ইতিমধ্যে শোষণশক্তির

টান থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। অন্ধকারে চলার সময় একটি শুকনো কাঠে ঠোকর খেয়েছিলাম। লম্বা পাতলা কাঠ, ঠিকরে গিয়ে পড়ল তীর-সংযুক্ত শব্দের উপর। তার পরেই দেখি তীরের মাথা শোওয়া অবস্থায় নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

রোমাঞ্চকর দৃশ্য। জড়কে আপন গতিতে সচল হয়ে উঠতে দেখলে যে কোন সাহসী পুরুষকে ভয়াক্রান্ত হতে হয়। প্রথমটা আমাকেও বিচলিত হতে হয়েছিল, তবে এই জাতীয় অনেক ঘটনার সহিত ইতিমধ্যে পরিচয় হওয়ায় স্থিরচিত্তে কারণ খোঁজায় কোন অসুবিধা হ'ল না। আবিষ্কার করলাম, যেখানে তীরের উপর কাঠ ঠিকরে পড়েছিল সেখান থেকেই মেজেকে নীচের দিকে ঢালু করা হয়েছে।

যে কারণেই তীর সচল হয়ে থাক, সন্দেহ রইল না যে, আমাকে পথ দেখাবার জন্যই দিক্‌নির্ণয়ের অস্ত্রটি অপেক্ষা করছিল। সর্বশক্তি সংগ্রহ করে নিজেকে সামনের দিকে এগিয়ে দিলাম। পথ-প্রদর্শক সামনে থাকায় চলায় কোন বাধা পেলাম না। খানিকটা নীচে নামতেই আলোর সন্ধান পেলাম। এখানেও আগের প্রথায় উপর থেকে সূর্যরশ্মি সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে।

পথ একটি ঘরের সামনে এসে শেষ হ'ল। জায়গাটা চেনা চেনা লাগছিল, ভাল করে পরীক্ষা করতে বুঝলাম, ঠিক এই ঘরে না হলেও যে উগ্র গন্ধ আমাকে অভ্যর্থনা জানাল তার সঙ্গে ইতিপূর্বে পরিচয় হয়েছে। সামনেই দেখলাম সেই বিরাট্ কবাট। বায়ু চলাচলের জন্য উপর দিক্‌টা কাটা এবং জাল দিয়ে ঢাকা। দরজার জোড়ের জায়গায় যেটুকু ফাঁক ছিল তারই ভিতর দিয়ে দেখলাম, বাস্তবিকই ওপাশে পিপেগুলি সাজানো রয়েছে। এদিকে আসার সময় কতকগুলি পাতলা কাঠের টুকরো নজরে পড়েছিল। খুব সম্ভবতঃ এগুলি কোন পরিত্যক্ত পিপের ভগ্নাংশ। এদিক্‌টায় মেজে ঢালু করার উদ্দেশ্যে ধরা পড়ল, পিপেগুলিকে এই পথ দিয়েই ঘরের ভিতর নেওয়া হ'ত।

হতাশ হয়ে গেলাম। আমি ত শুক্‌নো কাঠ আর দুর্গন্ধযুক্ত পিপের সন্ধানে আসিনি। ছলনাময়ীর পীড়াদায়ক পরিহাসে মর্মান্তিক অভিযোগ উঠছিল।

এই সময় অতি নিকটেই দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনতে পেলাম। সান্ত্বনার ইঙ্গিতে মন আনন্দে ভরে উঠল। কিন্তু প্রত্যাশা সার্থক হ'ল না। দারুণ উচ্ছ্বাস প্রতিহত হতে মর্মাহত হয়ে অদৃশ্যাকে জানাতে চাইলাম, হৃদয় নিষ্পেষণ করা তোমার কাছে কৌতুকের বিষয়। রক্ত-রঙে রাঙা চুম্বনের যে চিহ্ন রেখে গেলে তা কেবল

ক্রীড়া অঙ্গ। হৃদয় বলতে তোমার কিছু নেই, তুমি অসাড়, তুমি জড়, তুমি কেবল মজ্জাহীন কঙ্কাল।

কঙ্কাল কথাটা মনে আসতেই সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল। মুহূর্তে বিকট সত্য আমাকে বাস্তবের সামনে ধরে দিল। যে আবেষ্টনীতে মোহাবিষ্ট হয়েছিলাম, যেখানে ভুলে-যাওয়া যৌবনকে অতীতের সমাধি থেকে উদ্ধার করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম সেই স্থান থেকেই পরিত্রাণের জন্য উন্মাদের মত পথ খুঁজতে লাগলাম। অন্ধকূপ থেকে বার না হতে পারলে দূষিত বায়ুর নিঃশ্বাসেই হয়ত আমাকে মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিতে হবে। যে সময় পরিত্রাণের পথ খুঁজছিলাম ঠিক সেই সময় মাথার উপর জোরে কবাট বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শুনলাম। সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্ঘাতিক হুড়োমুড়ি ও জানোয়ারের মত বিকট চিৎকার শুরু হ'ল। বাঁচা ও মরার মিলন-উৎসবের জন্য যেন প্রেত-লোকে হুল্লোড় চলেছে। এখনি এখান থেকে বার না হলে আমাকে বাসরঘরে নিয়ে যাবে— ফুলশয্যা সেখানে সাজানো আছে। ছলনাময়ী আমারই জন্য অপেক্ষা করছে। মড়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার চিন্তায় মৃত্যু যেন ঘটা করে আমাকে বরণ করবার জন্য এগিয়ে আসতে লাগল।

এই সময় আবার মাথার উপর গোঙানীর আওয়াজ শুনলাম। পরমুহূর্তে উপর থেকে রক্তের ধারা কাঁধ ও মাথা ভিজিয়ে দিল। পৈশাচিক লীলার আয়োজন মাথার উপরেই হয়েছিল। হত্যার ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে না পেলেও অনুমানে কোন বাধা ছিল না। ভাবলাম ধ্বংসের মহোৎসব হয়ত আমাকে দিয়েই শেষ হবে। ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ কবাটের দিকে তাকালাম, ঐ পথেই পাতাল-পুরীতে প্রবেশ করেছিলাম। বিকট চিৎকারের সঙ্গে আহত বরাহের আর্তনাদ মিলে যাওয়ায় বিচার করে দেখলাম আমার ধারণা ভুল হয়েছিল। আসলে উপরেও প্রেমের অভিযান চলেছিল প্রণয়িনীর দখল নিয়ে। পশুর সমাজে প্রেমের দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য করুণার প্রশ্ন ওঠে না। বলপ্রয়োগেই সর্তের মীমাংসা হয়ে থাকে এবং সব সময় বিজয়ী স্বয়ম্বর স্বেচ্ছায় গ্রহণ না করলেও দণ্ডের ভয়ে বরমাল্য দিতে বাধ্য হয়। এটা আদিম কালের রীতি, পশুর সমাজে শৃঙ্খলার জন্য বিশেষভাবে ফলপ্রদ। শৃঙ্খলার প্রয়োজনে যে মল্লযুদ্ধের আয়োজন হয়েছিল তারই ফলে কোন একটি জন্তুর জোর ধাক্কা লেগে খোলা কবাটের ডালা সবেগে মাটিতে এসে পড়ে। রক্তবর্ষণের কারণও মল্লযুদ্ধ। আহত জন্তুটি কবাটের উপরই এসে পড়েছিল, আঘাত অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় আর উঠতে পারে নি।

ঘটনার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হলে, সিঁড়িতে ওঠার চেষ্টা করলাম। কয়েক ধাপ উঠতেই মাথাটা ঘুরে গেল। দীর্ঘকাল মাটির তলায় দূষিত বায়ুর নিঃশ্বাস নেবার দরুনই বোধ হয় এই রূপটি ঘটেছিল! ভাবলাম এই অবস্থায় খাড়াই ধাপগুলি ব্যবহার করা ঠিক হবে না। কিন্তু এখানে বেশীক্ষণ থাকলে সম্পূর্ণ জ্ঞান হারাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। গত্যন্তরে টলায়মান শরীর নিয়েই উপরে উঠতে হ'ল। কবাটের কাছে এলে বন্ধ দরজা নীচ থেকে চাড় দিলাম। খোলা গেল না। অতিকায় আনুমানিক বরাহের ওজন তিন থেকে সাড়ে তিন মণ হবে, ঐ ভার তোলা সম্ভব হ'ল না। নীচে নেমে এলাম। সিঁড়ির দিকে মুখ রেখে হাত ও পায়ের উপর ভর দিয়েই নামতে হয়েছিল—নামার সময় উপরে আবার গোঙানির শব্দ শুনলাম। শিকারীর অভিজ্ঞতা জানিয়ে দিল, মৃত্যু-যন্ত্রণায় জানোয়ার অস্থির হয়ে উঠেছে। অস্থিরতার ফলে দরজার একটি কোণ ফাঁক হয়ে গেল; খুব সম্ভবতঃ একধারে ওজন বেশী পড়েছিল। অল্পক্ষণ পরেই দেখলাম ফাঁকের ভিতর থেকে একটি শুয়োরের লেজ ঝুলে পড়েছে।

নীচে নেমে মেজের উপর বসে পড়তেই বেহুঁসের মত হয়ে গেলাম। কতক্ষণ এই অবস্থায় ছিলাম বলতে পারি না। হঠাৎ কোন বিষাক্ত কীটের কামড়ে চমকে উঠলাম। একটি ক্ষুদ্রকায় তেঁতুলে বিছে আমার সামান্য নড়াচড়ায় নরম মাংসের সন্ধান পেয়ে হুল ফোটানোর লোভ সামলাতে পারেনি। স্বধর্ম রক্ষার পরে শতপদী চলে গেল বটে, কিন্তু পদহীন বিষাক্ত জীবের আস্তানায় অন্য কাহারও অপেক্ষায় থাকা বিপজ্জনক ভেবে উঠে পড়লাম।

আশ্চর্যের ব্যাপার, উপরে উঠে দরজায় সামান্য চাড় মারতেই কবাট খুলে গেল। মাটির তলা থেকে উপরে এসে দেখি, বাস্তবিকই শুয়োরটা মরেছে, একতাল রক্তের উপর কবাটের বাইরে পড়ে আছে। বিরাট দাঁতাল বরাহ, পেট থেকে নাড়ীভুঁড়ি সব বেরিয়ে পড়েছে। প্রেমের দরবারে আত্ম-বলিদানের এইরূপ দৃষ্টান্ত আগেও দেখেছি, সুতারাং বিচলিত হবার কিছু ছিল না।

ভোর হয়ে গিয়েছিল। ক্লান্ত শরীরে মুক্ত ও স্নিগ্ধ বায়ুর নিঃশ্বাস নিতে পারায় বিশেষ আরাম পেলাম। ধুলো-ভরা মেজেতেই বসে পড়লাম। প্রাণভরে জিরিয়ে নেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। কতকটা নিশ্চিন্ত ভাব আশায়, ভূগর্ভের ঘটনা একটির পর একটি চোখের সামনে চলচ্ছবির মত ভেসে যেতে লাগল। রুদ্ধ কবাটের রহস্য পাতালপুরীতেই রেখে যেতে হ'ল ব'লে দুঃখের কিছু ছিল না। ভেবে দেখলাম, যে সব ঘটনা চাক্ষুষ করেছি সেগুলিকে

মনগড়া দৃশ্য ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। যে নারীর যৌবনশ্রী আমাকে সম্মোহিত করেছিল, যে মাদক-শক্তির আকর্ষণে আমার সুপ্ত কামনা সজাগ হয়ে উঠেছিল, সেই শক্তিকে ত কোন সময়, কোন পরিবেশে অস্বীকার করবার উপায় নেই। একই রূপে নারী বহুরূপী। সুতরাং ছলনাকে ক্ষেত্রবিশেষে তার একটি প্রকৃতিগত গুণ ব'লে ধরতে হয়। আবেষ্টনী ও সাময়িক মনের অবস্থা বুঝে রূপসী যদি মায়াজাল বিস্তার করেই থাকে, ভোগলিপ্সায় আমি সম্পূর্ণ আত্মহারা হয়েই থাকি, তাহলেও বলব না আমার সন্ধানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। কারণ এক রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে আর এক রহস্যের সহিত পরিচয় হয়েছে। নারী রহস্যময়ী বলেই তাকে জানার চেষ্টা আজও চলেছে। আমি যেটুকু জানতে পেরেছি সেইটুকুই আমার মস্তবড় লাভ। আত্মপ্রশ্নে সঙ্গত যুক্তি সহায় হতে সান্ত্বনা পেলাম। ভাবলাম, যে রহস্যদ্বার অনাদিকাল থেকে রুদ্ধ তাকে খোলার চেষ্টা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছু না।

কাছারিতে ফেরবার কথা মনে পড়ল। নীলকুঠিতে যা দেখেছি বা শুনেছি তা আমার কাছে সত্য ও বাস্তব হলেও কেহ বিশ্বাস করবে না জানি, তবে ঘটনাগুলির সূত্র অনুসরণ করলে বলা যায় কোন সময় এদিকে যে দুর্লভ মালের আমদানি হ'ত তাতে সন্দেহ নেই। ঘটনার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য কিছু থাক বা না থাক, এখানে একাকী রাত্রিবাস করেছি শুনলে বাঁড়ুজ্জে খাঁটি সত্যকে নিছক মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠবে। আগের ঘটনা নিয়েই ত ইতিমধ্যে চোখ ঠেরেছে। কেচ্ছার প্রচারও বাঁড়ুজ্যের একটি ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপার। সারা গ্রামের লোক ওর কাছে আসে দীক্ষা নিতে। আমার সম্বন্ধে কিছু সংগ্রহ হলে মূলধনকে সুদে খাটিয়ে এমনি ফাঁপিয়ে তুলবে যে, বাকি জীবনে বেকার বসে থাকার অবসর পাবে না। সারাটা জীবন ব্রহ্মচারীর পথানুসরণ করে এসেছি, এ বয়সে অযথা চরিত্রস্খলনের দুর্নাম বহন করবার ইচ্ছা ছিল না। অবাঞ্ছনীয়কে সামলাতে হলে একটি বিশ্বাসযোগ্য গল্প তৈরী থাকা দরকার। মালমশলা নাগালেই ছিল, নতুন প্রথায় বরাহ শিকার সম্বন্ধে কিছু বলব ঠিক করে ফেললাম।

কাছারিতে ফিরে লোক সংগ্রহ করতে সময় লাগল না। নীলকুঠিতে পেটকাটা বরাহ দেখে অনেকেই খুশীমত গল্প গ'ড়ে নিল। মিথ্যার আশ্রয় না নিয়েও শিকারের খ্যাতি ভালভাবেই প্রচার হ'ল। এই ঘটনার পর বাঁড়ুজ্যে নাকি সন্ধ্যা হলেই ঘরের ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিত।

হিসাব

মিতব্যয়ীর যশ অর্জন করিতে হইলে যতটা সংযম ও সুচিন্তিত হিসাবের প্রয়োজন হয় ততটা তারাপদবাবুর ছিল না। তথাপি সদ্‌গুণ আয়ত্ত করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু বাঞ্ছিত ফল পাওয়া গেল না। সব দিক বিবেচনা করিয়া শুভানুধ্যায়ীরা পরামর্শ দিলেন; নিজের উপর জুলুম করিলে কোন সুবিধা হবে না। অতএব যাহা পাতে সয় সেইটুকুই করো, খরচ কমাইবার জন্য শরীরপাত ভাল নয়। বুড়ো বয়সে সুস্থ থাকিতে হইলে ওসব এটুকু-আধটু একান্ত দরকার! যে কোন লাভের কথাই ভাবো না কেন তাহা দাম দিয়া কিনিতে হয়। দাম কিভাবে দাও সেটা প্রশ্ন নয়। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একই যুক্তি খাটে। শরীর ঠিক রাখিতে হইলে খরচ একটু-আধটু করিতে হইবে বইকি।

সুহৃদের উপদেশ তারাপদবাবু প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। তবে স্বাস্থ্যরক্ষার রীতি মানিতে গিয়া অন্দরমহলে স্থায়িভাবে অশান্তির ব্যবস্থাও করিয়া ফেলিলেন। গৃহিণী সুবিধা পাইলেই জানাইয়া দিতেন—ছাইভস্ম গেলার জন্য সব-কিছুই যেতে বসেছে। হাখন-হাসির মেজ জামাই তো ওই-সব গেলার জন্যই মরল। একেবারে পিলে ফেটে চৌচির! তোমার কপালেও দুর্ভোগ আছে, তার সঙ্গে আমাকেও নিঃসম্বল বিধবা করে ছাড়বে। এ রকমটি ঘটার আগে, আমাকে কোন অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দাও। দুঃখ সহ্য করার অভ্যাসটা আগে থেকে করে রাখা ভাল।

অনাথ আশ্রমের সুব্যবস্থাও পিলেফাটার ভবিষ্যদ্বাণী শুনিবার জন্য তারাপদবাবু সকাল হইতেই প্রস্তুত থাকিতেন। কোনদিন মহৎ কর্তব্য হইতে গৃহিণী নিজেকে বঞ্চিত করিলে অধিকতর দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ঘনাইয়া উঠিত। সেদিন এইরূপ একটি কাণ্ড ঘটিয়া গেল। দিবানিদ্রার জন্য গৃহিণী একটি সময় পৃথক করিয়া রাখিতেন। সেদিন এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল, তারাপদবাবু খবরটি জানিতেন না। নিশ্চিন্ত মনে টেলিফোন করিতেছিলেন। প্রাণ খুলিয়া মদগুলি পানীয়ের নাম করায় কোন বাধা ছিল না। ব্রাণ্ডি, হুইস্কি, শেরী, জিন ইত্যাদির

ফরমাশ দিয়া, নতুন দাম জিজ্ঞাসা করায় দোকানদার যে মোটা অঙ্কের হিসাব দিল তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া জানাইলেন, দামের জন্য তিনি পরোয়া করেন না, তবে জিনিসগুলো যেন খাঁটি হয়। আজকের পার্টিতে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আসিতেছেন, তাঁহারা যেন—

কথাটা সম্পূর্ণ শেষ করিতে পারিলেন না। ডেনজার সিগন্যালের লাল নিশানার মতই চোখের সামনে দেখিলেন শাড়ির লাল চওড়া পাড় পাখার হাওয়ায় মৃদু দুলিতেছে। গৃহিণী যে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

অবাঞ্ছনীয় কিছুই করেন নাই এইরূপ ভাব দেখাইয়া-নির্বিকার চিত্তে স্থানটি পরিত্যাগ করিবার চেষ্টায় ছিলেন তিনি। গৃহিণী গম্ভীর স্বরে বলিলেন, বসো, কথা আছে।

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ আবার পার্টি কেন? এই তো সেদিন পাড়া মাতিয়ে কেলেঙ্কারী করলে। গেলার ব্যাপার তোমার কি থামবে না? এদিকে সংসারের খরচ তো এক পয়সাও বাড়াবার নামটি নেই, আর গেলার বেলা কোন দামকেই পরোয়া কর না। জেনে রেখো, অনটন ঘাড়ে নিয়ে সংসার চালানো পোষাচ্ছে না উপরি আয়ের কিছু ব্যবস্থা না করতে পারলে। উপর-তলাটা ভাড়া দিয়ে দাও, বাড়তি খরচ সামলে নিতে পারি। হিসাবের দিকটাও তো দেখতে হয়।

আসল কথা, উপর-তলাতেই পার্টির আয়োজন হইত এবং দলে পড়িয়া তারাপদবাবু নাকি গেলার দিকটা বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিতেন। এইরূপ ধারণা গৃহিণীর বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তারাপদবাবু নীট জল পান করিলেও তাঁহাকে মাতাল সাব্যস্ত করা নিয়ম হইয়া গিয়াছিল। দ্বিমত প্রকাশ করিবার অধিকার কাহারও ছিল না। তারাপদবাবু জানিতেন, হিসাবের চূড়ান্ত না হইলে গৃহিণী কোন প্রস্তাব করেন না। বর্তমান বক্তব্যের পিছনে যাহাই থাকুক, তাহা না মানিলে অনাথ আশ্রমের কথা উঠিয়া পড়িতে পারে।

অকস্মাৎ উপর-তলাটা হস্তান্তর করিবার প্রস্তাব সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিল। বাপ-ঠাকুরদার আমলের পুরাতন আসবাবপত্র সরাইয়া রাখেন কোথায়? দ্বিতীয় প্রশ্ন, উপর-তলা ভাড়া আদায় করিবার ভার লইবে কে? কলিকাতার মত শহরে ভাড়াটে পাওয়া খুবই সহজ। ভাগাড়ে মড়া ফেলিলে গৃধিনীর দল যেভাবে

মাংস ছিঁড়িয়া খায় এবং দেখিতে দেখিতে সব-কিছু গিলিয়া ফেলে,সেইরূপ খালি বাড়িও পড়িয়া থাকে না। কিন্তু ভাড়া আদায় করা ভিন্ন কথা। শহরের মধ্যেই আরও দুইটি বাড়ির মালিকানা-স্বত্ব লইয়া তারাপদবাবু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, গ্রহের ফেরে বাড়িগুলিকে যেন ভাড়াটিয়ারা গিলিয়া ফেলিল। পুরুষানুক্রমে ভোগদখলের দাবীর পরিবর্তে ভাড়াটে উচ্ছেদের মামলায় তাঁহার প্রাণান্ত অবস্থা হইতেছে। জটিল আইনের সমর্থন থাকায় ভাড়াটিয়ারা বাড়ির মালিককে কিছু না দিয়াই ইচ্ছামত বাড়ি ভাঙিয়া-গড়িয়া পরমানন্দে বসবাস করিতেছে। এই জাতীয় মানুষ অপরকে ফাঁকি দিবার জন্য মামলায় পিতৃদত্ত নামটাও বেনামি করিয়া ফেলে। মামলার উপদ্রবে বহুবার তারাপদবাবুকে আদালতে হাজিরা দিতে হইতেছে এবং চালাক উকিলের জেরায় বেকুব বনিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন। এই রকম কখনই ঘটিত না যদি স্বপক্ষীয় উকিলের উপদেশ না মানিতেন। শত্রুপক্ষের মতলব খারাপ জানিয়া তিনি শিক্ষানুসারে মুখ খোলেন নাই। কারণ তাঁহাকে সাবধান করা হইয়াছিল, বেফাঁস কিছু বলিলেই তাহা ক্ষতিকর হইতে পারে। পাকে-প্রকারে বিপক্ষের উকিল তাহাকে মর্কট সাব্যস্ত করিয়াছে মিথ্যা-বাদী বলিয়াছে, তথাপি তিনি মুখ খোলেন নি পাছে বেফাঁস কিছু বাহির হইয়া যায়। ফলে চেষ্টালব্ধ আচরণকেই বিপক্ষীয়রা কাজে লাগাইয়াছে এবং প্রমাণ করিয়াছে বাড়িওয়ালার বলিবার কিছু নাই সুতরাং ভাড়াটিয়াকে তাহার পূর্ণ স্বত্ব দেওয়া হউক। দৃষ্টান্তগুলি সামনে ধরিয়া গৃহিণীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, পুরাতন ভাড়াটিয়ারাই যখন আমাদের পাওনা স্বীকার করিতে নারাজ তখন আবার নতুনকে ডাকিয়া ঝামেলা বাড়ানো কেন? কথা শুনিয়া গৃহিণী তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। মুখ-ঝামটা দিয়া বলিয়া ফেলিলেন, ওসব বাজে কথা আমি শুনতে চাই না। টাকা আদায় ঠিকই হচ্ছে এবং খরচও কি ভাবে হচ্ছে জানি। ভাল কথা, ভাড়া না দাও, চেয়ার টেবিল সোফা আর ওই সব নোংরা ছবি বিক্রি করে ফেল। উলঙ্গ স্ত্রীলোকগুলো তেলরঙে আঁকা বলেই কি একরাশ লোকের সামনে নির্লজ্জের মত সাজিয়ে রাখতে হবে? আজই ওগুলো বিদায় কর।

তারাপদবাবু ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন। নিতান্তই গোবেচারার মত আর্জি পেশ করিতে হইল, আজকের পার্টি-বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত হয়েছেন। সকলকে বলা হয়ে গিয়েছে এখন আমি করি কি।

বিশিষ্ট কথাটির ব্যবহারে যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা পড়িল। গৃহিণী

কণ্ঠস্বরকে পাড়া-মাতানোর স্বরে তুলিয়াই বলিলেন, কি বললে, বিশিষ্ট! তার মানে রাজ্যের মাতালদের ডাক পড়েছে?

মাতাল বলিতে যদি বেহুঁশ বোঝায়, আত্মহারা বোঝায় তাহা হইলে যে কোন সাধককেই মাতাল বলিতে হয়। ধবি হইতে আরম্ভ করিয়া কবি, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী যে যার নিজের সাধনা লইয়া আত্মহারা হইয়া আছে। সকলেই প্রকারান্তরে নেশাগ্রস্ত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা -নেশার তাড়নাতেই চন্দ্রলোকে বসবাসের জন্য অস্থির হইয়াছে। প্রগতিশীলতার আন্দোলনে একদল শিল্পী নকশার নেশায় শুধু মাতাল হয় নাই, সমালোচকদের পর্যন্ত পাগল করিয়া ছাড়িয়াছে, তাহারা আবোল-তাবোল বকিতেছে। কবির কথা স্বতন্ত্র, তাহাদের সাতখুন মাপ। সে স্বর্গকে কথা দিয়া কোতল করিলেও লোকে বলে, ভাবের ধাক্কায় ওই রকমটি ঘটিয়াছে। ভাবাধিক্য আর মাতলামিতে তফাত কোথায়?

তারাপদবাবুর যুক্তি তাঁহার নিকট অখণ্ডনীয় হইলে কি হয়, গৃহিণী মাতাল বলিতে তাহাদেরই বোঝেন যাহারা পার্টিতে চাইলস্ গিলিয়া থাকে। ঠিক যেমন দুশ্চরিত্র বলিতে কেবল এক প্রকার চরিত্রস্খলন বোঝায় অর্থাৎ পৃথিবীতে যাবতীয় স্ত্রীলোককে মা ও ভগিনী না বলিলেই বুঝিতে হইবে খারাপ। গল্প বলিতে বসিয়াছি সুতরাং তারাপদবাবুর যুক্তি খাটিয়া লাভ নাই, বলাই বৃথা, যুক্তির কথা তিনিও স্ত্রীর সামনে উত্থাপন করেন নাই। কিন্তু পার্টির বিধানে ভবিষ্যৎকে যেভাবে বেকার করিবার ব্যবস্থা করিলেন তাহা মর্মান্তিক। নিষ্পত্তি হইল, যতবার ঢোক গিলিবার তৃষ্ণা অদমনীয় হইবে ততবারই গৃহিণী মেজার গেলাসে ওই বস্তুটি মাপিয়া দিবেন এবং প্রতি ঢোক ঘড়ি ধরিয়া ঠিক করিতে হইবে।

সরস পার্টির মর্যাদা উপর গলাধঃকরণের প্রথায় মেজার গেলাসের মাপ ও সময়ের কড়াকড়ি আসিয়া পড়ায় তারাপদবাবু বিরক্ত হইয়া পড়িলেন। আর চিন্তার কারণ হইল, এতগুলি লোকের সামনে পর্দানশীন গৃহলক্ষ্মী নিঃসঙ্কোচে ঢালাঢালি করিবেন কেমন করিয়া। তাঁহার ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া গৃহিণীকে বলিতে হইল, অত ভাববার কি আছে, অসুখ হলে মানুষ কি করে? ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে হলে চিকিৎসার বিধান মানতে হয়। আপন-হাসির মেজ জামাই সম্বন্ধে ডাক্তার এইরকম ব্যবস্থাই করেছিলেন কিন্তু—

তারাপদবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, আমার তো কিছুই হয় নি।

গৃহিণী উত্তর দিলেন, আহা-মরি, কথার কি ছিরি। কিছু হয় নি কিন্তু যেভাবে চালিয়েছ তাতে হতে কতক্ষণ? এবং হলে তুমি ভুগবে, না আমি?

প্রশ্নের মধ্যে কিছুমাত্র জটিলতা ছিল না। তারাপদবাবু বুঝিলেন, অনাথ আশ্রমের প্রস্তাব প্রস্তুত হইয়া আছে, গৃহিণীর প্রত্যাশিত উত্তর না পাইলেই মোটা অঙ্কের মাসহারার হিসাবও আসিয়া পড়িবে। সঙ্কট অবস্থায় অধিক বাক্য-ব্যয় বিপজ্জনক ভাবিয়া তারাপদবাবু ঢোক গিলিবার শর্তগুলি মানিয়া লইলেন।

সন্ধ্যার দিকে নিমন্ত্রিতেরা একে একে আসিতেছিলেন, তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য ব্যবস্থা ঠিকই ছিল। গৃহিণীও অলক্ষ্যে থাকিয়া ঘরের আনাচে কানাচে নজর রাখিয়াছিলেন, সান্ত্রী-পাহারার মত টহল দিতেছিলেন। মশগুলি কেন্দ্রে উত্তে-জিত উচ্ছ্বাসের কোনরূপ প্রকাশ না থাকায় হৃষ্টচিত্তে গৃহকর্মে ফিরিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে দেখা গেল, বিশিষ্ট নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অধিকতর বিশিষ্ট ব্যক্তিরও অভাব নাই। দুই একজন ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছেন এবং কিছুক্ষণ পরেই বিশিষ্ট গন্ধে ভরপুর হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। ক্রমান্বয়ে সকলেই বৈশিষ্ট্য আত্মসাৎ করায় তারাপদবাবুও অদৃশ্য স্থান হইতে ঘরে ফিরিয়া আসি-লেন। তিনিই প্রথমে ঘর হইতে বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু হিসাবের দিকটা সামলাইবার জন্য এতক্ষণ ফিরিতে পারেন নাই। পরের দিন সবকিছু জানাজানি হইয়া গেল। তাহার ফলে গৃহকর্তার কি অবস্থা হইয়াছিল বর্ণনার প্রয়োজন দেখি না, ভুক্তভোগী মাত্রেই অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন।

গ্রহের চক্র ঠিকই ঘুরিতেছিল। উপর তলা খালি হইয়া গিয়াছে। ভাড়াটে অগ্রিম এক মাসের ভাড়ার বিনিময়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া গৃহ-প্রবেশের আয়োজন করিতেছেন। উপর-তলার সোফা চেয়ার ইত্যাদি আসবাবপত্র বিদায় হওয়ায় নীচের তলায় বৈঠকখানার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রাচীন চালে ফরাশের উপর তাকিয়া পড়িয়াছে—এমন কি, পরিবেশ নিখুঁত করিবার জন্য পিকদানিটি পর্যন্ত বাদ যায় নাই।

ভাড়ার সুব্যবস্থা হইয়া যাওয়ায় উপরি আয় হইতে গৃহিণী যখন বাড়তি খরচের হিসাব ঠিক করিতেছিলেন সেই সময় বৈঠকখানায় হট্টগোলের সাড়া পাওয়া গেল। সকালবেলায় লোকসমাগমের কারণ জানিবার জন্য গৃহকর্ত্রী জানালার পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিলেন, তারাপদবাবু হতভম্ব অবস্থায়

বসিয়া আছেন, বেশ একটু সন্তপ্ত ভাব। তাঁহার সামনে উকিলের পোশাক পরা একটি লোক রুক্ষভাবে হাত-পা নাড়িয়া বাড়িভাড়া সম্বন্ধে কি বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। যতীন খুড়া উকিলের উক্তি শুনিয়া ঘোরতর আপত্তি জানাইতেছেন। আপত্তি অযথা ওঠে নাই, কারণ যাবতীয় শর্তে স্বাক্ষর সহ স্বীকৃতির পর পুনরায় সুবিধারজন্য সবকিছু অদলবদল খুড়া মানিতে পারিতেছিলেন না। উকিলও বে-আইনী প্রস্তাবকে তর্কের দ্বারা সমস্ত প্রমাণ করিতে না পারায় কথাকাটাকাটিকে বচসার কোঠায় তুলিয়া ফেলিয়াছিলেন। উত্তেজিত উকিলের হাতনাড়া দেখিয়া গৃহিণীর বিচারে দাঁড়াইল একটি নিরীহ মানুষকে বাগে পাইয়া বলপ্রয়োগ দ্বারা ভাড়াটিয়ার স্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছে। এখনি একটা কিছু না করিতে পারিলে মারপিটে কর্তার অঙ্গহানি সুনিশ্চিত। তাহার পর হাসপাতালে পাঠাইতে হইলেই তো চমৎকার। এক্ষেত্রে কর্তা তো ভুগিবেন না, গৃহিণীকেই সবকিছু করিতে হইবে। আশু দুর্বহ ঘটনার সম্ভাবনায় উতলা হইয়া উঠিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া তেওয়ারী দারোয়ানকে স্থান ও কালোপযোগী উপদেশ দিয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। সে লাঠিহস্তে উপস্থিত হইয়া দেখিল একটি পাতলুন পরা কৃশকায় ব্যক্তি উত্তেজিত হইয়া কি-সব বলিতেছে এবং শূন্যে হাত ছুঁড়িতেছে। কর্তব্যপরায়ণ দারোয়ান জানিত এইরূপ অবস্থায় কি করণীয়। সেও কোনরূপ উচ্চবাচ্য না করিয়া বচসারত উকিলের হাত ধরিয়া এক টানে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল। ভদ্রলোক যেন চড়ুই পাখীর মত ফুড়ুক করিয়া উড়িয়া গেল। ঘটনাটি ঘটিবার আগে যতীন খুড়া 'কর কি কর কি' বলিয়া দারোয়ানের সৎ উদ্দেশ্যে বাধা দিবার জন্য উঠিয়াছিলেন, কিন্তু দরজার ওপাশে বউঠাকুরাণীকে দেখিয়া দম-দেওয়া লাট্টুর মত একটি গোটা চক্র খাইয়া বসিয়া পড়িলেন।

ভাড়াটিয়া ফন্দিবাজ লোক। পরের বাড়ি ভাড়া খাটাইয়া বেশ কিছু জমাইয়া ফেলিয়াছিলেন। এই কারণে মেজাজটা একটু কড়া রাখিতে হইত। তিনি যে একটি কেউকেটা লোক নহেন তাহা প্রমাণ করিবার জন্য শাসাইয়া গেলেন এই বলিয়া যে ফৌজদারী মোকদ্দমার সমন পাঠাইতে বিলম্ব হইবে না।

দারোয়ানের শিষ্টাচারবিরুদ্ধ আপ্যায়ন অপ্রীতিকর বোধ হওয়ায় উকিলবাবু গেট পার হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। দৈহিক শক্তির মধ্যে তাঁহার একটি গুণ ছিল, তিনি তীব্রবেগে ছুটিতে পারিতেন। বিপদের সময় এই শক্তির ব্যবহারে বহুবার ফুটবলের মাঠে প্রাণ বাঁচাইয়াছেন, সার্জেন্টের ঘোড়াও তাঁহার নাগাল ধরিতে পারে নাই। নিরাপদ স্থানে দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া বলিতে

লাগিলেন, আইনের সাহায্যে কিভাবে গলাধাক্কার প্রতিকার করিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিবেন। ফৌজদারী মামলার বিশেষ ধারার দৃষ্টান্ত দিয়া জানাইয়া দিলেন ছয় মাস শ্রীঘর বাস সুনিশ্চিত।

গলদপূর্ণ ইংরেজী ভাষায় চিৎকার ও আইনের বক্তৃতা শুনিবার জন্য অল্প সময়ের ভিতর রাস্তায় ভিড় জমিয়া গেল। কলিকাতার মত শহরের রাস্তায় লোকসমাগম হইলে এক ঘটনার উপর নতুন ঘটনা চরাও হইতেও সময় লাগে না। বর্তমান ক্ষেত্রে চলতি নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলিল, লোকটা পাগল। আর একজন বলিল, শুধু পাগল নয়, চালাক পাগল। আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, ওই বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে যখন কথা বলছে তখন—আর একজন যেন কথাটা ছিনাইয়া লইল এবং শেষ করিল এই বলিয়া, দেখ দেখি কাণ্ডটা, উকিল মানুষ, শিক্ষিত ভদ্রলোক—তাঁর সঙ্গে মতের মিল না হয় নাই হল, তাই বলে গলাধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বার করে দেওয়া! টাকাওয়ালার দেমাক এইভাবে প্রশ্রয় পেলে—এ লোকটিও বক্তব্য শেষ করিতে পারিল না। আর একজন বলিল কি বললে, গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছে! আর আমরা সকলে তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। আমরা আজ এতই তেজহীন যে দুর্বৃত্ত টাকাওয়ালার পাশবিক অত্যাচার মাথা নত করে সহ্য করব। আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, লোকটাকে ঘর থেকে টেনে বার করে নিয়ে আসি। দেখিয়ে দি মিলিত শক্তির দ্বারা কিভাবে আমরা বলীয়ান হতে পারি। বন্ধুগণ, আজ জাগরণের দিন এসেছে, তবুও আপনারা যদি আমার আবেদন না মানেন তা হলে এইখানেই আমি অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিতে বাধ্য হব।

যে ভদ্রলোক সত্যাগ্রহ পণ করিয়া আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তিনি কোন ইউনিয়নের ভবিষ্যৎনেতা। আপিসের আগে বা পরে সময় ও সুবিধা পাইলেই নেতৃত্বের পাঁয়তারা অভ্যাস করিয়া লইতেন। জনসেবার বক্তৃতায় আত্মোৎসর্গের প্রস্তাব যখন প্রায় বিশ্বাসযোগ্য হইয়া আসিতেছিল সেই সময় কে একজন বলিল, পুলিশ।

পুলিস, শব্দটি বাস্তবিকই শুধু আতঙ্কপূর্ণ নয় বৈদ্যুতিক-গুণসম্পন্নও বটে। সত্যই পাহারাওয়ালাকে অনেকেই দেখিয়াছিল কিন্তু লোহা-বাঁধানো লাঠিহস্তে বিরাট পুরুষকে গেটের সামনে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া পাহারাওয়ালা উপর-ওয়ালাকে ফোন করিবার জন্য পাশের বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় আক্রমণ বা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে উপরওয়ালার উপদেশ না লইলে চলে না, কারণ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন আচরণের বিধি আছে। বর্তমান

ক্ষেত্রে বিরাট লাঠিধারীকে কিভাবে গ্রেপ্তার করিতে হইবে জানা না থাকায় উপরওয়ালাকে ফোনের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং ওই উদ্দেশ্যে যে-কোন একটা বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। পাহারাওয়ালা যখন বাহির হইয়া আসিল তখন জানা গেল সে-বাড়ীতে ফোন ছিল না এবং রাস্তাও তখন ফাঁকা হইয়া গিয়াছে।

ঘটনাটি লঘু করিয়া দেখিবার কোন অজুহাত নাই। লোকজন চলিয়া গেলে গৃহিণী সতীন খুড়াকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। খুড়ার নিকট সব কথা শুনিয়া বুঝিলেন ব্যাপারটা বেশ গড়াইয়াছে। ভাড়াটের মত বদলানো মানেই বাড়তি খরচের হিসাবও ফাঁসিয়া গিয়াছে। এই দুর্ঘটনার জন্য কাহাকেও দায়ী করিতে হইলে স্বয়ং কর্তাকেই ধরিতে হয়। তিনি নরম না হইলে এমন একটা লজ্জাকর ঘটনা ঘটত না। বিচারে সতীন খুড়ারও সায় দিতে আপত্তি ছিল না। সমর্থন সহজলব্ধ হওয়ায়, গৃহিণী ঠিক করিলেন এবার একটা এসপার কি ওসপার করিয়া ফেলিবেন। লোকসান তো সোজা লোকসান নয়। ভাড়াটিয়ার ব্যাপারটিও পাড়া-মাতানো কেলেঙ্কারি হইয়া গেল। বাড়তি খরচের হিসাবে যেগুলি অনিবার্য সেগুলিকে এখন বাদ দেন কেমন করিয়া? ইহারই ভিতর পুঁটির মা জানিয়া গিয়াছে সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহে কথকতা ও হরিসঙ্কীর্তন হইবে। বায়নার টাকাও দলের অধিকারী অগ্রিম না লইয়া ছাড়ে নাই।

পুঁটির মা পাড়ায় একটি সচল গেজেট। ভিতর-বাড়ীতে ভালমন্দ টাটকা খবর শুনিতে হইলে পুঁটির মা ছাড়া গতি নাই। এই তো সেদিনকার কথা, ভোর না হইতেই পাড়ার সকলেই জানিয়াছিল কিভাবে কর্তা সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া মাতামাতি করিয়াছিলেন। খবরটি প্রচার করিল কে? সকলেই জানে পুঁটির মা।

ঘোষেদের সেই ধিঙ্গী মেয়েটা কাহার সহিত পলাইয়াছিল, ধরা পড়িতেই কিভাবে সিনেমার তারকা হইয়া গেল — এ সবই পুঁটির মা'র কাছ হইতে পাওয়া যাইবে। সুতরাং হরিসঙ্কীর্তন ও কথকতার খবর যে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। যাহারা শুনিয়াছে তাহারা আগতপ্রায় দিনটির জন্য পোঁটলা বাঁধিয়া বসিয়া আছে। যাহারা ঠাকুরনাম শুনিতে আসিবে তাহাদের যৎসামান্য মিষ্টান্ন ও শরবত না দিলে চলে কেমন করিয়া। এই অবস্থায় বাড়তি খরচের ধাক্কা সামলাইতে হইলে সংসার-খরচ হইতে

যাহা সঞ্চয় করিয়াছেন সেই পুঁজি হইতে টান মারিতে হয়। অনটন হইতে সঞ্চয় করা যে কতটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। এ-যাত্রা কোনপ্রকারে সামলানো সম্ভব হইলেও ভবিষ্যৎ পড়িয়া আছে। সুতরাং উপরি আয়ের জন্য স্থায়ী একটা বন্দোবস্ত না করিলেই নয়।

গভীর চিন্তার পর যে পথ বাহির হইল তাহা কার্যকর করিতে হইলে কর্তার বিবেকের উপর চড়াও হইতে হইবে, সুতরাং তাগ বুঝিয়া অগ্রসর হওয়া দরকার। নরম কথায় যেখানে শত্রুকে পর্যন্ত আপনার করা যায় সেখানে উপযুক্ত পথে চলিলে কর্তা বশীভূত হইবেন না? গৃহিণী ভাবিতেছিলেন, কর্তার কণ্ঠস্বরকে কিভাবে অর্থোপার্জনের জন্য কাজে লাগানো যায়। সঙ্গীতকে তারাপদবাবু বিলাসের অঙ্গ ভাবেন নাই। একসঙ্গে হাজার লোকের বাহবা শুনিবার জন্যও কখনও তিনি মাইকের সামনে বসেন নাই। সুর ছিল তাঁহার আরাধনার বস্তু, অন্তরের উচ্ছ্বাসকে ধ্বনির দ্বারা পূজার্ঘ করিতে পারিলে নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। প্রাচীন ঘরানা চালে তিনি দীক্ষা লইয়াছিলেন। আজও দীক্ষাগুরুর প্রতি তাঁহার ভক্তি অটল রহিয়াছে। এই কারণে আধুনিকপন্থী ও অতিমার্জিতরা তাঁহাকে কালোয়াতী পালোয়ান বলিয়া থাকে। খুবই স্বাভাবিক, কারণ তিনি নাকি সুরের বিস্তারে তানের সহিত ধস্তাধস্তি করিতেন, সম আসিলে তাল ঠুকিয়া হুঙ্কার ছাড়িতেও বাধিত না। মার্জিতদের খাপ্পা ও ছুঁচোবাজি যেভাবেই তাঁহাকে জ্বালাইবার চেষ্টা করুক না কেন সুরব্রহ্মের প্রতি অটল বিশ্বাসকে কেহই টলাইতে পারে নাই।

এইরূপ বিশ্বাসকে ঘরোয়া কাজে লাগাইতে হইলে একমাত্র সোহাগজড়িত অনুরোধ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। সোহাগের কারবারও বহুদিন আগে উঠিয়া গিয়াছে। নবাবয়সের আদিরসের পুনরাবর্তন করিতে হইলে কিভাবে গোড়াপত্তন করিবেন তাহাই হইল চিন্তার বিষয়। সোহাগের কথা উঠিল, কারণ গৃহিণী জানিতেন সঙ্গীতকে অর্থোপার্জনের জন্য স্বামী কখনই ব্যবহার করিবেন না। সোহাগের ব্যাপারে গৃহিণী কিভাবে তাঁহার কলাকৌশল কাজে লাগাইয়াছিলেন তাহার বিশদ আলোচনার প্রয়োজন দেখি না, গোপন কথা আড়ালে থাকাই ভাল।

তবে সোহাগের ফলে বাস্তবিকই লোকসানের দিকটা সামলাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। প্রেমের দুর্দান্ত প্রতাপে তারাপদবাবু স্বীকার করিয়াছিলেন,

উপরি আয় যখন একান্ত প্রয়োজন তখন সিনেমার গানও গাহিবেন, গৃহিণীকে আর কাঁদাইবেন না। দুই ফোঁটা চোখের জলে তো গৃহিণী একটা হেস্তনেস্ত করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু সত্যবদ্ধ মানুষটি প্রতিশ্রুতির পরিচর্যা করিতে গিয়া যে-সব অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইলেন তাহা যে খুব সুখপ্রদ হইয়াছিল এমন কথা হলফ করিয়া বলা যায় না।

রাগরাগিণীর সাধনা এক জিনিস আর সিনেমার গান গাওয়া অন্য ব্যাপার, বিশেষ করিয়া যেখানে বিরহের জ্বালায় গায়িকা বা গায়ককে মরিতে হয়। চলচ্ছবিতে বিরহের প্রকাশ অতি মর্মান্তিক দৃশ্য, কারণ গায়কের একলা জ্বলিলে চলে না, পরিচালক ও শ্রোতাকেও জ্বালাইয়া আনন্দ দিতে হয়। সংক্ষেপে জনপ্রিয় প্রত্যাশা সার্থক করিতে হইলে মরিবার আগে একটি গান না গাহিলেই নয়। মৃত্যুর সহিত গানের যোগ থাকায় সুরকে করুণ রসাত্মক করিবার জন্য শ্বাস ও হেঁচকির মিশ্রণ একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহা চলতি চাহিদা, সুতরাং অবর্জনীয়।

একবার মরিলে বাঁচার দুর্ভোগ হইতে হয়তো গায়ক রক্ষা পাইত, কিন্তু শ্বাস রাগ বা রাগিণী যাহাই হউক, পরিচালকের ভাল লাগিলে মৃত মানুষকে উঠিয়া বসিতে হয় গানটি পুনরায় গাহিবার জন্য।

মৃত্যুকে ভয় করিবার কিছু ছিল না, কারণ তিনি জানিতেন উহা ভবিতব্যের অলঙ্ঘনীয় বিধান। কিন্তু হেঁচকি ও শ্বাসের মিশ্রণে কিভাবে সুরকে সুমধুর করিতে হয় তাহা তিনি শেখেন নাই। মিশ্র সুরের এই জাতীয় মৌলিকত্ব তার মুখে মারমুখী হইয়া উঠিল। একদিকে শ্বাসজড়িত হেঁচকি রাগ, অপর দিকে প্রতিশ্রুতির মর্যাদা। দুইয়ের টানাপোড়েনে তারাপদবাবুর আত্মা ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িতে শুরু করিয়া দিল, তথাপি জনপ্রিয় গানকে স্বীকার করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

গোল বাধিল, ছবিঘরে প্রবেশাধিকার লইয়া। এমন একটি পরিবেশে ঢুকিতে হইলে কোন মাতব্বরের সুপারিশ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কি বলিলে কোন্ তারকা সহজে সন্তুষ্ট হয়, কোন্ তারকার তাপ কতটা, তাপকে সহ্য করিতে হইলে দর্শনপ্রার্থীর চামড়া কতটা পুরু হওয়া দরকার, কিছুই তাঁহার জানা নাই।

ইতিমধ্যে ঢোক গেলায় নানারকম বিঘ্ন আসায় শুভানুধ্যায়ীরাও উধাও হইয়াছে। পরামর্শ করিয়া যে কৃষ্টির সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন তাহাও

সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যের প্রতিপত্তিতে যাহা এককালে না চাহিতেই পাওয়া যাইত তাহা এখন দুর্লভ হইয়া গিয়াছে। শেষ পর্যন্ত তারাপদবাবু ঠিক করিলেন, তারকা বাছাই করিয়া কোন লাভ নাই। তাপ একটু-আধটু লাগিবেই, কাছে থাকিলে সহ্যও হইয়া যাইবে। কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে পড়িয়াছিলেন, গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে একজন বেজায় নাম-করা তারকার আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি নটী, গায়িকা ও অভিনেত্রী, একাধারে সর্বগুণ-সম্পন্না। কখন তিনি মাটিতে পা রাখিবেন জানিতে হইলে গণৎকারের নিকট ছুটিতে হয়। এমন একটি মহামানবীর দর্শন লাভ করিতে হইলে লিখিত আবেদন পাঠানোই সঙ্গত। তারাপদবাবু একটি বিনীত পত্র লিখিলেন। পত্রপাঠ উত্তর পাইলেন, অমুক সময় আসিলে অসুবিধা নাই। হিসাব করিয়া এইরূপ শব্দযোজনায় দূরত্ব রাখিবার প্রয়াস এমন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে তারাপদবাবু দমিয়া গেলেন। তথাপি দরদহীন অভ্যর্থনাকে মানিতে হইল, মা-দুর্গার নাম স্মরণ করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে বাহির হইয়া পড়িলেন।

হোটেলের কাছাকাছি আসিতেই তাঁহার ট্যাক্সি থামিয়া গেল। পদযাত্রী ও গাড়ীর ভিড়ে পথ বন্ধ হইয়াছে। ট্রাফিক পুলিশেরও পাত্তা নাই, হয়তো ভিড়ের মধ্যে গুম হইয়া গিয়াছে। এই সময় মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা যখন সম্ভব নয় তখন অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইলে কোন রাজা-উজীরের উপস্থিতির কথাই মনে আসে। আসল খবর জানিবার জন্য কৌতূহল বাড়িয়া উঠিয়াছিল—গাড়ির পাশেই একজন অল্পবয়স্ক যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত ভিড়ের কারণ কি? প্রশ্ন শুনিয়া লোকটি অবাক্। দৃষ্টির ভাষাতেই বুঝাইয়া দিল, ঠাকুর দেখতে এসেছ, কার পূজো তা জান না? তারাপদবাবু অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন, প্রশ্নোত্তর না শুনিয়াই বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইতে হইল। এদিকেও এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্যের সামনে আসিয়া পড়ায় আশঙ্কার কারণ ঘটিল। একটি ছাগদাড়িভূষিত ডাঁশা ছোকরা ল্যাম্প পোস্টের ডগায় বসিয়া একাগ্রচিত্তে হোটেলের জানালায় কাহাকে দেখিতেছে। অত দূর হইতে মানুষ চিনিতে হইলে দূরবীনের সাহায্য ব্যতিরেকে সাধারণ দৃষ্টিকে বিশ্বাস করিবার উপায় নাই। তথাপি ঊর্ধ্বাসনে বসিয়া লোকটি কি দেখিতেছিল সে-ই বলিতে পারে। ঊর্ধ্বের লোকটি যাহাই দেখুক নীচে একজন গেঞ্জি গায়ে লুঙ্গি-পরা লোক ঊর্ধ্বাসনে অধিষ্ঠিত

ছোকরার পা ধরিয়া টান মারিতেছে। সমভার সামলাইতে না পারিলে উপরের লোকটি যে নীচের লোকটির মাথায় আসিয়া পড়িবে সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। উপরের মানুষটি যেভাবে হুঁশিয়ার হইয়া বসিয়াছিল তাহাতে অনুমান করা চলে, গাছে চড়িয়া ফুটবল ম্যাচ দেখা তাহার পেশা। ঝড়বাদলে যাহারা ডালের উপর বসিয়া অবলীলাক্রমে দেহের সমভার সামলাইতে পারে তাহাদের পক্ষে হেঁচকা টান কিছুই নয়। তবে অতিমাত্রায় বিরক্তিকর হইলে মাঝে মাঝে পা-ঝাড়া দিতেছিল। ওটা অভ্যাসদোষও বলা চলে। নীচের লোক উপরে উঠিবার চেষ্টা করিলে, উপরওয়ালা দুই-একটি পদাঘাত করিয়াই থাকে, এই আচরণ নূতনও কিছুই নাই। অভ্যাসদোষে যাহাই ঘটুক, ঠাকুরদর্শনে ভক্ত যেভাবে আত্মহারা হইয়া যায় ঠিক সেইভাবে লোকটি অপলক দৃষ্টিতে জানালার দিকে তাকাইয়া ছিল। নীচের লোকটিও দর্শন-লাভের আশা লইয়া আসিয়াছিল এবং তারকার রূপ দেখিলে বেশ খানিকটা পুণ্যের খাতায় জমা হইতে পারে তাহা ভিড়ের মধ্যে কাহারও অজানা ছিল না। নীচের লোকটি ডগার কাছাকাছি আসিলে ভদ্রলোককে আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না, উপরের লোকটি একটি হাতল ছাড়িয়া দিল। এদিকে গ্যাসপোস্টের তলায় গলদ পরীক্ষার জন্য যে একদিকে খানিকটা খুঁড়িয়া গর্ত করা ছিল তাহা বোধ হয় কেহই লক্ষ্য করে নাই। অপরদিকে তারকা-দর্শনের আশায় উচ্চতার নাগাল সহজলভ্য দেখিয়া আরও একজন (আনাড়ীই বলিব) নারিকেল গাছে ওঠার পন্থায় যেমনই পোস্টের উপর খানিকটা উঠিয়াছে অমনি পুণ্যার্থীদের ওজন সহ্য করিতে না পারায় স্তম্ভটি সকলকে লইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িল। তারাপদবাবু যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। কয়েকজন চাপা পড়ায় বেশ একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হইল। দেখিতে দেখিতে কতকগুলি লোক মিলিত চেষ্টার দ্বারা ট্যাক্সির ড্রাইভারকে টানিয়া গাড়ী হইতে নামাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। এইরূপ ক্ষেত্রে নিরাপদ থাকিয়া চাঁদার মার দিবার জন্য একতা ও ব্যাকুলতার যে অদ্ভুত যোগ ঘটে তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করিবার উপায় নাই।

অবস্থার পরিণতি কি হইতে পারে তাহা কতকটা আন্দাজ করিয়া তারাপদবাবু গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। তিনি জানিতেন, ড্রাইভারের পালা শেষ হইলেই আরোহীর অভ্যর্থনা শুরু হইবে। ঘটনার মূল সূত্রই তো আরোহী, সে অতিমাত্রায় আরাম না চাহিলে গাড়ী বা ড্রাইভারের অস্তিত্বই

থাকিত না। আরোহীকে কেহ চিনিয়া রাখে নাই এমন কথাই বা কে বলিতে পারে? সুতরাং স্থানটি পরিত্যাগ না করিলে বিপদ সুনিশ্চিত। তারাপদবাবু গাড়ী হইতে নামিয়াই হোটেলের উল্টামুখে চলিতে লাগিলেন। বিপদসঙ্কুল কেন্দ্র হইতে বেশী দূর যাইবার আগেই শুনিলেন, দমকলগাড়ির ঘণ্টা, অর্থাৎ কাছেই কোথাও আগুন লাগিয়াছে। গাড়ি বেগে হোটেলের দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। পরে জানা গেল, মিলিত শক্তির আর একটি দৃষ্টান্ত ফলিয়া গিয়াছে। নীতির অভিভাবকরা আরোহীকে শাসন করিতে না পারিয়া গাড়ীটাই পুড়াইয়া দিয়াছে। ড্রাইভারের কি হইল ভাবিয়া লাভ নাই।

গৃহিণীর নিকট সমস্ত ঘটনার বিবৃতি দিয়া আশা করিয়াছিলেন দুই-একটা সমবেদনার কথা শুনিতে পাইবেন। কপাল জোর হইলে বিচারে করুণার ছোঁয়াও পাইতে পাবেন। সব শুনিয়া গৃহিণী বলিতে পারেন, কাজ নেই বাপু তারকার পিছনে ছুটে। ওরা গুনতুক জানে—লোকে কত কথাই বলে। ঘরের ছেলে ঘরেই থাকো। আমাদের যা আছে তাই দিয়েই চলে যাবে।

সবই ঠিক কিন্তু হাথন-হাসির মেজ জামাইটাই যত গোল বাধাইয়াছে, মরিবার আগে বেশ মোটা টাকা রাখিয়া গিয়াছিল। সেই টাকায় নতুন মোটরগাড়ী কেনা হইয়াছে। দরকার থাক বা না থাক বাড়ন্ত মেয়েরা নিত্য নতুন গহনা পরিতেছে। ওদের কি দেমাক, নতুন গহনার ঝলক লাগাইয়া মাথা নীচু করাইয়া ছাড়ে। তুলনায় গৃহিণীর অনটন সম্বল। এইরূপ অবস্থায় ক্রিয়াকর্মে গৃহিণী জড়োয়া গহনা পরিলেও, ওরা টিটকারী দিয়া বলিবে, বাপ-দাদা যা রেখে গিয়েছিল তাই দিয়ে কোনরকমে চলছে, ও আর কতদিন। তারাপদবাবু সম্ভবপর অনুকূল ঘটনার আশ্রয় লইলে কি হইবে, প্রতিকূল সম্ভাবনাই সত্য হইয়া উঠিল।

ব্যর্থতাকে প্রশ্রয় দেওয়া গৃহিণীর ধাতে সয় না। পরম নির্লিপ্ততার সহিত জানাইলেন, কলকাতার মত শহরে অমন ঘটনা নিত্যই ঘটে। সুতরাং কাজ না পাওয়া পর্যন্ত লাগিয়া থাকিতে হইবে। এইরূপ ঘটনা আর একবার ঘটলে গৃহিণী যে হঠাৎ বিনা নোটিসে বিধবা হইতে পারেন, তাহা বুঝাইবার জন্য তারাপদবাবু মনকে দৃঢ় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বক্তব্যকে গিলিয়া ফেলিতে হইল। গৃহিণীর মুখ দেখিয়া বুঝিলেন, অনটনকে না সরাইলে তিনি বিধবা হইতে প্রস্তুত নহেন।

কয়েকদিন পরের কথা। তারাপদবাবু সন্ধানের মানুষকে খুঁজিয়া পাইলেন। 'সিনেমায় সুগায়ক চাই' বিজ্ঞাপন পড়িয়া তারাপদবাবু আবেদন-পত্র নম্বর-মারা বাক্সের ঠিকানায় পাঠাইলেন। আবেদনপত্রে একটি বুদ্ধির কাজ করিয়াছিলেন, নিজের নামে স্বাক্ষর দেন নাই। ঠিকানাতেও আত্ম-গোপনের ব্যবস্থা ছিল। এবার যাঁহার শরণাপন্ন হইলেন তিনি নটী নহেন, স্বর্গের দ্বারপাল স্বয়ং প্রধান পরিচালক। ভাগ্যবিধাতা দর্শনদানের পর ভরসা দিয়াছিলেন, তাঁহার আবেদন সম্বন্ধে বিবেচনা করা চলিতে পারে, তবে সব-কিছুই পরীক্ষাসাপেক্ষ। সুরকে শায়েস্তা না করিতে পারিলে সিনেমায় ভয়াল কালোয়াতির স্থান নাই। সাহিত্যিকরাই বলেন, ও সুর একবার শুরু হইলে থামিতে চায় না। সুর সম্বন্ধে সাহিত্যিকের মত শেষ কথা। সাহিত্যিক বধির হইলেও তাঁহার মত মানিতে হয়, কারণ, মার্জিত রুচির কাণ্ডারী বলিতে সাহিত্যিককেই বোঝায়। তারপর, পালোয়ানী এবং গায়কের মধ্যে মল্লযুদ্ধ তো আছেই। বীভৎস পালোয়ানী পাঁয়তারা কুস্তির কেন্দ্রে ভাবিতেই গা ঘিনঘিন করিয়া ওঠে। আসল কথা, প্রয়োজন অনুসারে, বেহাগকে মোচড় মারিয়া জৌনপুরী বা আসাবরী যদি না করা গেল তো সুরকারের কেরামতি কোথায়। রাগ-রাগিণীর সময় ও বিশুদ্ধ স্বরগ্রাম লইয়া তাহারাই মাথা ঘামায় যাহারা সুরের বাঁধনে আড়ষ্ট। আমরা চাই সুরের সহজ গতি—যে সুর জনপ্রিয় হইতে পারে এবং হুঙ্কার দ্বারা মাইক না ফাটায়।

যে সময় পরিচালক প্রত্যাশার অবশ্যপালনীয় শর্তগুলি বক্তৃতার প্রথায় শুনাইতেছিলেন, সেই সময় তারাপদবাবু আবিষ্কার করিলেন, উপস্থিত ভাগ্য-বিধাতা তাঁহার বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। এই মানুষটিই দিনের পর দিন তাঁহার গান শুনিয়া তারিফ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেন না। তাঁহারই টাকায় পানাধিক্যের বড়াই করিতে গিয়া কেলেঙ্কারির সুব্যবস্থা করিতে কিছুমাত্র দ্বিধান্বিত হন নাই। বেসামাল হইলে লোকের জিম্মায় বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে এবং পরের দিনই গৃহিণী অনাথ আশ্রমের প্রস্তাব করিয়াছেন। আজ যে পরিচালক ব্যবসায় ফাঁপিয়া উঠিয়াছেন তাহাও তারাপদবাবুর টাকায়। ঘটনাগুলি মনে পড়ায় তারাপদ-বাবু ভদ্রলোককে চিনিবার দাবি পেশ করিলেন। দেখা গেল, ভাগ্যদেবতার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। ভাবটা—এত বড় স্পর্ধা! কিন্তু তাঁহার মত

গণীয়ানও যে ভদ্র হইতে পারে তাহা প্রমাণ করিবার জন্ম অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া হাতের ঘড়ির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আঁতকাইয়া উঠিলেন। বৃশ্চিক দংশনের মত কিছু ঘটে নাই। সময়ের অপব্যয়ে তাঁহার সর্বনাশ হইতে বসিয়াছিল, নির্লজ্জের মতই সত্যটি বলিয়া ফেলিলেন--কি সর্বনাশ, আর এক মিনিটও কথা বলার সময় নেই, এখনই গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে যেতে হবে। —দেবী আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাঁর সঙ্গে কনট্রাক্ট সই করলে তবে আপনার কথা। এখন বলতে পারি না আপনাকে দিয়ে চলবে কিনা। —দেবীর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে, হয়তো তিনি বিশেষ সুবিধা দিতে পারেন। যাই হোক, আপনি সোমবার সকালে আসছেন তো, তখন দেখা যাবে। সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও অতিব্যস্ততার প্রমাণ দিয়া ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন।

সোমবার, তারাপদবাবু বিশেষ সুবিধার আশায় স্টুডিওতে অপেক্ষা করিতেছেন। সাক্ষাতের নির্দিষ্ট সময় পার হইয়া গিয়াছে, পরিচালক বা মর্ত্যের তারকা এখনও আসেন নাই। কখন আসিবেন তাহারও স্থিরতা নাই, তবে আসিবার সম্ভাবনা থাকায় তারাপদবাবু অপেক্ষা করাই বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন।

তারাপদবাবু একলা বসিয়া পরীক্ষার কথা ভাবিতেছিলেন। সারাটা জীবন সঙ্গীতচর্চায় কাটাইয়াছেন, কখনও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হয় নাই। শিক্ষার্থী হইয়াই গুরুর কৃপা কামনা করিয়াছেন। ধ্বনির অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে যেটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহা পুরাতন হইলেও নূতনের রূপে তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, দুঃখের মাঝে সান্ত্বনা দিয়াছে, অজানা অসীমের সহিত অন্তরের যোগ ঘটাইয়াছে। কখনও ভৈরব গম্ভীর নিনাদে মেঘগর্জনের সাড়া পাইয়াছেন, কখনও বসন্তের আলাপে যৌবনের অনুভূতি ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই আনন্দের স্তর হইতে নয়াপন্থীর প্রয়োজনে নিজেকে পৃথক করেন কেমন করিয়া। আরও ভাবিতেছিলেন, সমুদ্রতটে একটি বালুকণা পরীক্ষা করিলে তাহাকে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা চলে কিন্তু প্রত্যেকটি কণার বিশেষ গুণ বিচার করিলে দেখা যাইবে, প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ, প্রত্যেকটি চিরনূতন। বালুময় তটে অনাদিকালের সঞ্চয় অনন্তকাল পর্যন্ত অক্ষয় থাকিবে। ক্ষুদ্র মানুষের জীবনে রত্নাকরের গভীরতা মাপিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। সুতরাং পরীক্ষার মানদণ্ডে যে ছাড়পত্র দেওয়া হয় তা

অধঃস্তরের শিক্ষানবীশের গুণ ব্যাখ্যামাত্র, উহা শিক্ষার শ্রেণী-বিচার। তবে কি তাঁহাকে গীতশ্রী জাতীয় একটা কোন ফরমায় ফেলা পরীক্ষায় নামিতে হইবে ? আত্মপ্রশ্নে নিজের কাছেই তিনি ছোট হইয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে বেলা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। মধ্যাহ্নের অগ্নিবর্ষণে পিচের রাস্তা পুড়িতে শুরু করিয়াছে, পোড়ার তাপ পাগলা হাওয়ার সহিত চতুর্দিকে ছুটিয়া ঘর ও বাহির তাতাইয়া দিতেছে। ক্ষুধায় জঠরাগ্নি জ্বলিতেছে, তৃষ্ণায় তালু শুকাইয়া গিয়াছে। পানীয় জল পাইলেও কতকটা জ্বালার বিরাম হইত, কিন্তু কাহাকে বলিবেন একটু জল দাও ?

কর্মব্যস্ততায় সকলেই যন্ত্র হইয়া গিয়াছে, সাঙ্কেতিক আদেশে কর্তব্য শেষ করিতেছে। ওরা নিজেরা নড়ে না, বিশেষ ব্যক্তির আদেশ দ্বারা নড়াইতে হয়। আদেশের সহিত বহু প্রকার আওয়াজ শুনিতেছেন। ছবিঘরের ভিতরে যেন প্রেতলোকের তাণ্ডব চলিয়াছে। হট্টগোলময় উৎসবের আয়োজনে পরিবেশ অস্বস্তিকর হইয়া উঠিল। গেটের সামনে মোটরের হর্ন শুনিলেই বারান্দা ছাড়িয়া রাস্তার দিকে কতবার যে উঁকি দিয়াছেন তাহার ঠিক নাই। অস্থিরতার তাগিদে একমাত্র চিন্তা পিছু লইয়াছিল, এইবার বোধ হয় পরীক্ষার পালা শেষ হইবে। মোটর থামে নাই, পদযাত্রীকে পথ ছাড়িবার সঙ্কেত দিয়া গমান্তরে চলিয়া গিয়াছে। সময়ও ছুটিয়া চলিয়াছে আপন গতিতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হইয়া গেল, পরিচালকের দেখা নাই। ধৈর্যও এদিকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সহিত ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছে, যে কোন মুহূর্তে একটি দৃঢ় সিদ্ধান্তে আসিয়া পড়া কিছুই বিচিত্র নয়। সকালে মাত্র এক কাপ চা পান করিয়া বাহির হইয়াছিলেন। এখানকার কাজ সারিয়া নিশ্চিন্ত মনে আসনে বসিবেন এইরূপ ইচ্ছা ছিল। যৎসামান্য কিছু মুখে দিয়া বাহির হইবার জন্য গৃহিণী অনুরোধ করিয়াছিলেন। কোথা হইতে কর্তা আজ সাহস পাইয়াছিলেন কে জানে। আহারের অনুরোধ নিঃসঙ্কোচে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমার কাজেই যাচ্ছি ; ফিরে এসে ওদিকটায় নজর দেওয়া যাবে। উত্তর শুনিয়া গৃহিণী চটিয়া উঠিয়াছিলেন। খুবই স্বাভাবিক, কারণ পিত্তি পড়িলে প্রতিক্রিয়ার পরিচর্যা গৃহিণীকেই করিতে হইবে। অনিবার্য রোগটির কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও কর্তা কর্তব্যসাধনে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। বেলা বাড়িয়া উঠিলে গৃহিণীর উপদেশ তারাপদবাবু হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতে লাগিলেন। এখন ঘরে ফিরিয়া আহারের কথা

উত্থাপন করাও চলে না, যে কাজ করিতে আসিয়াছিলেন তাহাও সার্থক হয় নাই। পরিবর্তে নিরম্বু উপবাসে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন শুনিলে, সিদ্ধপুরুষকে গৃহিণী যে শ্রদ্ধার্ঘ দিয়া পূজা করিবেন না তাহা কর্তা জানিতেন। বরং মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারিয়া মজা দেখিবার জন্য বলিতে পারেন, ঘরের আহার যখন মুখে রোচে না তখন বাইরেই ব্যবস্থা কর। শুধু এইটুকু বলিয়া থামিলে হয়তো দয়া নিংড়াইবার জন্য আর একবার বলিতেন, এখন খেতে দাও, পরে যত খুশি ব'কো। কিন্তু এসব বিষয়ে কাহারও পাওনা ফেলিয়া রাখাটাও আবার গৃহিণীর ধাতে সয় না। প্রাপ্য তিরস্কার দেওয়া হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা পরিশোধ করা তাঁহার স্বভাব; বিলম্ব হইলে সুদ পর্যন্ত কড়ায় গণ্ডায় চুকাইয়া দেন। পিত্ত উপলক্ষ করিয়া কাজ সম্বন্ধে অক্ষমতার কথা উঠিয়া পড়িবেই, তখন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবেন। আখন-হাসির জামাই কেবল গতর খাটাইয়া পয়সা উপায় করে নাই। বুদ্ধিমান লোক কিভাবে পয়সা জমাইতে হয় তাহার অতুলনীয় দৃষ্টান্তও রাখিয়া গিয়াছে। সেই অমর কীর্তির ফলে আজ মেয়েরা মোটর চড়িতেছে, মনের মতন নতুন গহনা পরিতেছে। আখন-হাসির জামাই ছাড়া আরও অনেকের দৃষ্টান্ত আছে যাহাদের বুদ্ধির সহিত তুলনা করিলে তারাপদবাবু বুঝিবেন নিরেট বোকামিতে তিনি কতখানি পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে তথাপি লজ্জায় মুখ ঢাকিবার মত সৎ প্রবৃত্তি তাঁহার আসিল না। আত্মশ্রদ্ধা থাকিলে কোন মানুষই জীবন সংগ্রামে পিছপাও হইতে চায় না। বাঁচার দ্বন্দ্বে বিজয়ী হইতে হইলে ক্ষুধার তাড়নাকেও সহ্য করিতে হয়। এইটুকু সহ্যশক্তি যখন নাই তখন এ সংসারে চঞ্চলা লক্ষ্মীকে ধরিয়া রাখিবে কে? ঘরে ফিরিলেই যে প্রস্তুত প্রশ্নগুলি গৃহিণী অভ্যর্থনার জন্য ব্যবহার করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইতিমধ্যে অপরাহ্ণ পার হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যা আগতপ্রায়। খবর আসিল প্রধান পরিচালক আসিতেছেন না, যাঁহারা অপেক্ষায় আছেন তাঁহারা অন্য একদিন আসিতে পারেন। পুনরায় আবেদনপত্র পাইলে সময় নির্দিষ্ট হইবে। যে সহকারী খবর দিলেন তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া জানাইলেন, উপায় কি বলুন, দৈনিক কাজের প্রোগ্রাম মানতে হলে ওঁকেও ঘড়ির কাঁটা ধরে চলতে হয়। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে বিরাট ভোজের আয়োজন হয়েছিল। মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করে একটু বিশ্রাম না নিয়ে

পারেন নি। তারপরই তারকানাথ স্টীমারযোগে জলবিহারের ব্যবস্থা থাকায় —বুঝতেই পারছেন, আর কি বলব। ভদ্রাচারের বহর ও ঘড়ি দেখিয়া সময়ের ব্যবহার সম্বন্ধে কৈফিয়ত শুনিয়া তারাপদবাবু ঘরে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু অধিকতর দুর্ভোগ ওদিকেও প্রস্তুত থাকায় স্থির করিলেন, পথে কোন একটা রেস্তোরাঁয় পিণ্ডিনাশের ব্যবস্থা করিয়া লইবেন।

রেস্তোরাঁয় ঢুকিবার আগে টাকার থলিটা পরীক্ষা করা ভাল। বলাই বৃথা, এদিক দিয়াও ইতিপূর্বে তিনি দুর্ভোগের অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। একবার আহারান্তে বিল চুকাইতে গিয়া দেখেন পকেটে পার্স নাই। এবারেও পরিত্রাণ পাইলেন না। টাকার থলি খুলিয়া দেখেন, অধিক সময় অপেক্ষার জন্য ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বকশিস দিতে গিয়া ব্যাগ প্রায় খালি করিয়া ফেলিয়াছেন। অন্যমনস্কতায় একটি পাঁচ টাকার নোট দিতে গিয়া একটির সঙ্গে আরও দুইটি চলিয়া গিয়াছে। যাহা পড়িয়া আছে তাহার বিনিময়ে রেস্তোরাঁয় আহার কেনা চলে না। গত্যন্তরে ঘরোয়া দুর্ভোগকে স্বীকার করিয়া বাড়ীমুখো চলিতে লাগিলেন, কারণ ফিরতি পথের ভাড়াও তাঁহার কাছে ছিল না। না হাঁটিলেও চলিত কিন্তু ক্যাস-বাক্সের চাবি গৃহিণীর নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন। বাহিরে ফেলিয়া আসার সম্ভাবনা থাকায় সাবধানতার প্রয়োজন মানিতে হইত। ক্যাস-বাক্স খোলার প্রয়োজনে চাবি চাহিলেই গৃহিণী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইবেন, তাহার পর ব্যর্থতার বোঝা কিভাবে বহন করিয়াছেন তাহার বিশদ বিবরণ চৌকাঠ পার হইবার আগেই দিতে হইবে। ব্যর্থতা যে ভাগ্য-বিধাতার বিধান, ইচ্ছাকৃত নয়, তাহা কোষ্ঠির লিখন দেখাইয়া প্রমাণ করা চলে। মেজাজ খুব চড়া না থাকিলে অনেক সময় বিশ্বাসও করেন। কিন্তু পিত্তি পড়ানোর অধিকার তাঁহাকে কেহ দেয় নাই, বিশেষ করিয়া বাহির হইবার সময় গৃহিণী যখন পই পই করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন—যা হোক কিছু মুখে দিয়ে যাও। মানুষ যেন কেবল উদর পূর্ণ করিবার জন্যই বাঁচিয়া থাকে। এই প্রশ্নের পিছনে যে গূঢ় তত্ত্ব আছে তাহা অন্দরমহলে পৌঁছাইয়া দিবেন কেমন করিয়া। মোট কথা, এখন গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা আসিয়া পড়িবে। একেই সারাদিন নির্জলা উপবাস গিয়াছে তাহার উপর ভবিষ্যৎকে সিনেমা-পরিচালকের

কাছে বন্ধক রাখিয়াছেন—সেখানে প্রত্যাশার সুদ গুণিতে গুণিতে অনেক সময় আশলই মারা পড়ে।

অবসাদগ্রস্ত দেহ ও মনের অবস্থা লইয়া জেরার মুখে পড়িলে কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবেন—দরকার নাই আহারের কথা ভাবিয়া। তারাপদবাবু সোজা চলিয়া গেলেন তাঁহার বসিবার ঘরে। বৈঠকখানার সামনেই তিনকড়ি দাঁড়াইয়াছিল। পুরাতন ভৃত্য; দরদ দেখানোর অধিকার থাকায় প্রথমেই আহার হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল। তারাপদবাবু ভাবিলেন উহা গৃহিণীর শেখানো বোল। পরে জানা গেল, বউঠাকরুণও আজ সারাদিন খান নাই। কেবল ঘর আর বারান্দা করিয়াছেন এবং থাকিয়া থাকিয়া তিনকড়িকে বকিয়াছেন, কর্তা কোথায় গিয়াছেন তাহার ঠিকানা রাখে নাই বলিয়া। ঠিকানা রাখিলেই বা কি লাভ হইত, তিনকড়ি যেন ইচ্ছা করিলেই স্টুডিওর মত পীঠস্থানে ঢুকিতে পারিত। জানা দেবতার মন্দিরে প্রবেশাধিকার সোজা। দক্ষিণার আড়ালে পুরোহিতকে মনোমত ঘুষ দিতে পারিলে পাপস্খলন ও দেবদর্শন কোনটিতেই বাধা নাই, কিন্তু অজানার দেহরক্ষী কিভাবে পথ আগলায় এবং কোন্ প্রকার ঘুষ তাহার মনঃপুত হয় তাহা একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। সুতরাং তিনকড়ির মত মানুষের পক্ষে ওই পথ যে রুদ্ধ তাহা অতিবড় বোকাও বলিয়া দিতে পারে। যাক, ওসব কথা ভাবিয়া লাভ নাই। এখন অবসাদ ও ক্লান্তিকে জয় করিতে হইলে গৃহিণীর সতীনকে কাছে ডাকিতে হয়।

সতীন বলিতে উপস্থিত ওই ছাইভস্মকে বোঝায়। খোশমেজাজে থাকিলে উত্তেজক তরলকে গৃহিণী সতীন বলিতেন। বিচার করিয়া দেখিলেন উগ্র তরলের সহিত সোহাগ করিতে হইলে মনকে পুরাপুরি মজাইতে হয়; মজা মন আর যাহাই হউক আতঙ্ক নয়। দুঃখের বোঝায় ক্লান্ত শরণাপন্নকে কখনও প্রত্যাখ্যান করে না। আজ তিনি দুঃখের সহিত বোঝাপড়ার জন্য মনকে সব দিক দিয়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রস্তুতির কথা মনে আসিতেই মাথায় নানা চক্রান্ত ঘুরিতে লাগিল। সুযোগ অনুসন্ধানী আত্মঘাতী যেন নিভৃতে চক্রান্তের কথা জানিতে পারিয়াছিল। কানের কাছে চুপি চুপি বলিয়া গেল, মহাপ্রস্থানের জন্য আয়োজন চলেছে, সাহস সংগ্রহ করতে পারলে আজই তোমার সব দুঃখের অবসান হবে। হিসাবের

বোঝা আর বইতে হবে না। যাবতীয় কর্তব্য থেকে তুমি পাবে মুক্তি। খ্যাতি, অখ্যাতি, হিসাব, বেহিসাব, সংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা সব একাকার হয়ে যাবে। তুমি যে পথের যাত্রী সেখানে সব প্রত্যাশাই অচল।

তারাপদবাবু কিছুক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিলেন। চিন্তারত মুখাবয়বে শ্লেষপূর্ণ হাসির আভাস ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। চরম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন।

তারাপদবাবু দুই একটা চুমুক দিয়াই বলিলেন, বাঃ খালি পেট না হলে এমন মজা পাওয়া যায়। আত্মপ্রশ্নের সমর্থনও যেন প্রস্তুত ছিল—একনিঃশ্বাসে সমস্ত গেলাস খালি করিয়া দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রতিক্রিয়া শুরু হইল। দেখিতে দেখিতে চোখ রক্তবর্ণ ও কপাল ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিল। তারাপদবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন, বাঃ, এমন না হলে জমে। এতদিন নিজেকে ঠকিয়েছি, খাঁটিকে জল মিশিয়ে ভেজাল করার মত বোকামি আর কিছু নেই। খাঁটির কারবারই হল চরমকে নিয়ে। আজ দেখা যাক কে বাজী মারে। ওরে তিনকড়ে, আর এক গেলাস ভরে দে, বেশ মজা লাগছে। দ্বিতীয় পাত্র যখন তিনকড়ি কর্তার হাতে তুলিয়া দিল তখন তার চোখে জল। সে ভাবিতেছিল কেন এমনটি হল। দ্বিতীয় পাত্রও সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইতে ঘন ঘন হেঁচকি টানের মাঝেই কর্তা বলিলেন, ওরে, হারমোনিয়ামটা নিয়ে আয়, বেজায় গান গাইতে ইচ্ছে করছে, একটা গজলী কীর্তনে গলাবাজী করে দিই।

বাড়াবাড়ি হইতেছে দেখিয়া পুরাতন ভৃত্য নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বউঠাকুরাণীর ঘরের নিকট আসিয়া দেখিল দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। সারাদিন অনাহার আর দুশ্চিন্তায় হয়তো ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিছুক্ষণ শান্তিতে থাকুন। এখানে ডাকিয়া আনিলে তুমুল কাণ্ড বাধিয়া যাইবে। তিনকড়ি ফিরিয়া আসিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইয়া রহিল।

আদেশ মানিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া গৃহকর্তা চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, দাঁড়িয়ে রইলি যে, গজলী কীর্তন ভাল লাগে না? তোর ভাল লাগে না তো বয়ে গেল। হাজার হাজার লোকের ভাল লাগে। বন্ধ অফিসের দিকে তাকিয়ে থাকলে গজলী কীর্তন আর হেঁচকি রাগ ছাড়া গতি নেই। ওরে বোকা, তাই তো ছ্যাঁচড়া সুরের রেয়াজ করে নিচ্ছি। সুরের দৌলতে বাজীমাৎ করতে চলেছি, তুই কোথায় বাহবা দিবি, তা না চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলি। চুলোয় যাক ঘোড়ার নাচ। তোকে একটা কিছু আনতে বলেছিলাম

না? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, পাঁজরায় হাড় বের করা সেই যন্ত্রটা। কি নাম তার, দূর, মনেও পড়ছে না।

তিনকড়ি বুঝিল তিনি হারমোনিয়ামের কথাই বলিতেছেন। উত্তরে জানাইল, এ বাড়িতে হারমোনিয়াম সে কখনও দেখে নাই। যন্ত্রটি নাই শুনিয়া তারাপদবাবু বলিলেন, নেই তো বয়ে গেল, তুই একটা সুর ধরে থাক। সুর কেমন করিয়া ধরিতে হয় তিনকড়ি জানিত না। বেচারাকে হতবুদ্ধি অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তারাপদবাবু ভাবিতে লাগিলেন, এতদিন হইয়া গেল এমন একটি সমঝদার লোককে শ্রুতিকর ব্যাপারটা শেখান নাই কেন। ত্রুটি সংশোধনের জন্য তখনই তিনকড়িকে টান মারিয়া পাশে বসাইলেন। ফরাশের উপর কর্তার সহিত একাসনে বসিতে সে ইতস্ততঃ করিতেছিল কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করার অবস্থা কর্তার ছিল না। তিনকড়ি জড়সড় হইয়া বসিতে তারাপদবাবু দুই হাতে তাহার মুখ ধরিয়া হাঁ করাইলেন—তাহার পর বলিলেন, আ-আ-আ করে আওয়াজ বার কর্।

আদেশ পালিত হওয়ায় তিনকড়ির গলা হইতে যে শ্লেষ্মাজড়িত ঘড়ঘড় ধ্বনি বাহির হইল তাহা প্রায় মৃতপ্রায় ব্যক্তির শ্বাসের মত। শ্বাসের পর্দাও এক পর্দায় থাকায় তারাপদবাবু চটিয়া উঠিলেন। ধমক দিতে গিয়া দেখেন তিনিকড়ি কাঁদিতেছে। মধ্যবয়স্ক একটি পূর্ণকায় মানুষকে শিশুর মত কাঁদিতে দেখিয়া গৃহকর্তা হাসিয়া গড়াগড়ি।

হেঁচকির ধাক্কায় হাসির উচ্ছ্বাস হঠাৎ থামিয়া গেল। মুখাবয়ব বিভিন্ন উচ্ছ্বাসে যেভাবে ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে ঠিক সেইভাবে হাসির পরিবর্তে তারাপদববুর মুখের উপর কালিমার আবরণ পড়িয়া গেল। নিবিষ্টচিত্তে ক্রন্দনরত তিনকড়িকে দেখিতে লাগিলেন, সত্যই গণ্ড বাহিয়া অবিরাম অশ্রুধারার স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। যাহা দেখিয়া একটু আগে হাসির গড়াগড়ি দিয়াছিলেন তাহাই অন্তর নিষ্পেষিত করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির করিয়া আনিল। জড়িত ভাষায় তারাপদবাবু বলিলেন, চোখের জলটা খাঁটিই মনে হচ্ছে। খাঁটি সব সময় দুর্লভ বস্তু, অপব্যয় ভাল নয়।

তিনকড়িকে উদ্দেশ করিয়া অপব্যয় সম্বন্ধে উপদেশ না দিয়া পারিলেন না। জানাইলেন, তোর চোখের জলে আমার স্বার্থ আছে। তাই বলি কিছু জমিয়ে রাখ, পরে আমার জন্যেই কাজে আসবে। উপস্থিত সুর ধরায় যখন অত অসুবিধা তখন সুরার সেবাটা বাদ দিস না। প্রভু ভক্তিতে পুণ্য আছে জানিস

তো। পুণ্যের হিসাবে গলদ রাখিস না লোকসান হবে তোরই।

এতক্ষণে কথা বলিবার জন্য আর একজনের প্রয়োজন মনে করিলেন না, আপন মনেই নিজের সহিত কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন—বেটা তিনকড়ের নামটাও উইলে পুরে দিয়েছি। বাকি জীবনটা আর চাকরি করে খেতে হবে না। বোকামির দিকটাও বেটার বেজায় খাঁটি। ওকে সব বলেছি তবু আমাকে জীইয়ে রাখার জন্যে কি আন্তরিক চেষ্টা। বোকা না হলে এমন কাজ কেউ করে? মানুষের মন হরদম বদলাচ্ছে কোন কারণে উইল যদি বদলে ফেলি, তখন ওর কি হবে?

বোকার ভবিষ্যৎ কি হইবে সে বিষয়ে খেয়াল ছিল না, সে কেবলই ভাবিতেছিল বউঠাকরুণ এইদিকে আসিয়া পড়িলে সবদিক রক্ষা হয়।

তারাপদবাবু হঠাৎ কোন বেদনায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। বুক চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, ইস্, আবার সেই বেদনাটা তেড়ে এসেছে। ওর সঙ্গে অনেকদিনের প্রেম, ঠিক সময় ফিরে এসেছে। তাঁহার চিন্তা সবাক হইয়া উঠিয়াছিল, বলিতে লাগিলেন—সিন্দুক খুললে সামনেই গৃহিণী উইলটা দেখতে পাবেন। এই সময় তাঁহার মুখে স্নিগ্ধ ও শান্তভাব দেখা দিয়াছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন উইল পড়িলে গৃহিণী আর অনাথ আশ্রমের চিন্তায় অস্থির হইবেন না। আত্মসান্ত্বনায় যেটুকু বেদনার উপশম হইয়াছিল তাহা পুনরায় ফিরিয়া আসিল। অসহ্য যন্ত্রণায় দাঁড়াইয়া উঠিলেন। পা তখন টলিতেছিল। অনির্ভরশীল অঙ্গ দুইটি দেহের সমভার সামলাইতে পারিল না, একেবারে হুমড়ি খাইয়া পাথরের উপর পড়িয়া গেলেন। মাথাটাই সর্বাগ্রে পড়িয়াছিল। পরক্ষণেই দেখা গেল শ্বেতপাথরে বাঁধানো মেঝে রক্ত-রঙে রঙীন হইয়া উঠিয়াছে শুধু মাথা ফাটে নাই, নাক ও মুখ দিয়াও ঝলকে ঝলকে রক্ত বাহির হইতেছে।

তারাপদবাবু সংযমের খ্যাতি সংগ্রহ করিতে না পারিলেও বৈষয়িক হিসাবটা শেষ পর্যন্ত ঠিক রাখিয়াছিলেন।

———